

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : <i>১, নতুন মার্কেট (৭১২), ঢাকা-১৩</i>
Collection : KLMLGK	Publisher : <i>নতুন মার্কেট</i>
Title : <i>বিষয় (BIYAY)</i>	Size : <i>5.5"/8.5"</i>
Vol. & Number : <i>5/1</i> <i>5/4</i> <i>6/1</i> <i>6/2</i>	Year of Publication : <i>July 81</i> <i>Jan - March - April - Jun 82</i> <i>Oct 82</i> <i>Oct - Dec 82, Jan - March 83</i>
	Condition : Brittle / Good
Editor : <i>নতুন মার্কেট (৭১২)</i>	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিদ্যাব

বিদ্যাব

১১

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

বিদ্যাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত



বহু বয়ে আমার পুরো এসে গেল।
হবে বাইরে সাজ সাজ হবে। সেকান
বাড়ার জমজমাট। উপহারের ভালি
পূর্ণ। দেনাকাটাও প্রায় শেষ।
পুতি বছরের হত এবারও আপনাব
কেনাকাটার ভালিকায় থাকবে
বোরোলীন—যার সমাদর করে ঘরে।
পূজা প্রস্তুতির অবিহ্ব্য
অঙ্গ বোরোলীন



কটা-কড়া ও ঢুকের দুধারের জন্য
বোরোলীন
সুভাভত আকির্ষকীয় ক্রয়



সুপারবিশেষের অংশ
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আপা মহল, ১১৬ জালিগু,
কলকাতা ৭০০ ০০৭

HTC-QDP-৪৭৭



সুচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৯
বিভাগ

প্রবন্ধ

কার্যাইকলের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন।
লাজ লিমোহন রায়চৌধুরী ১২৭
মূল একক রবীন্দ্রনাথ। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১৫৩

গল্প

ভদ্রা। সমরেশ বসু ১
যোদ্ধা। মহাশেখতা দেবী ১৫
অহঙ্কার। কল্যাণ মজুমদার ৩৮
শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩

কবিতাগুচ্ছ

অববিন্দ গুহর কবিতা। দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ২৮
অলোকরঞ্জনর কবিতা। স্বরজিৎ ঘোষ ৫২
বাসুদেব দেবের কবিতা। সন্তোষ চক্রবর্তী ১২০

ব্যক্তিগত রচনা

কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা। গুণানন্দ ঠাকুর ১১৫

পুরাতনী

সোমপ্রকাশ ও সেকালের বাঙালী সমাজ। পম্পা পাল ৮১

কালোচনা

যদিও অরণ্য তবু নির্বাসন নয়। নমিতা বসু মজুমদার ১১৬
আলোচনা। দেবীপ্রসাদ মজুমদার ১২৩

শিল্পভাবনা

বাংলা সংস্কৃতির কানাগলি : আধুনিক গান।
স্বধীর অধিকারী ১৫৫

সম্পাদকীয়। ১২৫

চিঠিপত্র। ১২৮

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার স্ববিমল লাহিড়ী
প্রদীপ দাশগুপ্ত শচীন দাশ

দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস

কলকাতা-৭০০০১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ / অমৃৎ রায়
অনংকরণ : পৃথীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি ব্যাডিয়াক্ট প্রেস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে

প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রিন্টার্স, ১০০ বিধান সরণী, কলকাতা-৪

৬ তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২ বিনোদ সাহা লেন

কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

গল্প

ভদ্রা

সমরেশ বসু

একটা সময় ছিল, প্রতি মাসেই বর্ষমান জেলার বিশেষ সেই গ্রামটিতে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। কর্ড লাইনের জৌগ্রাম স্টেশন থেকে নেমে, রাস্তা তো কিছু কম ছিল না। হাঁটা পথের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। চাকুরি-জীবী লোকেরা গম্বাহন্তে হরতো কোথাও বেড়াতে যায়। আস্তে আস্তে কলকাতার এ রেওরাজটা দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া, মফস্বলবাসী চাকুরিজীবী লোক। ঝারা কলকাতার মেসে কাটান, তাঁরা প্রতি সপ্তাহেই বাড়ি যান। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, আর এরকমটা চলে আসছে বহুকাল ধরে। এঁদের ঠিক সেই দলে ফেলা যায় না, ঝারা উইক এণ্ড করতে কলকাতার বাইরে চলে যান। এঁরা সংসারী মানুষ, সপ্তাহে এক ছু রাত্রি, সংসারের নানা কাজ কর থাকে, দায় দায়িত্ব আছে।

আমি চাকুরিজীবী না। সে-ভাবে উইক এণ্ড করার কোনো প্রশ্ন নেই। চাকুরিজীবী না হওয়া সত্ত্বেও, আমার জীবিকার চাপেই বন্দী হয়ে থাকি। চাকুরিজীবীদের একটা স্ববিধা, নিয়ম এবং সময় মাসিক কাজ শেষ হলেই ছুটি। আমার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ছুটি নেই। অফিসের কাজের দায়িত্ব আমার নেই। দায়িত্ব আমার নিজের কাজের। নিজের কাছ থেকে ছুটি নেওয়া বড় কঠিন। কাজটা আমার নিজের। অপরের কাজ না।

যাই হোক, বর্ষমানের সেই গ্রামটি আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। গ্রামটি বলা ঠিক হচ্ছে না। সেই গ্রামের একটি বাড়ি আমার আকর্ষণের কেন্দ্র। গৃহকর্তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। নাম শিবনাথ ঘোষাল। ঘোষালমশাই আমার পিতৃতুল্য বয়স্কা ব্যক্তি। তিনি কলকাতার একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এই প্রতিষ্ঠানের বাঙালী

মালিকের সঙ্গে ঘোষালমশাইয়ের একটা স্বদর আত্মীয়তাও ছিল। ঘোষালমশাই তাঁদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত, দীর্ঘদিনের কর্মচারি। মালিকরা তাঁকে ঠিক কর্মচারির চোখে দেখত না। বয়োজেন্স আত্মীয়ের মতোই দেখত। আর সেই কারণেই তৎকালিক চাকুরিজীবীর মতো তাঁকে মেসে থাকতে হতো না। মালিকের পুত্রো আলিপুরের বিরাট বাড়ির একটি বিচ্ছিন্ন অংশে, একটা দোতলায়, আড়াইঘানা ঘর নিয়ে তিনি বাস করতেন।

ঘোষালমশাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের হুজ, তাঁদের অফিসের কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত একটি সাংস্কৃতিক অস্থানে গিয়েছিলাম। তিনি যোগাযোগ করেন নি। যোগাযোগ করেছিল অফিসের তরুণ কর্মচারিরা। আজকাল দেখা যায়, সবরকম অফিসের কর্মচারিরাই ক্লাব বা সংঘ গঠন করেন, বছরে অন্তত একবার একটি সাংস্কৃতিক অস্থানও করেন। বাষিক অস্থান ছাড়াও নানারকম ছোটখাটো আলোচনা, সাহিত্যসভারও রোজগার প্রচলিত হয়েছে।

বিশ টি ভালো। মুশকিল হয়, যখন এসব সভা অস্থানে, নৈবেদ্যের কলার মতো একজন সাহিত্যিককে ডেকে আনা হয়। এটাও রেগেগাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্থানটি তারা নিজেদের মধ্যে কখনো সীমাবদ্ধ রাখেন না। বাইরের গায়ক-গায়িকা, আবৃত্তিকার মহিলা পুরুষদেরও চাই। এবং সবক্ষেত্রেই গায়ক আবৃত্তিকার শিল্পীদের দক্ষিণা দেওয়া হয়। সাহিত্যিক পান একটি বড় জোড় ফুলের মালা। এটা রেগেগাজ এবং একালের দাবি। কারণ সাহিত্যিকদের বক্তৃতার জন্ত দক্ষিণার রেগেগাজ নেই। সে তো শুধু কিছু কথা মাত্র। সাহিত্যিকের সময়ের দামও এসব ক্ষেত্রে, এ দেশে বিবেচ্য না। কবি সাহিত্যিকরা এরকম দাবি করারই মিটিয়ে আসছেন, এবং তাঁদের হাসির অন্তরালে যে একটি প্রজ্ঞার বিরক্তিও প্রতিবাদ থাকে, তার খবর উজ্জ্বল রাখেন না। শোনা যায় পৃথিবীর কৃত্রাপি এ রেগেগাজ নেই। প্রত্যেকেরই সময়ের এবং কাজের মূল্য আছে।

কথাগুলো বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। বরং অফিস কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক সংস্থার অস্থানে গিয়ে ঘোষালমশাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়টা একটা অন্তত যোগ্য হুজ ঘটিয়েছিল। অস্থান হুটীতে ক্লাব সেক্রেটারির বক্তৃতা থেকে শুরু করে, প্রধান অতিথি সভাপতির ভাষণের পরে, সংঘের নানাবিষয়ে নানা ইনডোর আউটডোর খেলাধুলা ইত্যাদির জন্ত ছিল পুরস্কার বিতরণ।

তারপরে গান, কবিতা পাঠ, একটি ছোটো নাটক মঞ্চস্থ করা। মাহুষ যে কেবল কাজ কটি নিয়ে বাঁচে না, এসব অস্থান হয়তো তাই প্রমাণ করে।

ঠিক ছিল, পুরস্কার বিতরণের পরেই আমি ফিরে আসব। এসেছিলামও তাই। তার আগেই, কিংবা জলবাগের জন্ত আমাকে নিয়ে বাওয়া হয়েছিল ঘোষালমশাইয়ের দোতলার ঘরে। শুনেছি, আমাদের পূর্বস্রুর সাহিত্যিক কবিরা ছিলেন কেউ কেউ ভোজন রসিক। অস্থানের পর তারা রসনা পরিতৃপ্ত করে ফিরতেন। আজকাল আর কবি সাহিত্যিকরা ভোজন রসিক কেউ আছেন বলে জানি না। থাকলেও, দোকানের কেনা খাবারে তাঁদের রুচি নেই।

অফিসের নিজস্ব একটি বড় হল ঘরেই অস্থানের জায়গা। ঘোষালমশাইয়ের আস্তানা তার গারেই। সভামঞ্চের বাইরে, ভিতরের নেপথ্যে একটি মেয়েকে চোখে পড়েছিল আগেই। বয়স বছর বারো-চৌদ্দর কিশোরী। কনসার্ট, সুন্দর মুখশি, বড় বড় কালো চুটি চোখ। মাথার চুধারে কুল ছিল জোড়া বিহুণী। গারে ছিল লাল রঙের একটি ফ্রক। বুকে ছিল বাজ। সব কাজেই তাকে সবাই ডাকাডাকি করছিল। সে একা ছিল না। আরোও কয়েকটি মেয়ে ছিল। তাদের পোশাক-আশাক, কথাবার্তা শুনে বোঝা যাচ্ছিল, সেখানে তাদের খাতির বেশি। শহুরে স্বলক, কথাবার্তার ইংরেজি শিক্ষা আর কেতার ছাপ। ছুই বিহুণী লাল ফ্রক পরা মেয়েটিকে কেমন একটু গ্রাম্য অঞ্চল হাসিখুশি দেখেছিলাম। সে মুখে পাউডার স্নো মেখেছিল, চোখে কাজল এঁকেছিল। পায়ের সামান্য দামের স্নাওয়েল। সকলের কাইফরমারেস খাটিছিল হাসি মুখে। তখনই তার নামটাও শুনেছিলাম, তুড়ি। তুড়ি নামও আমি আগে কখনোও শুনি নি। নিশ্চয়ই ডাক নাম। কিন্তু প্রধান অতিথি আর সভাপতি বরণের সময়, গলায় মালা দেবার জন্ত তুড়ির ডাক পড়ে নি। পড়েছিল সেইসব শহুরে চালচলন আর অবশ্যই বাদ্যের প্রতি সকলের ব্যবহার ছিল একটু খাতির সমীহ করার মতো, সেইসব মেয়েদের।

ঘোষালমশাইয়ের দোতলায় যখন গিয়েছিলাম, তখনোও তুড়িকে দেখেছিলাম। উজ্জ্বল ছেলের দল আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বসিয়েছিল একটি আলাদা আসনে। ঘোষালমশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় তখনই। বয়স ভদ্রলোকটির দোহারী নাতিদীর্ঘ চেহারা। মাথার চুল ধূসর আর পাতলা। পরিচ্ছন্ন চোখ মুখ, ভারি অমায়িক এবং অত্যন্ত বিনীত ছিল তাঁর ব্যবহার। দ্বিতীয় ওপরে পাঞ্জাবি, শাদা-মাঠা মাহুষ। ছেলেরা সবাই তাঁকে ঘোষালদা

বলে জাকছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, ঘোষালমশাইয়ের শুধানেই অহঠানের পর খাওয়াদাওয়া হবে। রান্নাবান্না চলছিল। কে একজন আমাকে জানিয়েও দিয়েছিল, আস্তানাটি ঘোষালমশাইয়ের, কোম্পানির বিনা ভাড়ার বাসস্থান। এবং তুড়ি তাঁরই মেয়ে।

আমাকে খাবার পরিবেশন করেছিল তুড়ি। এক গুচ্ছের গরম লুচি, আলুর দম, বেগুন ভাজা, মাংস আর মিষ্টি। সভা করতে এসে অসময়ে এত খাবার দেখে আমার চক্‌হির। বলেছিলাম, “আমি এসব কিছুই খাব না। আমি একটা মিষ্টি খাচ্ছি। এক কাপ চা পেলেই চলবে।”

“ও মা, এ আবার কতটুকুনি খাবার?” তুড়ি কেমন পাকা গিঁটির মতো বলেছিল, “সব তো আমাদের এখানে তৈরি। মিষ্টিগুলো খালি দোকান থেকে কেনা।”

ছেলোটা বলে উঠেছিল, “হাঁ স্যার, ঘোষালমশাইর এখানে স্পেশাল ঠাকুর দিয়ে সব রান্না করানো হয়েছে। কোনো কিছু বাইরের নয়।”

হেসে বলেছিলাম, “তা বুঝেছি। কিন্তু আমার পক্ষে এখন এ-সব খাওয়া সম্ভব নয়।”

“কেন সম্ভব না?” তুড়ি আমার সামনে জাঁকিয়ে বসেছিল, আর বেশ জোরের সঙ্গেই দাবি করেছিল, “আপনাকে খেতেই হবে। সব লোকই তো পিকলে সন্ধের জলখাবার খায়। আপনি সেরকম করে খান।”

তুড়ির ছেলেমাহুঁষি, জোর করা, আমি বেশ উপভোগ করেছিলাম। ঘোষালমশাই বলেছিলেন, “জোর করিস নে তুড়ি, ওর যা ভালো লাগে তাই খাবেন।”

“তুমি চূপ করো তো।” তুড়ি ওর বাবাকে এক ধমকে চূপ করিয়ে দিয়েছিল, আর আমার দিকে ভাগর চোখে তাকিয়ে বলেছিল, “আপনাদের বুঝি বেশি খেতে নেই?”

জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তার মানে কী?”

“তার মানে, খাওয়া বই লেখেন?” তুড়ি অনায়াসেই কথাটা বলেছিল। “আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, লেখক কখনো দেখি নি। কিন্তু আপনার ছবি দেখেছি। দিদিপা আপনার বই পড়ে, আমি এখনো পড়ি নি। কিন্তু আপনি খাবেন না কেন?” তুড়ির স্বরে অভিমান ফুটেছিল। “একটু তো খেতেই হবে। লক্ষ্মীটি!”

লক্ষ্মীটি! তুড়ির মতো বয়সের মেয়ের মুখে কথাটা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। অস্তরা হেসেছিল। ঘোষালমশাই বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, “কিছু মনে করবেন না, আমার এ মেয়েটা একটু পাগল আছে। কাকে কী বলতে হয় জানে না।”

“তা আমরা গেলো মেয়ে, সব কি জানি?” তুড়ি একটুও আড়ষ্ট না হয়ে বলেছিল। কিন্তু একটু লজ্জার ছটা ওর মুখে লেগেছিল।

আমার আপায়নের জন্ম ছেলেরা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে তখন গান আবৃত্তির আসর নিশ্চয়ই জমে উঠেছিল। তুড়ির মতো মেয়েদের আমার একটু আধটু চেনা ছিল। আমি শেষ পর্যন্ত একটা লুচি এক টুকরো মাংস খেয়েছিলাম। তুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “তোমাদের গ্রাম কোথায়?”

তুড়ি নিজের গ্রামের নাম বলে জিজ্ঞেস করেছিল, “আপনি কখনো গ্রামে গেছেন?” বলেছিলাম, “অনেকবার। জন্মেছি তো গ্রামেই। আর গ্রাম বেড়াতে আমি খুব ভালোবাসি।”

“তা হলে আমাদের গ্রামে আসুন না।” তুড়ি বেশ আবদারের স্বরে বলেছিল, “আমাদের গ্রামে গেলে, আপনার খুব ভালো লাগবে। বড় দীঘি আছে, অনেক মন্দির আছে।”

ঘোষালমশাই বলে উঠেছিলেন, “কী বলছিস তুই তুড়ি? স্টেশন থেকে অত দূরের পথ উনি যাবেন কেমন করে? উনি কি অত হাঁটতে পারেন?”

“কেন বাবা, গোন্ধর গাড়ি পাঠিয়ে দেব ইষ্টিনে।” তুড়ির জবাব তৈরি ছিল, “তুমি আগে থেকে জেনে নেবে উনি কবে যাবেন। আমাদের চিঠি লিখে দেবে। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। গোন্ধর গাড়ি থাকবে ইষ্টিনে।”

তুড়ি কথাগুলো বলছিল ওর বাবার উদ্দেশ্যে। জিজ্ঞাস্য ছ চোখ ছিল আমার দিকে। ঘোষালমশাইয়ের বিব্রত মুখে স্নেহের হাসি। তাকিয়েছিলেন মেয়ের মুখের দিকে। আর সংকুচিত চোখে আমার দিকে। আমি বলেছিলাম, “তোমার বাবার কাছে কি তুমি থাকো নাকি?”

“না না।” তুড়ি ভাড়াভাড়ি মাথা নেড়েছিল, “আমি তো বাবাদের অফিসের ফাংশান দেখতে এসেছি। কাল থেকে তো বাবার ছুদিন ছুটি। আমরা সকালেই চলে যাব।”

বলেছিলাম, “ঠিক আছে। তোমার বাবার কাছে আমার ঠিকানা

থাকবে। আমিও তোমার বাবার ঠিকানা নিয়ে রাখছি। যখন যাব মনে করব, তোমার বাবাকে চিঠি দিয়ে জানাব। উনি ব্যবস্থা করবেন।”

বলা বাহুল্য, ঘোষালমশাই ঠোঁট টিপে করুণ হেসেছিলেন। কারণ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, আমি তাঁর পাগল মেয়েটিকে মিথ্যা স্তোক দিচ্ছি। তুড়ি সেই মিথ্যা স্তোকে ভুলে, তখনই কাগজ কলম পেড়ে এনে, আমার ঠিকানা লিখে নিয়েছিল। বাবার ঠিকানা আমাকে লিখে দিয়েছিল। আকাবাকা অপরিস্রব হাতের লেখা। পড়া যায়।

স্বত্বপাতটা একেবারে মিথ্যার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে নি। তুড়ির চিঠি পেয়েছিলাম মাসখানেক পরেই। এই একটা ব্যাপারে, আমার পায়ে বেড়ি ভাজতে কখনো তেমন আড়ষ্ট বোধ করি নে। সমাজ সামাজিকতার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় না। তুড়ি লিখেছিল, আমাদের কথা কূলে যান নি তো? কবে আসবেন? বাবাকে একটা চিঠি দিয়ে জানাবেন। না এলে কিন্তু খুব কষ্ট পাব। হাতের লেখা দেখে বৃকতে পেয়েছিলাম, তুড়ি লেখে নি। তুড়ির বয়ান, অজ্ঞ কারো হাতের লেখায় এসেছিল এবং তা পরিস্রব গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

তুড়ির চিঠি পেয়ে আমি মনস্থির করেছিলাম। ঘোষালমশাইকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম। তাঁর কথা ভেবেই আমি শনি রবি দুটির দিন বেছে নিয়েছিলাম এবং একদিন তাঁর সঙ্গে জৌগ্রাম স্টেশনে গিয়ে নেমেছিলাম। গোবুর গাড়ি ছিল। সময়টা ছিল ধান কাটা শেষে, কাঁচা রাস্তায় ধূলা ওড়ানো, পাতা ঝরানো, পায়রা আর চড়ুইয়ের ঝাঁক বাঁধা বনজোজনের প্রাণ-দুপুরের শীতের বেলা। ঘোষালমশাইদের প্রাচীন একতলা পাকা বাড়ির সঙ্গে, মাটির দেওয়ালের খড়ের চাল ছাওয়া ঘরের পাশাপাশি সহাবস্থান। মস্ত এক উঠোন, সেখানে গোবর মাটি লেপা স্বকরকে চতুরে ধান শুকাচ্ছিল। বড় বড় দুটো ধানের মরাই। মেটে সিঁড়রের স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা মরাইয়ের গায়ে। নাচ দুয়ার অর্থাৎ বিড়কির দরজার দিকে ছিল গোয়াল ঘর। দরজা খুললে ছোট একটা পুকুর। কুরো পাইখানা, বাড়ির ভিতরের পিছনের অজ্ঞ এক উঠানের কোণে। দক্ষিণে বাগান। আম জাম ছাড়াও ছিল নারকেল স্থপরি পাছ। বাড়িতে চোকবার মুখেই পাকা প্রাচীন ঠাকুর দালান।

ঘোষালমশাই বিপত্নীক। সংসারে আছেন তাঁর এক বিধবা বোন, আর চার কন্যা। তুড়ি তাদের মধ্যে দকলের ছোট। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।

স্বামীর ঘর তাঁর ভাগ্যে ছিল না। বিয়ের পরে বছর না ঘুরতেই, শশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি না। শ্রাম হস্তী মেয়েটির নামও শ্রাম। তারপরে দুর্গা। বয়স প্রায় তুড়ি এবং দুর্গার মতোই তৃতীয়া আর প্রতিমা সদৃশ চোখ মুখ গড়ন পেটান। ঘোষালমশাইয়ের গলার কাঁটা। পাত্ত খুঁজে হরান হচ্ছেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে গৌরবর্ণা রূপসী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণ, সবই মিলে যায়। কেবল শিক্ষিতা ছাড়া। গ্রামের স্থলে মাইনর পর্বত পড়া। তবু গলার কাঁটা। দুর্গার পরে পার্বতী, বয়স সতেরো আঠারো। দুর্গার সঙ্গে অনেকটাই মিল। বলা বাহুল্য, সেও ঘোষালমশাইয়ের গলার কাঁটা। এখনই বিয়ে না দিলে নয়। চার বোনের মধ্যে উমা অর্থাৎ তুড়িকে বলতে হয় রূপের দিক থেকে একটু নীরস।

আমার প্রথম দিনের যাওয়াটা রীতিমতো উৎসবের দিন ছিল ঘোষাল-বাড়ি। ঘোষালমশাইয়ের বিধবা বোন প্রথম দিনেই আমার পিসীমা হয়ে উঠেছিলেন। ঘোষালমশাই কখন এক সময় থেকে আমাকে তুমি সম্বোধন শুরু করেছিলেন, নিজেও বোধহয় জানতেন না। পাড়ার আশেপাশের বাড়ির প্রতিবেশী বয়স্ক ব্যক্তির আদর্শেই এসেছিলেন আলাপ-পরিচয় করতে।

দু রাত্রি ছিলাম। সোমবার সকালেই ঘোষালমশাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় ফিরেছিলাম। প্রথম যাওয়াটা এভাবে শুরু হয়েছিল। তারপরেও দু-তিন মাস ঘোষালমশাইয়ের সঙ্গেই গিয়েছি। ঘোষালমশাই ভারি অসহায়ভাবে আমার হাত ধরে বলতেন, “বাবা, তুমি আমার দুর্গা আর পার্বতীর জন্ম দুটি পাত্র দেখে দাও। একটু ভদ্র ছেলে, চাকরি-বাকরি করে, বউকে যেতে পরতে দিতে পারবে, এমন পাত্র পেলেই আমি খুশি। আমার মতো ওদের জীবন নষ্ট না হলেই বাচি।”

আমি ঘোষাল পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলাম। প্রতি মাসেই দু-তিন দিনের জন্ম সেই গ্রামে একবার ঘুরে না এলে, আমার কেমন ফাঁকা লাগত। আর ঘোষালমশাইয়ের মেয়েদের আমি দাদা হয়ে উঠেছিলাম। ওরা সকলেই আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মেলামেশায় কোনো আড়ষ্টতা ছিল না। কেবল গ্রামে বেড়াতে যাবার সময় তুড়ি আমার সঙ্গে বেরোতো। দুর্গা পার্বতীর ইচ্ছা থাকলেও, বিবাহযোগ্য আইবুড়ো মেয়েদের পক্ষে এমনতেই পাড়া বেড়ানো অচল। আমরা ঘরে বসেও গল্প করতাম, তাস লুডো খেলতাম। তুড়ির একটা হারমোনিয়াম ছিল। বোনদের মধ্যে ও-ই

একমাত্র একটু-আধটু গান করতে পারত। রবীন্দ্রসংগীতের চর্চাটা ছিল বুধা। কীর্তন ভালো গাইত।

আমি যখন ঘোষালমশাইয়ের বাড়ি যাই, প্রথম দিন থেকেই একটি মেয়েকে চোখে পড়েছিল। নাম ভদ্রা। সে কখনো আমার কাছে আসত না। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখত। বয়স দুর্গা-পার্বতীদের মতো। রঙ কালো। কালো চোখ ভাগুর, নাকটি সেই তুলনায় চাপা। চোখে পড়বার মতো রূপ ছিল না ওর। বাহ্যিক ভালো। আর ছিল ঢেউ খেলানো এক মাথা চুল। আমি ঘোষালবাড়ি গেলেই ভদ্রা আসত। বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকে, মরাইয়ের পাশে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকত। কেমন একটা আড়ষ্টতা আর সংকোচ ছিল ওর মধ্যে। যেন ব্রাহ্মণ বাড়িতে মেয়েটি অজুত। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলে, দূর থেকেই হাসত। আর লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিতো। ওর সঙ্গে তুড়ি বা ওর দিদির কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় নি। ওর সঙ্গে কথা বলতেও শুনি নি। অথচ ও কে, কেনই বা ঘোষালবাড়ির সবাইয়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছুই জানতাম না। আমি একদিন তুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “ও মেয়েটি কে? এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? ঘরে আসতে পারে না?”

তুড়ির ভুরু কঁচকে উঠেছিল। মুখের বিরক্তি চাপা থাকে নি। বলেছিল, “ওর নাম ভদ্রা। আমাদের পাড়ায় ঢোকবার মুখে, বীশঝাড় আর পুষ্করে ধারে একটা বাড়ি দেখেছেন তো? ও ওই বাড়ির মেয়ে। ওরাও ঘোষাল, আমাদের জ্ঞাতি। সম্পর্কে ভদ্রা আমাদের বোন।”

তুড়ি এই পর্যন্ত বলে থেমেছিল। আমাকেই আবার খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, “পুরো নামটা তো পেলাম না তুড়ি। ভদ্রা তোমাদের জ্ঞাতি বোন। কিন্তু আমি দেখি, তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বল না, ডাক না। ব্যাপার কী? আড়ি আছে নাকি?”

“ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।” তুড়ি বেশ ফোঁজে বলেছিল, “আমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলি নে। ওদের বাড়ি যাই নে। ভদ্রাও আমাদের বাড়ি কোনোদিন মাড়ায় না। আপনি এদেই দেখি, ছুটে আসে। বেহারা, তাই আসে।”

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “ওর মুখ দেখলে পাপ হয় কেন? ও কী করেছে?”

“তা আমি বলতে পারব না।” তুড়ির গম্ভীর মুখে কেমন একটা লাল ছটা লেগে গিয়েছিল, “আপনি দিদিদের জিজ্ঞেস করবেন। তবে দেখবেন, ও মায়ারিনীর মায়ার পড়বেন না যেন।”

তুড়ির কথা শুনে হেসেছিলাম। কিন্তু আমার কৌতুহল বেড়েছিল। নিশ্চয়ই ভদ্রার বাপায়ে এমন কোনো কিছু ছিল, যে কারণে ওর মুখ দেখলে পাপ। ও মায়ারিনী। আমি দুর্গা পার্বতীকে ভদ্রার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরাও জবাব দিতে পারেনি। ওদের মুখে ছিল বিরক্তি অথবা লজ্জা আর সংকোচ। বলেছিল, “আপনি বড়দির মুখ থেকে শুনবেন।”

ক্রমেই বাপারটা কেমন রহস্যজনক ঠেকেছিল। কারণ শ্রামাকে জিজ্ঞেস করে, প্রথমে কোনো জবাব পাই নি। সে বলেছিল, “আমার জীবনটা দেখেছেন, এ একরকম। তবু বলতে পারি। কিন্তু এমন ঘটনাও আছে, মুখ ফুটে বলা যায় না। বলতে লজ্জা করে। তবে আপনি জানতে চেয়েছেন, আমি না বলে থাকতে পারব না। একদিন বলব।”

সেই একদিনটা যে কবে আসবে, ছ’ মাসের মধ্যেও বুঝতে পারি নি। শ্রামা বলবে বলেও এমন একটা তুফীশ্রাব অবলম্বন করেছিল, আমি যেচে আর জিজ্ঞেস করতে পারি নি। কোনো বিষয়েই বেশি কৌতুহল দেখানো উচিত না। বিশেষ করে, একজন তরুণীর সম্পর্কে, অন্ন তরুণীর কাছে। তবে আমার মনে একটা অবাক জিজ্ঞাসা খচখচ করত। আমি ঘোষাল বাড়িতে গেলেই ভদ্রা কেন আসত? তুড়ি এবং সকলের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, নিতান্ত নাকি আমার জ্ঞাতই। কারণ অন্নথায়, কোনো সময়েই ভদ্রা তুড়িদের বাড়ি আসতো না। সেই কারণে চার বোনের এবং পিসীমার মনে খুব রাগ ছিল। যদিও ভদ্রাকে কেউ অপমান করে তাড়িয়ে দিত না। বাপারটা তো আমার মাথাব্যথা হয়ে উঠেছিল। আমি ঘোষাল বাড়িতে গেলেই ভদ্রা আসত। দূর থেকে তাকিয়ে দেখত। চোখে চোখ পড়লে হেসে মুখ নিচু করত। আবার তাকাতো। যেন কিছু বলতে চায়। অথচ উপায় নেই। আর ও এমনিই নিরুপায় যেখানে ও কেবল অনাহুত না, মুখ দেখলে পাপ, সেখানে সকল লজ্জা বিসর্জন দিয়ে একবার এসে দাঁড়াত।

অন্তরাল থেকে তুড়িদের চার বোনের কথা শুনছি। তুড়ি ছাড়া তিন বোনের মধ্যেই একটা ঝিবা, কে ভদ্রাকে ওদের বাড়িতে আসতে বাধা করবে। এ বলে ওকে, সে বলে তাকে। কিন্তু কেউই ভদ্রার মুখোমুখি হতে রাজি না।

একমাত্র তুড়ি রাজি এবং ওর পরিষ্কার কথা, ভদ্রাকে ও খেঁচিয়ে বিদায় করবে। দিদিদের তাতেও আপত্তি, সেটা ঠিক হবে না। কেন? না, আর যাই হোক, ভদ্রা বর্তমান শহরে থেকে পড়াশোনা করেছে, একটা পাশ দিয়েছে। সংবাদটা অবাক করার মতো। ভদ্রা শহরে থেকে পড়াশোনা করেছে, একটা পাশ দিয়েছে। কী পাশ? স্কল ফাইনাল? না হায়ার সেকেন্ডারি? ভদ্রাকে দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। বরং ওকে আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। ওর আসা, দূর থেকে দেখা, হাসি, লজ্জা, চলে যাওয়া ইত্যাদি থেকে সন্দেহ জেগেছিল, যেহেতু ছিটগ্রন্থ কি না। তুড়িদের কথা শুনে, সেরকম ভাবাও আর সম্ভব ছিল না। অথচ মাসের পর মাস চলে যাচ্ছিল। আমি আমাকে কিছুই বলে নি।

সময়টা হেমস্তের শুরু। ইতিমধ্যে প্রায় বছর খানেক হয়ে গিয়েছিল, আমি বর্ষমানের সেই গ্রামে ঘোষালবাড়ি যাতায়াত করছি প্রতি মাসে দু-একদিনের জ্ঞা। চেষ্টা করতাম ঘোষালমশাইয়ের সপ্নাহস্তে গ্রামে যাবার সময় যেন যেতে পারি। প্রত্যেক মাসে তা সম্ভব হয়ে উঠত না। আমি তুড়িকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতাম, কবে যাচ্ছি। গোরুর গাড়ি পাঠাতে বারণ করতাম। বড় অস্বস্তি হত। তবে বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তার পাক দক কাদা মাড়িয়ে যেতে কষ্ট হত। ঐ সময়টা গোরুর গাড়িতে যেতাম। আমার ভালো লাগত। সারা মা কলকাতায় কাজ করে, মাসে দু-একটা দিন, প্রকৃতির নিবিড় সাগির্যের জ্ঞা একটা তৃষ্ণা বোধ করতাম।

সেবার হেমস্তের শুরুতে খবর দিয়ে গিয়েছিলাম। জ্যোগ্রাম থেকে হেঁটে গিয়েছিলাম সেই গ্রামে। ব্রাহ্মণ পাড়ার চোকবার মুখে, বাঁশঝাড় আর একটি পুরুর। পুরুরের ধারে একটি বাড়ি। জানতাম, ওটা ভদ্রাদের বাড়ি। কোনো দিন ওকে বাড়ির সামনে বা দরজার ধারে দেখি নি। হেমস্তের সেই চলে পড়া বেলার, পুরুরের নিস্তরঙ্গ জলে, বাঁশঝাড়ের নিম্নলিখিত। ভদ্রাদের বাড়ির পাচিলের একটা অংশ আর পাচিলের গায়ে একটা যজ্ঞ ডুমুরের গাছের ছবিও জলে আয়নার মতো দেখা যাচ্ছিল। একটা দুর্গা টুনটুনি ডাকছিল কোনো ঝোপে। কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল টেকিতে পাড় দেবার তাল মেলানো শব্দ। পুরুরটা পেরিয়ে মোড় নিলেই তুড়িদের বাড়ি দেখা যায়। জানতাম মোড় ফিরলেই তুড়িকে দেখতে পাব। আসবার সময়টা ওদের জানা ছিল।

ভদ্রা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। কালো মেয়েটির গায়ে ছিল নীল রঙের ডুরে শাড়ি, আটপোরে ধরনে পরা। কালো ডাগর চোখে স্নিগ্ধ হাসির কিরণ। চেউ খেলানো এক পিঠ চুল খোলা। ভেবেছিলাম, ও কিছু বলবে। কিন্তু বলে নি, কেবল তাকিয়েছিল। আমিই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “কেমন আছ ভদ্রা?”

মুহূর্তেই ওর চোখে মুখে যেন আলোর বলক ফুটেছিল। দরজার বাইরে এসে বলেছিল, “ভালো। আমাদের বাড়ি আসবেন?”

“তুমি ডাকলেই যেতে পারি।” আমি অনায়াসেই বলেছিলাম।

খুব দ্রুত ভদ্রার মুখের পরিবর্তন হয়েছিল। দেখেছিলাম, ওর চোখের কোণে হঠাৎ জল টলটলিয়ে উঠেছে। প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলেছিল, “অন্যন।”

আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। বাড়িটা ফাঁকা মনে হয়েছিল। চূপচাপ নিশ্চেষ্ট। একটি মুনিস উঠানে মেলে দেওয়া ধান তুলছিল। গোয়াল থেকে ডেকে উঠেছিল একটি গাভী। আর ভদ্রা ঘরের ভিতর থেকে একটি নড়বড়ে ভারি কাঠের চোরার পেতে দিয়েছিল উঠানের মাঝখানে। বলেছিলাম, “বাস্তব হচ্ছ কেন? তোমাকে তুড়িদের বাড়িতে দেখি তাই ভালো, তোমাদের বাড়িটাও একবার দেখে যাই। তোমার সঙ্গে তো কোনো কথা হয় না।”

ভদ্রা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। তখনো ওর মুখে আবেগের অভি-বাক্তি। চোখের কোণে জল নেই। মুখে সলজ্জ হাসি। একটু পরে যুগ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, “কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে। আপনার কাছে যেতে পারি নে। ভাগ্যিস আপনি নিজের থেকে আমাদের বাড়িতে আসতে চাইলেন।”

“হ্যাঁ, ও-বাড়িতে তো তুমি দূর থেকে চলে আস।” বলেছিলাম, “আমারও তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। শুনেছি তুমি বর্ষামানে পড়াশোনা করছে?”

ভদ্রা ওর ডাগর চোখ আরোও বড় করে তাকিয়েছিল। তারপরেই লজ্জায় মাথা নামিয়েছিল, “ও কিছু না। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিলাম। অথচ পড়া হয় নি। ইচ্ছে করে, হবে না। আপনার বই পড়েছি।”

ভদ্রা আমার দিকে আর-একবার তাকিয়ে কয়েকটা বইয়ের নমক করেছিল। তুড়ি বা ওর দিদিদের মুখে কোনোদিন বই পড়ার কথা শুনি নি। আর জানতাম, ওরা নাকি আমার বই পড়েছে। ইতিমধ্যে একজন মাঝবয়সী

ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দীর্ঘাঙ্গ, খালি গা, ধুতি পরা, গলায় উপবীত। ভদ্রা বলেছিল, “আমার বাবা।”

আমি তড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ভদ্রার বাবা বলেছিলেন, “বহন বহন। দেখেছি, শিবনাথের বাড়িতে আপনি আসেন। আমার মেয়েটা আস্ত পাগল। ওর খুব ইচ্ছে, একদিন আপনার সঙ্গে কথা বলবে। তা আজ দেখছি, ওর কপালে তাই ঘটল।”

“এতে কপালের কী আছে?” আমি লজ্জিত হেসে বলেছিলাম।

ভদ্রার বাবা একটি দীর্ঘাঙ্গ ফেলেছিলেন। হঠাৎ কোনো কথা বলেন নি। ইতিমধ্যে ভদ্রা কোথায় গিয়েছিল দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওর বাবার সঙ্গেই কথাবার্তায় জেনেছিলাম, উনিও বিপত্নীক। এক সময়ে গ্রামের স্কুলে পড়তেন। এখন কেবল চাষবাস-সংসার নিয়েই আছেন। বড় মেয়ে আর দুই ছেলের বিয়ে হয়েছে। দুই ছেলেই বাইরে থাকে। একজন কলকাতায়, আর-একজন ধানবাড়ে। সংসারে জীলোক বলতে, অবিবাহিতা ভদ্রা ছাড়া কেউ ছিল না।

ভদ্রা এসেছিল, এক কাপ চা হাতে নিয়ে। অল্প হাতে একটি বাটিতে দুটি মিষ্টি। আমি বলেছিলাম, “মিষ্টি খান না, চা দাও।”

চা খেয়ে বিদায় নিয়েছিলাম। ভদ্রা দরজা অবধি এসে বলেছিল, “আমাদের বাড়ি এসে কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না। ও বাড়িতে সবাই রাগ করবে।”

“কেন?”

ভদ্রার মুখ করুণ আর গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, “মনে হল, তাই বললাম। আর কোনোদিন আসবেন আমাদের বাড়িতে?”

“আসব।”

ভদ্রা তাকিয়েছিল আমার চোখের দিকে। বেলা তখন শেষ রক্তাভায় রক্তিম। পুঙ্খের নিস্তরঙ্গ জলে তারই আভা। ভদ্রার চোখে আমার আবেগ দেখা দিয়েছিল। কেবল বলেছিল, “আপনি এলেই ও বাড়িতে ছুটে যেতাম। আর যাব না। একবার ঘুরে গেলেন আমার সব সাধ মিটে গেল।”

কথা শেষ করতেই যেন ওর স্বর বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি তুড়িদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ঠাণ্ডুর দালানের উঠানে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। তুড়ি বা ওর দিদিরা কেউ ছিল না। আমি বাড়ির ভিতরে গিয়েছিলাম।

কারোকে দেখতে পাই নি। ঘরের দিকে যেতে গিয়ে উঠান থেকে ডেকেছিলাম, “তুড়ি।”

গোটা বাড়িটা নিস্তব্ধ। দক্ষিণের বাগান থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছিল। খালি উঠানের কোথাও ধান পড়ে নেই। তবু পায়া আর চড়ুই কয়েকটা ছিল। পিসীমাই বা কোথায় গেলেন? ভাবতে ভাবতে আমি একতলা পাকা অংশে দালানের বারান্দায় উঠেছিলাম। আবার ডেকেছিলাম, “পার্বতী!”

কোনো সাড়া পাই নি। অথচ বাড়ির দরজা-জানালা সবই খোলা। জানে আমি আসব। কোথায় ওরা?

পিসীমাই বা কোথায়? সে-বাড়িতে আমার অবধি প্রবেশ। দালানের ভিতর ঢুকেছিলাম। ঢুক অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম, শ্রামা দালানের একপাশে বসে কয়েকটা স্থায়িকনের চিমনি মুছছে। তুড়ির চুল বেঁধে দিচ্ছে দুর্গা। পার্বতী কুলোয় রাখা চাল থেকে ধান বাছছে। কেউ আমার দিকে ফিরে তাকায় নি।

বুঝতে পারছিলাম, দৃশ্টি ঋদ্ধাঙ্গ নাটকীয়। ওরা ওদের কাজে যতটা মনোযোগী দেখাচ্ছিল, আসলে তা না। আমি অবাক হই নি। ওদের ঐরকম ব্যবহারের কারণ অহমান করতে পেরেছিলাম। অপমান বলতে যা বোঝায়, তা ঠিক অহভব করি নি। মনে মনে একটু কষ্ট পেয়েছিলাম। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিলাম, “তোমরা ব্যস্ত আছ, চলি।”

“কোথায় যাবেন?” সম্ভবত দুর্গাই জিজ্ঞেস করেছিল।

“কলকাতায়।”

“আমি ভালোম, ভদ্রাদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।” পার্বতী বলেছিল।

শ্রামা উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল, “দিন, ব্যাপটা দিন।”

দেবার অপেক্ষা না করে সে নিজেই আমার কাঁধ থেকে সাইড ব্যাগটা টেনে নামিয়ে নিয়েছিল। আমি বাধা দেবার অবকাশ পাই নি। বলেছিলাম, “কিন্তু আমি কোনো কারণে তোমাদের অস্থবিধে করতে চাই নে। ভদ্রাদের বাড়ি গেছলাম। তোমাদের সেটা ভালো লাগে নি। সেইজন্য আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছ। অথচ ভদ্রার কী দোষ, বলবে বলও বলো নি। আমার কিন্তু মনে হয়েছে, ওদের বাড়ি গিয়ে আমি কোনো দোষ করি নি।”

তুড়ি সেই সময় ফুঁপিয়ে কঁদে উঠেছিল। দুর্গা ধমক দিয়েছিল, “এই,

এ মেয়ে এ সাজবেলায় এখন কাঁদতে বসল। উনি কিস্তিটা চলে যাচ্ছেন নাকি ?”

শ্রামা বলেছিল, “চলুন, হাতে মুখে জল দিয়ে এসে বসবেন। একবার চা খাওয়া হয়েছে। আবার চা খাবেন। ভদ্রার কথা বলব বলব করব বলতে পারি নি। আজ পোড়ার মুখে সেই পালার কথা বলব।”

দেশের কতটা পরিবর্তন হয়েছে, সব সময় বুঝতে পারি না। বাইরের পরিবর্তন দেখতে পাই। শহরে বা গ্রামে, মাঘের গুণগত পরিবর্তন কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। শ্রামার মুখে ভদ্রার কথা শুনেছি। ভদ্রাদের পরিবার গ্রামে একঘরে। অপরাধ ভদ্রার। ওর পনেরো বছর বয়সে, ওকে কারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল এক সন্ধ্যায়। পরের দিন, গ্রামের বাইরে খালের সীকোর ওপারে ভাগাড়ের কাছে ওকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। বর্ষমানের হাসপাতালে ও প্রাণে বেঁচেছিল। বেঁচে থাকাটাই ওর অপরাধ। মরে গেলে আপদ চুকত। কিন্তু কোন মুখ নিয়ে ভদ্রার বাবা ভদ্রাকে নিয়ে আজও গ্রামে বাস করছে, বিশ্বাস সকলের।

সত্যি, কোন মুখ নিয়ে ভদ্রলোক সেই মেয়েকে নিয়ে, সকলের প্রতিবাদ ফিটার নিয়েও, মেয়েকে নিয়ে গ্রাম বাস করছিলেন? প্রশ্নটা আমারও। আর আমার চোখের সামনে, বাবা মেয়ের ছবি ভাসছিল। সে-বার আসবার সময় ঘোষালমশাইয়ের মেয়েদের বলে এসেছিলাম, “আবার যদি তোমাদের বাড়ি আসি, তখন ভদ্রাকে ডেকে এনো। না যদি আনো চিঠি লিখে জানিজো, তোমাদের বাড়ি আর আসব না।”

জবাব পেয়েছিলাম চিঠিতেই। লিখেছিল শ্রামা, “আপনি কি চান, আমার আরও তিনটি বোনের জীবন নষ্ট হোক? ভদ্রা আমাদের বাড়ি এলে, আমার অবিবাহিত বোনদের বিয়ে হবে না।”

সেটাও বোধহয় সত্যি কথা। কিন্তু আমি আর ঘোষালমশাইয়ের বর্ষমানের গ্রামের বাড়িতে যাই নি।

যোদ্ধা

মহাপ্রভা দেবী

আজ বহুকাল হল স্বকুমারবাবু প্রত্যক্ত সংগ্রামে নেমে গেছেন। যোদ্ধার মারদাঙ্গা ভূমিকাটা কখনোই তাঁর পছন্দ নয়। কৈশোরে যখন পাড়ার রূবে অভিনয় করতেন, তখনো লড়াই ভূমিকা তাঁর পছন্দ ছিল না।

তবু তাঁকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে এবং কারা যেন তাঁকে বাধ্য করেছে। সবটা স্বকুমারবাবু বুঝতে পারেন না। তবে এটা বোঝেন যে ভেতরে ভেতরে প্রায়ই ভীষণ রাগ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

শত্রুকে মেরে কেলতে ইচ্ছে করে।

এ রকম হওয়া যে কত খারাপ তা তাঁকে অজিত কবিরাজ বোঝায়।

অজিত “কবিরাজ” কিন্তু “কবিরাজ” শব্দের সঙ্গে যে-সব জিনিস জড়িত, যেমন প্রায়াকার ঘর, মলিন তাক ও আলমারিতে স্থপাঠীন শিশি ও বোতল পুরনো ঘিয়ের কটু গন্ধ এবং বিবর্ণ চেহারার কবিরাজ—সে-সব অজিতের এখানে মেলে না।

ছিলেন, অজিতের বাবা তেমনই ছিলেন। রোগী আসত না এবং তিনি স্বকুমারবাবুকে ধরে বসিয়ে অভ্যস্ত গোপন সংবাদ দেবার চেষ্টে কিসকিন্দে পলায় বলতেন, আমার পূর্বপুত্র ছিলেন মহারাজ লক্ষণ সেনের ব্যক্তিগত কবিরাজ। প্রচুর ভূসম্পত্তি ছিল হে আমাদের। টাউনে প্রসিদ্ধামহের নামে রাস্তা আছে।

অজিতের চেম্বার শীততপনিয়ন্ত্রিত। বগার জায়গা স্বসজ্জিত, টেলিফোন, বড় টেবিল সবই আছে এবং পাওয়ারপাক। দেয়ালে অজিতের বাবার যে ছবি ঝোলো তাতে তিনি শাল ও পাঞ্জাবিতে অভ্যস্ত স্বসজ্জিত এবং ছবি বিশ্বাসের মতো দেখতে।

গুটি অজিতের পিতৃভক্তির নিদর্শন। তিনি দেখতে ছিলেন রুগ্ম শিশুি মাছের মতো। ছবিতে তিনি স্বপুষ্ক। জীবনে তিনি শোয়ালদার ঘোড়ের লাড়ে ছয় টাকায় তৈরি পাঞ্জাবির ওপরে ওঠেন নি। ছবিতে দামী পাঞ্জাবি ও শাল পরেছেন। এ ভাবেই অজিত, জীবিত পিতার সব দুঃখ ওই ছবিতে দর করেছে।

অজিতের রমরমা উৎস শতশত ধনী নরনারী, যাদের মধ্যে বাঙালী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, দক্ষিণ ভারতীয়, সবই আছে।

এরা আশার আগে অজিত বছরখানেক দোকান বন্ধ রেখে কুচবিহারে বাসসা করার চেষ্টা করছিল। তারপর জানা গেল, সে ছিল হিমালয়ে এবং কোনো সাধুপ্রদত্ত বিধানে সে যে বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরি করছে, তা সেবনে পুষ্ক ও রমণী সদাপটে যৌবন ধরে রাখতে পারবেন।

কেমন করে যেন বাপারটা লেগে যায়। যৌবন সালসা বিক্রি হয় না। এসে যেতে হয়। কার কতটা দরকার তা অজিত বিচার করে।

এই যৌবন সালসার দৌলতে অজিত বাসাবাড়িটুকি কিনেছে। চেষ্টারকে করেছে আধুনিক। স্ক্রুয়ারবাবুর প্রতি এখনো সে স্নেহশীল। তাঁর দরবারে অজিত মাথার যন্ত্রণা, তাঁর বায়ের ইপানি, এ সবের চিকিৎসা করে।

অজিতকে স্ক্রুয়ারবাবু বলেছিলেন, হঠাৎ হঠাৎ রাগ উঠে যায় আজকাল।

—বায়ু, পিত্ত, কিছুই এ করলে শাসনে রাখতে পারবে না স্ক্রুয়ার।

—কেন এমন হয়?

—তাই তো! রাগ ঝাল তো তোমার স্বভাবে ছিল না। ভাবিয়ে হুললে।

অজিত তাঁকে কিছু ওষুধ দিয়েছিল। ডাক্তারী ওষুধ। অনেক ডাক্তার তার কাছে আসে। অজিতের পশার এখন কুদে।

ওষুধগুলি খেয়ে স্ক্রুয়ারবাবুর কোনো উপকার হয় নি। ভবানী মিস্ত্রি লেনে এক অজিতের বাড়িটি স্বকরকে হয়ে উঠেছে। অজ্ঞ সব বাড়িই পথটির মতো জরাজীর্ণ। সেখানেই তাঁরও বাস। জী, তিন মেয়ে, দুই ছেলে, মা। তিনটি বড় ঘরে কলানো উচিত। পঞ্চাশ বছর ধরে আছেন। ভাড়া কম, ঘরও বড়।

কিন্তু অসম্ভব ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে ঘরগুলি। এমন করে জমে উঠেছে বাট, চৌকি, আলনা, বান্ধ, পেটরা যে বড়তে জারগা মেলে না।

স্ক্রুয়ারবাবু এক অত্যন্ত ছোট আপিসের কেরাণী। গুর ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই বুকেছিল যে সংসার গুরু করার সূময়েই তাদের বাবার দম ফুরিয়ে গিয়েছে।

বাবার জন্তে গুরা অপেক্ষা করে নি। বড় ছেলে স্থল ছেড়ে দিয়ে ইলেকট্রিক মেয়ামতির কাজে লেগে যায়। বাইশে না পড়তেই সে যথেষ্ট চোয়াড়ে

সংসারে তার অবদান তিনটি রেশনের টাকা। বড়ো মেয়ে এক দর্জির দোকানে বসে জামা সেলাই করে। একটি রেশনের টাকা ও ঠিকে কির মাইনে সে দেয়। মেজমেয়েকে অজিত এক মারোয়াজী বুদ্ধার সেবিকার কাজে দিয়েছে। সে সেখানেই থাকে। মাকে মাকে দেখা করে: বায় এবং পুজোর সময়ে সকলকে ক্যাপড় দেয়। সর্বদা সে নাইজনের সাদা থান ও সাদা পুরোহাতা জামা পরে এবং তার গলায় থাকে কল্ডাক্সের মালা। তার মনিবানীর সঙ্গে ব্রহ্মদক প্রজাপতি আশ্রমে বেতে যেতে তার মধ্যে নাকি ধর্মভাব এসেছে। মাইনের টাকা সে জমায়।

ছোটো মেয়ে মাধ্যমিক পাস করে টিউশানি করছে বলে তিনি শুনেছেন। সে খবরের কাগজটির দাম দেয়, যথেষ্ট ভালো জামাকাপড় পরে, নানা ভঙ্গিতে ছবি তোলায় এবং সিনেমায় নামার জন্য পিজাপন দেখে আবেদন পাঠায়।

ছোটো ছেলে ফুটবল খেলে। স্থলে আর সে যায় না। শোনা যাচ্ছে, ফুটবল খেলায় তার যথেষ্ট এলোম এবং খেলা থেকে সে এক উজ্জল ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারবে।

এদের সঙ্গে স্ক্রুয়ারবাবুর সম্পর্ক অত্যন্ত দূরত্বের। কোনো কথা বলতে গেলে গুরা খুব হিংস্র চোখে তাকায়। যে বাবা জীবনে কোনো ভাবেই তাদের সাহায্য করতে পারে নি, তার কাছ থেকে কোনো কথা তারা শুনবে না।

স্ক্রুয়ারবাবু চুপ করে যেতে থাকেন। পরে গুদের মাকে বলেন, তুমিও কিছু বলা-না।

—কী বলব? আমার অক্ষম, গুরা নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিচ্ছে।

বড়ো ছেলের সঙ্গে একদা স্ক্রুয়ারবাবু কিছুটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বড়ো ছেলের সে কথাটি মাকে মাকে মনে পড়ে রাত এগারোটার পর। বারান্দায় তার তক্তাপোশে শুয়ে ঘুমজড়ানো গলায় সে বাবাকে বলে, তোমাদের কোনো ভাবনা নেই বাবা। মাকে বলে দিয়ে, বেলুর ওপর আমি চোখ রেখেছি। কোটো তোলাক আর যা ককক, সিনেমায় গুকে নেবে না। আমি গুর বিয়ে দেব। যুদ্ধে যখন নেমেছি, তখন পেছাপাও হব না।

বড়ো মেয়েও মাকে মাকে মার অহুযোগের জবাবে বলে, যোলো বছর বয়স থেকে যুদ্ধ করছি মা, জামার মজুরি তপনবাবু নিয়ে সাত টাকা, আমি পাই মাসে দেড়শো, কথা আর মিষ্টি থাকে? বয়স তো আটশা হল।

সকলেই যুদ্ধের কথা বলে। জীর মুখে তো সর্বদা এক কথা, আমি না বাছা অত কথা। কলের জল হুতলি সমান, গাড়ি এলে যুদ্ধ করে জল নেব, উঠনে করলা জলতে চায় না, সে এক যুদ্ধ। তারপর তোমাদের ঠাকুরমার সর্বধ করব। কেউ কুটো ভেঙে ছুটো কর?

সুহৃদ্যবাবু এভাবে “যুদ্ধ” শব্দটি প্রায় শোনেন। মাঝে মাঝেই যুদ্ধ তাঁর দোরগোড়ায় এসে পড়ে। যখন মস্তানরা শুরু করে অক্লান্তবলের লড়াই বেগীবাবু লেনে।

সে যুদ্ধের ধাক্কা তাঁকেও খেতে হয়। বড়ো মেয়েকে দোকান থেকে আনতে যায় বড়ো ছেলে। ছোটো ছেলে দৌড়ের ছোটো মেয়ের ছাড়াই। তিনি রাজেন নিয়োগী লেনে “কমিট নো হুইসেল” নির্দেশের “নো” মুছে ফেলা ফলকের নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন। বেগীবাবু লেন না পেরোলে ভবানী মিস্ত্রি লেনে ঢোকা কঠিন।

ভোরের কাগজ খুললে বিদেশে যুদ্ধের খবর এবং নানাবিধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান থাকে সুহৃদ্যবাবুর প্রতি। সে আফ্রান ভালো কাগজে হৃদয় ছাপা পোস্টারে তাঁকে শহরের সর্বত্র অহুসরণ করে।

ক্লাস্ত সুহৃদ্যবাবু রাতে যখন ফেরেন, তখন তাঁর ঘরগুলি জ্বরদগ্ধল করে আরশোলারা। দেয়ালে, পেন্ডেতে, খাবারের খালার ওপরে চলে তাদের সানন্দ বিচরণ। ঘেরা, ঘেরা! তাঁর জী বলেন।

ঘরে বেগন প্রে দেয়া সম্ভব নয়। মাগের নিখাসের কষ্ট হয়। চতুর পোকাগুলি আরশোলা মারা বিষ খায় না। আরশোলা দমনে কী করা যায় তাই ভেবে ভেবে তিনি ঘুমনে।

অজিত বলে, এ তো সহজ হে। খবর দিলে সার্ভিস থেকে এসে সব মেয়ে দাক করে দেবে।

—তখন তো ঘর ছেড়ে দিতে হয়। মাকে কোথায় রাখব?

—দেখ! মাত্র পচিশ-ত্রিশ টাকা নেয়।

যেদিন অজিত বলে, বাড়িটা ছাড়ো।

সেদিন সুহৃদ্যবাবুর হঠাৎ অজিতের ওপরই রাগ হয়। মনে মনে বলেন, সবাই তোমার মতো চারপাশে বিশ? একটা গরিব কেমিস্টকে দিয়ে ওষুধ করাচ্ছে, সালাদ বলে ঢালাচ্ছে আর টাকা পিটছে?

তখন অজিতকে ডিসমস করে ফেলে দেন মাটিতে। মনে মনে। মুখে বলেন, ঠিকই বলেছি।

কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যান তিনি। শেষ অবধি অজিতের ওপর চটে যাচ্ছেন? এ কি হয়েছে তাঁর? হঠাৎ হঠাৎ থাকে তাকে শত্রু মনে হচ্ছে কেন?

এ একটা সমস্যা। কিন্তু কাকে বলবেন? কে বুঝবে? এই যে আপিসে আজ, গায়ের জামার দাম জিগোস করতে মলয় কি রকম তাচ্ছিল্যভরে বলল, জেনে আপনার হবে কি? কিনবেন তো দশ টাকার বস্তাপচা রেডিমেন্ড মাল।

তখন তো মলয়কে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন চলন্ত বাসের সামনে। মনে মনে। এ রকম কেন হচ্ছে?

কেন হচ্ছে তাই ভাবতে ভাবতে সুহৃদ্যবাবু বাজারে যান। বাজারে তাঁকে বড়ো নাকাল হতে হয়। পকেটে দশ টাকা এবং খাবার লোক সাত জন। মাছের দিকে তাকানোই বাতুলতা। মাথা নিচু করে হেঁটে যান তিনি। হুপাশে ইলিশ, শুধুই ইলিশ। ত্রিশ টাকা, ত্রিশ টাকা। হাঁটতে হাঁটতে বিক্রেতাদের সোলাস চীংকার কানে আসে।

—দেখে নিন, দেখে নিন।

—কি ইলিশ! যেন অমিভাব বচন।

—দেখবেন, না কিনবেন?

—আরে ভাই! কেউ আসে দেখতে, কেউ আসে কিনতে। আবার বুদ্ধিমান দেখেও না।

—হ! তারা তালাপিয়া কিনে।

এ-সব তিনি রোজই শোনেন, কানে নেন না। আজ মনে হয়, যারা কিনতে পারে না, ওরা তাদের তাচ্ছিল্য করছে। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে তিনি হয়ে যান কোনো ভয়ংকর সময় নায়ক। মাছ ব্যবসায়ী, ফড়িয়া ও বিক্রেতাদের দাঁড় করিয়ে দেন বনুকের সামনে। আলুপটির সামনে পৌঁছে চেনা দোকানে দাঁড়িয়ে প্রথমে বলেন, ক্যার! তারপর বলেন, আটশো দিগো।

তারপর “ক্যার” কেন বললাম, এ কথা ভাবতে ভাবতে বাজারে ঘোরেন। বাজার থেকে বেরোবার সময়ে উপলব্ধি করেন, মুখের ভাব তাঁর একই রকম ছিল এবং গলার স্বর একবারও ওঠে নি। কিন্তু লাঠা মাছ

বিক্রোতাকে তিনি ফেলে দিয়েছেন নর্দমায়। পুঁইশাক বিক্রেতা বড়িকে মাত্র কয়েকবার নীলডাউন করিয়েছেন ও টেনে তুলেছেন এবং শেষ অবধি মেশিন-গান দেখিয়ে বাজারে সব মাছের দর দুই টাকায় বেঁধে দিয়েছেন।

তাকে যুদ্ধ কে নামাল? কে? মোটা কাচের পিছনে মিটমিটে ও নিশ্চল চোখ দুটি তোলেন এবং “যুদ্ধের বিরুদ্ধে...” ইশ্বাহারগুলি চোখে পড়ে।

এমনি করেই স্বকুমারবাবু দুভাগ হয়ে যেতে থাকেন। অজিত তাকে দেখে খুবই চিন্তিত হয়। তাকে পাঠায় তার বন্ধু মনোজিতের কাছে। মনোজিত মানসিক রোগের চিকিৎসক এবং অজিতের সালসার কল্যাণে সে নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে।

স্বকুমারবাবুকে সে কথা বলতে দেয়। স্বকুমারবাবু খুবই কাতর হয়ে পড়েন। সবসময়ে মনে হয় যুদ্ধ করছি, একে তাকে মারতে ধরতে ইচ্ছে যায়।

—মারেন কি?

—মনে মনে।

—কি রকম?

—এই ধরুন, আপনি তো কতই ভালো ব্যবহার করছেন, কিন্তু আপনার ঘরদোর দেখে প্রথমেই রাগ হরেছিল আর মনে মনে আপনাকে এই সাততলা থেকে নিচের ফুটপাথে ফেলে দিয়েছিলাম।

—কী সর্বনাশ!

—যেই শুনলাম ওই বউটি কাঁদছে আর বলছে, এতদিন আগছি ডাক্তারবাবু, কই, আমার মেয়ের কিট হওয়া তো বন্ধ হল না? এমন দামী দামী ওষুধ ঘন পান্টাচ্ছেন, আমরা যে জেরবার হয়ে গেলাম। তাই শুনেই রাগ হয়ে গেল। কিন্তু সবই মনে মনে।

মনোজিত তবু স্বস্তি পায় না। জানলার গ্রীল লাগাতে হবে। বলা যায় না কবে কি করে।

—আমার কী হয়েছে?

—প্যারানয়েডিজম।

—এটা কী অস্ত্র?

—মানসিক।

—কেন হল?

—না হওয়াটাই তো অসম্ভাব্য। যা দিনকাল। সামাজ্য এবং বাধা

রোজগারে দিন চালানো তো একটা যুদ্ধ। তাই সব-কিছুকে মনে করছেন শত্রু।

—এই মনে করাটা কি সত্যি নয়?

—সত্যি কি হতে পারে?

—পারে ডাক্তারবাবু, পারে। আপনি এমন বোঝেন! আপনাকে কথা বলতে খুব শক্তি পাচ্ছি।

—বলুন না।

—মনে করছি না ডাক্তারবাবু। সত্যিই ভীষণ সব শত্রু চারপাশে। যেমন ধরুন আরশোলা।

—আরশোলা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আরশোলা। সন্ধ্যা হলেই উড়বে, খুববে, ভাতের থালায় পড়বে। রাতে ঘুমোতে দেবে না। বেগন ছেঁটাব? পরসাতে কুলোর না। আর আমার মায়ের হাঁপানি আছে, নিখাসের কষ্ট হয়।

—আরশোলা!

—নিশ্চয়। ওরা আমাকে কষ্ট দেয়, আমি ওদের কিছু করতে পারি না। তারপর দেখুন...

স্বকুমারবাবু ঝড়ের বেগে বলে যান।

বাকুইপুরের বেগুন, অথবা গন্ধার মাছ তাঁর শত্রু। কিছুই তাঁর হাতে থাকে না। তাঁর চোখের সামনে বড়ো মেয়ে দজির দোকানে কল চালিয়ে চালিয়ে খুবড়ো হয়ে গেল, মেজ মেয়ে কোথাও ঝি হয়ে আছে বলেই তাঁর বিশ্বাস। সংসারের এই ছমছাড়া হাল এর পিছনেও তো আছে শত্রুতা।

—কেমন করে?—মনোজিত ক্রমশ আগ্রহী হয়ে পড়ছে স্বকুমারবাবুর ব্যক্তিত্বে। একই সঙ্গে সে বিপদও বোধ করছে।

—আমার অবস্থা এমন কেন?

—এমন অবস্থা লক্ষ জনের।

—লক্ষ জনের অবস্থা এমন কেন?

—তা বলতে গেলে তো...

—বাড়ি ফিরব; তবু ফুটপাথ অবধি পাই না। রাত্তা তো এখন গাড়ির বাসের।

—এইসব কারণে আপনার রাগ হয়?

—এই রকম লক্ষ্য কারণে।

—আপনি কাগজ পড়েন না?

—পড়ি।

—দেশের অবস্থার জগ্গেই এরকম হয়।

—না না। এ আপনি কী বলছেন? কতজন ভালো আছে তা দেখতে পান না? এই তো অজিত...

—সে কী করল?

—সে তো ভালো আছে। ভালো আছে ব্যাচেলার, সোর্ড আর হাবার্ট।

—তারা কারা?

—মস্তান। পাড়ার মস্তান।

—আপনি এই গুপ্তগুলা খাবেন।

—সব সময়ে কেন মনে হয় যুদ্ধ চলছে?

—এখন তো জীবনটা যুদ্ধই।

—না না, সকলের বেলা নয়। আমার মতো অবস্থা নাকি লক্ষ্য জনের, আপনি বললেন।

—বহু জনের।

—আমার কথাই বলতে পারি। কিছুই তো চাই নি আমি। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার মতো শান্তিতে থাকব। কিন্তু কারা যে আমাকে প্রতি মুহূর্তে... মনে হয় ঠেলছে। কেবলি ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে ফেলে দিতে চাইছে। অথচ তা, আপনি বলছেন, সত্যি নয়।

—এই গুপ্তগুলা খাবেন।

—অজিত গুপ্ত দিয়েছিল, আপনি গুপ্ত দিচ্ছেন, গুপ্তে কি আমি ভালো হব?

—থেকেই দেখুন-না।

—বেশ! খাব!

—তা হলে কি করবেন? রাগ হলেই মনে আসছে যে-সব চিন্তা... তাই করবেন?

—আমি তো কখনো কাউকে মারি নি। কখনো কিছুই করি নি। বিপাশ করুন। চিরকাল মার খেয়ে গেছি মুখ বুজে। বড়ো মেগোটা তো একসময়ে দেখতে ভালো ছিল। ওর বিয়ের কথাও হয়েছিল। টাকার জোপাড় করতে

পারি নি বলে বিয়ে হল না। বাপ হয়ে বসে থেকেছি। এখন অবশ্য ওকে ওর মায়ের বয়সী বলেই মনে হয়।

—আপনার মেয়ে তো নিজেও বিয়ে করতে পারত। এখন তো আকছার করে।

—করবে না কেন? আমার বোনের মেয়েরাই করল। আমার মেয়েরা যে তেমন নয়।

—অজিত একটি মেয়েকে সার্ভিসে দিয়েছে না?

—হ্যাঁ। এক মারোয়াদী বুদ্ধিকে সেবা করে। তাকে সার্ভিস বলেন, সার্ভিস।

—এই গুপ্তগুলা খাবেন। কিভাবে খাবেন তা লিখে দিলাম।

স্বকুমারবাবু গুপ্ত নিয়ে চলে আসেন। মনোজিত পরে অজিতকে বলে, তোমার বন্ধু খুবই ডিসটার্বিং লোক, বুঝেছ?

—কেন, কেন? সে তো অত্যন্ত শান্ত।

—না হে।

—কি হয়েছে ওর?

—প্যারানয়েড। ছনিয়াকে শত্রু মনে করছে।

—কারণ?

—কারণটার মধ্যে ওর কথা শুনলে মনে হবে প্রচণ্ড যুক্তি আছে।

—কেন, কেন?

—নিম্ন মধ্যবিন্ত শ্রেণীটা যে শহর থেকে মুছে যাচ্ছে, ও যেন তাদের একজন হয়ে...

—ইনটারেক্টিং।

—এখনো ও বিপজ্জনক নয়।

—হতে পারে?

—পারে।

—সে কি?

মনোজিত বুঝে পায় না, অজিত কেন এত উদ্বেগ হচ্ছে। সে বলে, ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। এখনো ও, বাদের শত্রু মনে করছে, তাদের মনে মনে শান্তি দিচ্ছে। হঠাৎ কোনো কারণে ও সীমান্তরেখা পার হয়ে চলে যেতে পারে। তখন হয়তো—

—মেয়ে ধরে বসল ?
 —করতে পারে তেমন কাজ।
 —কী সর্বনাশ! ওকে বুঝিয়ে পটিয়ে হাসপাতালে পাঠাব ?
 —ব্যাপারটা শুধু ডাক্তারি জগতের নয় হে। এর মধ্যে সমগ্র সমাজটাই আছে।

—বলো, বলো। তুমি তো আবার রাজনীতি করতে। সমাজ টমাজ বলতে।

—ছাড়ো সে সব। কবে ভুলে গেছি।
 —স্বকুমারের কথাই বলো।
 —ভয়ংকর আর্থনৈতিক চাপ। মূল্যবোধের পরিবর্তন। ও জানে না যে ও কিছু বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই শত্রু মনে করছে।

—বলো কি!
 —ধরো কোনো ভারোলেট কাজ করে বসল। তারপর ও প্যারানয়েড থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে। তখন ও আর অস্থস্থ থাকছে না।

—কিন্তু তেমন কাজ কি ওকে করতে দেয়া যায়? সেটা কি ঠিক হবে?
 —ডিসটার্ভিং, কি বলো?
 —নিশ্চয়।
 —আমিও ডিসটার্ভড হয়েছি।
 —তুমিও?
 —নিশ্চয়। অবস্থা অল্প কারণে।
 —কেন?

—সাততলায় চেয়ার। ফ্ল্যাট কিনেছি এখানে তোলায়। কিন্তু কি ফ্ল্যাট থেকে, কি চেয়ার থেকে, নিচের রাস্তার মাছগুলোকে পিঁপড়ে মনে হয়। ওদের মধ্যে কতজন তোমার বন্ধুর মতো 'মনে মনে ভীষণ রাগ নিয়ে খুঁজছে, প্যারানয়েড হয়েছে তাদের, অথবা ওটা কি প্যারানয়েড? খুব ডিসটার্ভিং চিন্তা হে, ভাববার কথা।

এভাবে মানোজিত অজিতকেও অত্যন্ত অস্থস্থিতে ফেলে বিদায় নেয়।

প্রী বলে, কী হয়েছে?

—কিছু নয়।

—এত গুরুত্ব কেন?

—ডাক্তার দিল... শরীরটা ভালো থাকে।
 —আজ মিলু এসেছিল।
 —হঠাৎ?
 —হঠাৎই। কিছু বলল না। খানিকক্ষণ বসে থাকল। তারপর চলে গেল।

—আরেকটু বসলে দেখা হত।
 —ও হয়তো ওখানে ভালো নেই। এত গভীর, এমন চাপা তো ছিল না। মারোয়ডী বাড়ি, সে বা কেমন! বাড়ির হাল দেখে চপ করে থাকে।
 —অজিত নিয়ে গেল, তখন যেতে দিলাম। আজ হলে যেতে দিতাম না।
 —ওকে নিয়ে এসো।
 —আগে এমন এসেছে?
 —না তো।

যাব যাচ্ছি করতে করতে এসে পড়ে মিছিলের দিন। আর সকালে অজিতকে এসে হাজির হতে দেখে অত্যন্ত অবাক হন স্বকুমারবাবু।

—কী ব্যাপার?
 —মিলু যায় নি কেন?
 —মিলু? কোথায় যাবে?
 —কাল বিকেলে বাড়িতে কী দরকার আছে বলে বেরিয়েছে।
 —সে তো এখানে আসে নি?
 —আসে নি?
 —না।
 —তা হলে?

—তারাতো বরাবর গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। কাল মিলু একা বেরোল?

—জানি না।
 —জানি না বললে তো হবে না। তোমাকে জানতে হবে। তুমিই তো তাকে দিয়েছ।

অজিতের মনে পড়ে মনোজিতের কথা। স্বকুমার কখন, কোন্ সময়ে ভীষণ উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠবে, কে বলতে পারে?

অজিত বলে, সব তো বলেছি ভাই। বুড়ি একা থাকে, ছোটো ঝি আছে।

কোনো বেটাছেলের ব্যাপার লেই। ধর্মকর্ম করে, মন্দিরে যায়। ছেলেরদের ব্যবস্থা যে একটি মেয়ে কাছে থাকল। কাগজ পড়ে শোনাল। ওষুধপত্র দিল, মাসে একশো টাকা, খাবে ওখানে। মিলু তে লেখাপড়া বেশি নয়...

—তোমাকেও খুঁজতে হবে।

—আমাকে!

—নিশ্চয়। যা হয়েছে তা ওখানে হয়েছে। নয়তো তার কোনো বন্ধু-বান্ধবও যায় না, নেই তো যাবে কোথেকে? কোথায় গেল? লাউডন স্ট্রীটে ফ্যাটি। সেখান থেকে এখানে...তোমার দায়িত্ব নেই?

অপত্যা অজিত গাড়ি বের করে। প্রথমে লাউডন স্ট্রীট। না, বুদ্ধা কিছুই জানেন না। একটি উদ্ধত চেহারার ও বচনের যুবক বলে। আন্টি কী জানবেন? কাজ করত, চলে গেছে। বাস্।

—আপনি কে?

—আমি এঁর বোনপো।

বুদ্ধা এ যুবককে, স্বরেশ! স্বরেশ!—বলে থামতে চেষ্টা করেন। স্বকুমার অজিতকে বলেন, লালবাজারে চলো। এদের নামধাম লিখিয়ে তবে ভায়েরি করব। এদের ঘর থেকেই মেয়ে গেছে।

—একবারে লালবাজারে?

—নিশ্চয়। তোমার কে আছে না? এদের কথাবার্তার রকম দেখছ না? যেন কাজ করবার ঠিকে ঝি চলে গেছে।

এ কথায় বুদ্ধা খুব কাতর হন ও হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, না না।

মিলু আমার কাছে মেয়ের মতোই থাকে।

—যেতে দাও আন্টি।

—স্বরেশ! স্বরেশ!

তারপর লালবাজার। অজিত অত্যন্ত বিরক্ত, অত্যন্ত বিপন্ন। কিন্তু স্বকুমারবাবু তাকে দাবড়ে তাকে দিয়ে সব কাজটা করিয়ে নেন।

তারপর অজিতের গাড়ি বুদ্ধবিরোধী মিছিলের জামে পড়ে।

অনেক, অনেক পরে ফেরেন ওঁরা।

আর রাত দশটায় বড়ো ছেলে হাজির হয় মিলুকে নিয়ে।

এসে বলে, বাড়ি আসতে সাহস পায় নি। যাদবপুরে পিসির বাড়ি চলে গিয়েছিল। পিসি পৌছতে আসত, আমি মানা করলাম।

স্বকুমারবাবু সারাদিন উপবাসী। মিলুকে দেখে সে কণ্ঠ গুঁর মনে থাকে না।

—মিলু! কী হয়েছিল রে?

মিলু কাদতে শুরু করে। বুদ্ধা বিষয়ে তার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু কিছুদিন হল স্বরেশ নামে ওঁর এক আত্মীয় আসতে শুরু করেছে। সে খুবই বিরক্ত করছিল। কাল দুপুরে সে মিলুর ঘরে ঢুকে পড়ছিল। তখন মিলু ভয়ে বেরিয়ে এসেছে। কোনো কিছু না নিয়েই।

—বেশ করেছিল।

—এখন কী হবে?

—কী আবার হবে, বাড়িতেই থাকবি। তোকে যেতে দেয়াই তো আমার উচিত হয় নি। সময়ের কাজ সময়ে করি নি বলে তোদের এমন জুঁদাশ।

—অজিত কাকা কিছু বলবে না?

—তার সাধ্য কি?

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। তারা তো বোঝে না যে যা করতে ইচ্ছে হয় তা করে ফেলার এই শুরু স্বকুমারবাবুর।

—সবই তো যুদ্ধ, বুদ্ধি।

স্বকুমারবাবু এ কথা নিজেকেই বলেন। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে গামছা পরে বলেন, কাঁটাটা দাও তো।

—কী করবে?

—আরশোলা মারব। মারলে তবে তো কামবে। রোববার সন্ধ্যা বের করে দেব ঘর থেকে, তারপর আবার মারব।

সকলকে অবাক করে স্বকুমারবাবু আরশোলা মারতে লেগে যান। কাঁটা পেটাতে পেটাতে বলেন, কাল ওই স্বরেশকেও দেখতে হচ্ছে। ছেলেরা যাবে, আমি যাব। আর বেলুকেও ছেলে পড়াতে হবে না। কোটো তোলাতেও যাবি না। তোকে আর মিলুকে আবার পরীক্ষা দেয়াব।

প্রত্যেকে এ ওর দিকে তাকায়। বাবাকে এমন জঙ্গী হতে এই তারা প্রথম দেখছে।

—তোমার ওষুধ ফেলে দিলে?

যাক, ওষুধ যাক। স্বকুমারবাবু তো অস্বস্তি নন। কোনো কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরে আছই তাঁর নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে হচ্ছে।

“তোমার মুখ এঁকেছি শাদা দেয়ালে”।

অরবিন্দ গুহর কবিতা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

কবিদের দর্শক দিয়ে চিহ্নিত করবার একটা রীতি ইদানীং বেশ প্রচলিত; এই রীতি কতটা যৌক্তিক প্রশ্ন উঠতে পারে। যদিও, একই দেশকালের গণ্ডির মধ্যে যারা লালিত তাঁদের কবিতায়, যত বিচিত্রই হোক-না-কেন, কিছু সামান্য লক্ষণ থাকবেই ধরে নেওয়া যায়, তবু, কবির বা যে-কোনো তন্মিষ্ট শিল্পীর অধিষ্ট যখন দেশকালের গণ্ডি পেরোনো, তখন ‘দশক’-এর চিহ্ন, কবির নিশ্চয়ই সম্মান রক্ষি করে না। তা ছাড়া তিরিশের দশকের কবি ষাটের দশকেও অপরিবর্তিত যদি ধরে নেওয়া হয়, তার চেয়ে আক্ষেপের, তার চেয়ে অগৌরবের, সেই কবির পক্ষে আর কী হতে পারে? কিন্তু মানতেই হয় যে কবির পক্ষে হুৎথের হলেও এই ‘দশক’-বিভাজন, আলোচকদের শ্রম লাঘব করে। একই সময়ে কবিতা লিখছেন এমন দুই কবির মধ্যে আদর্শ আর স্বভাবের মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থাকলেও, আলোচকরা ধরেই নেন, এই দুই কবির কবিতার আশ্রা আর শরীরের মধ্যে যে-বিশিষ্ট যুগলক্ষণ আছে, অর্থ্যাৎ যা এই দুই কবিকে তাঁদের পূর্ববর্তী যুগের ও পরবর্তী যুগের কবিদের থেকে স্বতন্ত্র করে, পাঠকরা তা জানেন। মনে হয়, এই ধরে নেওয়া ‘যুগলক্ষণ’ পাঠকদের স্বজ্ঞা (intuition)-নির্ভর, অব্যাখ্যাত, এবং এর প্রমাণদাপেক্ষ অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে দাব্যের পাঠকরা প্রশ্ন তোলেন না, মনে নেন:— বিঘট্টা অনেকটা মনোবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞার্থে stereotype-এর মতো। রবীন্দ্রনাথ যতদিন দেদীপ্যমান ছিলেন, তাঁর পরিমণ্ডলে বর্ণিত কবিদের চিহ্নিত করবার ভক্ত, সম্ভবত, ‘দশক’-বিভাজনের রীতি প্রচলিত হয় নি। জানিনা, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম এদের কেউ ‘দশক’ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন কিনা। এমন-কি এখন যারা তিরিশের ও চল্লিশের (নাকি

কেউ কেউ বিশের?) কবি বলে উল্লিখিত, তাঁদের একসময়, অন্তত আমাদের কৈশোরে, ‘আধুনিক কবি’ বলা হতো, অবশ্য সর্বদাই যে সন্দেহ তা নয়, প্রায়শই একটু কটাক্ষ, বা একটু অবহেলাও এই অভিধার সঙ্গে জড়িত থাকত। আমরা যতদূর ধারণা, একাত্তই ব্যক্তিগত ধারণা, ‘আধুনিক কবিরা’ চল্লিশ দশকের শেষের দিকে জাতে উঠেছেন এবং ‘আধুনিক কবিরা’ পঞ্চাশের দশকে জাত হারিয়েছেন। পঞ্চাশের, ষাটের, সত্তরের, আশির কবিরাও নিশ্চয়ই ‘আধুনিক’ কবিতা লেখেন (ভালো কথা, রবীন্দ্রনাথ কি আধুনিক কবি ছিলেন না? ছিলেন না কি মধুসূদন কিংবা ভারতচন্দ্র? আরো নাম করা যেতে পারত)। আসলে আধুনিক শব্দটা ‘দশক’-এর মতোই অব্যাখ্যাত, পাঠকের স্বজ্ঞানির্ভর। এগনো খুবই দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই, ‘সমনাময়িকতা’ (contemporancity) ও ‘আধুনিকতা’ (modernity) আমরা (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) সমার্থক জ্ঞান করি। এই কথাগুলি আমার আবার মনে হলো, অনেকদিন পরে, বছর-পনেরো তো হবেই, অরবিন্দ গুহর সম্প্রতি লেখা কবিতা পড়ে।

‘বিভাব’-সম্পাদককে বারংবার ধন্যবাদ যে তাঁর দৌজ্ঞে অরবিন্দ গুহর সত্তোরচিত পাঁচটি কবিতা একসঙ্গে পড়বার সুযোগ পেলাম। আজ যারা ‘পঞ্চাশ’-এর প্রখ্যাত কবি, তাঁরা তখন বোধ হয় প্রকৃত অর্থে লেখা শুরুও করেন নি, ক’রে থাকলেও তখনকার ‘বড়ো’ কাগজে লেখা-ছাপানো তাঁদের স্বপ্নের মতো ছিল, সেই সময়েই ‘বড়ো’ কাগজে অরবিন্দ গুহর কবিতা ছাপা হতো, হুতরাং আমাদের অর্থাৎ সমবয়সীদের, অরবিন্দর কবিতা যুগপৎ ঈষা ও কোড়ুল উদ্ভেক বয়েছিল। অরবিন্দকে সমীহ করবার আমাদের যথেষ্ট কারণ ছিল: স্বয়ং বুদ্ধবৈব বহু ঘণ্টে কবি বলে মনেন, কবিতায় তাঁর আর কৈবল্য লাভের বাকি কী? প্রবাদপ্রতিম জীবনানন্দ দাশ, অরবিন্দ গুহর দেশের কবি এবং তাঁর একদা মাটারমশাই, তিনি অরবিন্দর কবিতা পড়ে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে একান্তে বলেছিলেন (অবশ্য এটা আরো পরের ঘটনা), “he has come to stay”। তা ছাড়া, তখনকার তরুণ লেখকদের ‘প্রায়-সর্বতা’ দীপেন্দ্রকুমার সাত্তাল ও অরবিন্দকে জানি না ওর কবিতার জুই কিনা, এতটাই স্নেহ করতেন যে সেই বিখ্যাত ও বিতর্কিত ‘অচল গার’ পত্রিকায় ওঁকে দিয়ে অয়মধুর সাহিত্য সমালোচনা করতেন। সেই সময়, লক্ষ করেছে, যারা তৎকালিক ‘আধুনিক কবিতা’র প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তাঁরাও অরবিন্দ গুহর কবিতা বুঝতে পারতেন, পড়ে খুশি হতেন। এর একটা কারণ হয়তো এই যে ওর কবিতা রসবেত্তাদের ‘অপেক্ষিত অনপেক্ষা’র সেই বিখ্যাত

শর্তকে মেনে চলত—অর্থাৎ তাঁর কোনো কবিতার সঙ্গে একান্ত হাতে গেলে সেই কবিতায় স্পষ্টতই নেই এমন কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধির জন্ত অপেক্ষা করতে হতো না। এই ফটিকস্বচ্ছতা যা স্বতই রামধনুর সৃষ্টি করে, এবং যিমতের অবকাশ থাকলেও, আমি একে বরণীয়ই বলব যা অবিনশ্ গুহ তাঁর কবিতায়, আমার জ্ঞানত, অদ্বাবধি বজায় রেখেছেন। ঈশ্বর ব্যতিক্রম লক্ষ করেছিলাম তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই (পুস্তিকা বলাই সংগত) 'প্রথম পুরুষ'-এর কিছু কবিতায়: যেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব জগৎ থেকে সরে গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলেছেন। 'প্রথম পুরুষ' আমার কাছে নেই—এতদিন পরে কবিতাগুলিও আমার ঠিক স্বরণে আসে না—যতদূর মনে পড়ে (নাকি আমারই ভুল) এই 'তৃতীয় ব্যক্তির' জগৎয়ের সঙ্গে তথা 'আমি' ও 'তুমি'র বাইরের জগতের সঙ্গে কবির যে সম্পর্ক তাঁর মধ্যে 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা'র সুরাসরি যোগস্বত্ব নেই—এই তৃতীয় ব্যক্তিদের পশ্চাৎপট কিছুটা অপরিচয়ের রহস্তে ভরা।

অরবিন্দ গুহর নিজস্ব জগৎ স্বত: উৎসাহিত প্রেম বা 'ভালোবাসা' যার লক্ষ্য সেই চির-অগ্রাপ্ত ঈশ্বরীয় মতো বছরব্যাপিত নায়িকা—যে কখনো শরীরী কখনো অশরীরী। অরবিন্দর প্রথম কবিতার বই 'দক্ষিণ নায়ক'-এ "হাস টোট পাখে জলের ছায়ার চৌটে/তুষার তুলা কান্ডন হয়ে ফোটে" কিংবা "শিশুর যুগ্ম আকাশে হাত বাড়ালে" এই ধরনের ফটিক স্বচ্ছ পংক্তির মধ্যে ভালোবাসার ব্যাকুলতা ও অগ্রাপ্তির বেদনা প্রতিবিম্বিত—এবং সংজ্ঞামক ও; সংজ্ঞামক এই-জন্ত যে অরবিন্দ তাঁর কবিতায় মস্তিষ্কের চেয়েও হৃদয়ের উপরই বেশি আস্থা স্থাপন করেছেন। 'প্রথম পুরুষ'-এর পরবর্তী কবিতার বই 'নিবিড় নীলিমা'য় অলঙ্কৃত-র কবিতাগুলিতে অরবিন্দ তাঁর নিজস্ব জগতেই আছেন দেখতে পাই। তবে 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা'-র অভিব্যক্তি কিছুটা সংহত, উজ্জ্বলিত আনন্দ-বেদনা অস্বভাব রূপান্তরিত—হয়তো এটাই বয়সোচিত স্বাভাবিকতা যা তাঁকে উত্তীর্ণ করে গভীরতর প্রত্যয়ে: "এক চিনি। ও আমার করতলস্থিত আমলকী", কিংবা জাগরিত করে প্রার্থনায়: "তোমার অভাবে কেন কলকাতায় বেজবতী, বেবা/ আমার রক্তের মধ্যে উপস্থিত থাকে", অথবা তাঁকে একান্ত করে বিবই কলকাতার সঙ্গে: "তুমি নেই, সেই শোকে কলকাতা পাথর।" অরবিন্দর মধ্যে, কখনো কখনো মনে হয়, ভীষন সম্পর্কে একটা মনো-নেওয়ার নিলিঙ্গ দার্শনিকতা (নাকি এরই অপর দিক বৈরাগ্য) প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল যা প্রতিফলিত হয় আপাতস্থলু বা কোঁকড়োজঙ্গ অথচ অশ্রদ্ধাঙ্গল পঙ্ক্তিতে:

ভালোবেসেছিলাম একটি ঐশ্বরীগকে
খরচ ক'রে চোদনিকে।

* * *

মে-গান কোথায় ভাষা পেল, স্বচ্ছ ভাষা?

মূলে আমার চোদনিকের ভালোবাসা।

জলের তলায় মত্ত একটা আকাশ ধরি।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরি-হরি ॥

কিংবা এই ধরনের উক্তি:

ঢের ভালো সত্য চা'র জীবন্ত পেয়ালা—

গুহে, একটা টোট মদে দিও ॥

অরবিন্দ গুহর কবিতার অন্তরঙ্গ 'প্রেম' যার শটভূমি কলকাতা (যে কলকাতা কতবার কবির সঙ্গে আর সেই ঈশ্বরীয় মতো। নায়িকার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায় কে বলবে), আর বহির্ভূত 'ছন্দ' আর 'মিল'। অরবিন্দ নিজেও কি জানেন যে 'পয়ার-ভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত' 'মাত্রাবৃত্ত' আর 'স্বরবৃত্ত' তাঁর নিখাদে-প্রথাদে? আর 'মিল' তাঁর হাত ধ'রে ঘুরে বেড়ায় ছোটো ছেলের মতো? পাঁচমাত্রার মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে চারমাত্রার স্বরবৃত্তের মিশ্রণ (বা তার বৈপরীত্য, যা অনেকের কবিতায় প্রায়শই লক্ষ করা) (কেউ কেউ অবশ্য স্বজ্ঞানে এবং ইচ্ছে ক'রেই এই মিশ্রণ ঘটান; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, অহুমান কবি, অনবধানবশত ঘটে থাকে) অরবিন্দর কবিতায় আজ পর্যন্ত আমার শ্রুতিগোচর হয় নি: ছন্দের এই শুদ্ধতা অরবিন্দর প্রথর আর বঙ্গশীল শ্রুতিবোধের পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। অরবিন্দ যখন কবিতা লেখা শুরু করেন, আধুনিক কবিদের কবিতায়ও, শব্দের 'সামুদ্রিক' যা চলিত ভাষায় পরিভাষ্য, কখনো কখনো ব্যবহৃত হতো, অরবিন্দর কবিতায় কখনো তা দেখেছি বলে মনে পড়ে না; তা ছাড়া, বাজে বা ছর্ব্ব মিল ওর কবিতায় একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। এখন যারা কবিতা লিখছেন তাঁদের কাছে 'নির্ভুল' প্রাথমিক ছন্দে কবিতা লেখাটা এবং মিল দেবার ব্যাপারটা হাতকর বা অগ্রাসঙ্গিক মনে হবে, কিন্তু পঞ্চাশের গোড়ার দিকে কবিতায় ছন্দের একটা বেহিসেবী পদক্ষেপ বা একটা ছর্ব্ব মিল একজন কবিকে অপদত্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অরবিন্দ গুহর সম্প্রতি লেখা পাঁচটি কবিতা পড়ে বিশেষ করে 'দ্বয়ের মধ্যে' এবং 'ভিক্ষা' পড়ে, যদিও তাঁর কবিতার সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ নেই

আমার বহুদিন, মনে হলো, যোগস্বজ হারিয়ে যায় নি। “তুমি স্বপ্নের মধ্যে আছ—এ সম্বল খুব তুচ্ছ নয়” কিংবা “খাটি কথা। ভিক্ষা চাই, ভিক্ষা দিতে কখনো শিখি নি” এইসব কথা যিনি বলেন, যেভাবে বলেন, তাঁকে তো আমি চিনি, তবে তাঁর অস্বভাব বয়সের সঙ্গে পরিণত হয়েছে উপলব্ধিতে। ‘পঁচিশ বছর’ কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনিও আমার বেশ চেনা, পার্থক্য : কবিতাটি গজে লেখা, এবং সেই ঈশ্বরীর মতো নারিকাকোও, সেইসঙ্গে কলকাতাকেও সময় বিবর্ণ করেছে, প্রেম পরিণত হয়েছে মনস্তাপে। “অন্ত রকম” এবং “মুক্তা” কবিতা দুটিও গজে লেখা, তবে প্রথমটির প্রথম পঙ্ক্তিতে তো একটি নিটোল পয়রা। লেখা গজে, কিন্তু কঠোর চিন্তে তুল হয় না। “একজন নিঃসঙ্গ ভক্ত বাঁসে আছেন। নিঃসঙ্গ ভক্তের আন্তরিক আর্তনাদ—তুমি কোথায়?”, “প্রত্যেকটি মুক্তা আমার নিবাসিত ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ জমা আছে।” এইসব পঙ্ক্তির মধ্য দিয়ে আমি অবিন্দ গুহকেই দেখতে পাচ্ছি যার ভালোবাসা প্রজ্ঞায় পরিণত হয়েছে।

শুরুতেই ‘দশক’ বিভাজনের সমস্যা কথা উল্লেখ করেছে। তা হলে অবিন্দ গুহ পঞ্চাশের কি? অরুণকুমার সরকার, মনে পড়ে, এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন যে অবিন্দ গুহ চল্লিশের কবি। কেন? অরুণকুমার সরকার, মনে হয়, ধরেই নিয়েছিলেন যে তিনি নিজে চল্লিশের কবি বলে চিহ্নিত। তিনি তাঁর নিজের কবিমানসিকতার সঙ্গে অবিন্দর কবিমানসিকতার কোনো সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন কি? সাদৃশ্য আমি তো সহজেই দেখতে পাই অরুণকুমার সরকারের কাছেও কবিতার উপাত্ত এবং প্রধান শর্ত ছিল ‘ছন্দ’ আর ‘মিল’ আর এই বিষয়ে তিনি নিজেই ছিলেন আক্ষরিক অর্থে একজন সিদ্ধান্তধরক। এবং, অরুণকুমার সরকারের কাছে বিরাট্টে পবিত্র পদ, আর, ভালোবাসা হৃদয় শাশ্বত অনেক দূরের নীলে।

ব্যক্তি অবিন্দ আর কবি অবিন্দকে কখন আমি পাশাপাশি দেখি তখন কোঁতলী করে, লিখি :

অবিন্দ খাস বরিশালের, তাঁর কৈশোর উত্তীর্ণ হয়েছে বরিশালে, কিন্তু বরিশালের বিখ্যাত প্রকৃতির কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব অবিন্দর কবিতায় দুর্বল, তার পরিবর্তে দেখতে পাই, তাঁর কবিতার পটভূমি কলকাতা, কলকাতার প্রকৃতি। দেশভাগের চাবুকের ছসংস্কৃত অবিন্দ নীরবে সহ্য করেছেন; যেমন কবিতা লিখেছেন তেমন অল্পবয়স থেকেই বঠোর পরিশ্রম ও সাংগঠনিক দায়বাহিত্য বহন করে তিনি বড়ো হয়েছেন। যে-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে

উঠেছেন তাতে তাঁর তথাকথিত ‘সমাজচেতন’, ‘বিশ্ববী’, ‘সংগ্রামী’ কবিতা লেখাটাই ছিল স্বাভাবিক কিন্তু তিনি লিখেছেন প্রেমের কবিতা, ভালোবাসার কবিতা মনে পড়ে। পঞ্চাশের প্রথম দিকে, কি মাঝামাঝি, তাঁর এক অস্বজপ্রতিম কবি, সম্ভবত কবিজনোচিত মনোবৈকল্যের ফলে দীর্ঘদিন অনিবার্য শিকার হয়েছিলেন, অবিন্দ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আধমন ওজনের বস্ত্র মাখায় নিয়ে প্রতিদিন একমাইল হাঁটতে, বলেছিলেন, অনিবার্যের এর চেয়ে কলগ্রদ ওয়ুধ আর নেই। অবিন্দকে দেখেছি, কী-ভাবে তিনি তাঁর পুত্রদ্বারা অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামহকে ছুঁতে দিয়ে আগলে রেখেছেন যেন সংসারের আঁচ তাঁকে একটুও স্পর্শ না-করে। অবিন্দ, আপনি যদি কবিতা না-লিখতেন, যদি না-ও করতেন ইতিহাস চর্চা, ওই একটিমাত্র কারণেই আমি আপনার কাছে চিরদিন নতমস্তক হয়ে থাকব। সাবাস, অবিন্দ, সাবাস।

গুরুত্ব : অসম্মানকর কিছু লিখে থাকি যদি অবিন্দ, আপনি আমাকে সরাসরি চিঠি লিগেবন, একান্তে নিঃশর্ত স্বা-প্রার্থনা করব, বোঝাই আপনার, উকিলের চিঠি দেবেন না, উকিলকে আমি বড়ো ভরাই—আপনার লেখা সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের ‘হস্তিনা’র মতো।

অবিন্দ গুহর পাঁচটি কবিতা

স্বপ্নের মধ্যে

তুমি স্বপ্নের মধ্যে আছ—

এ-সম্বল খুব তুচ্ছ নয়।

ছায়া দেয় নাগরিক গাছও

যেন ছায়া সহজ সঞ্চয়।

তুমি স্বপ্নের মধ্যে থাকো—

এ আমার অদৃশ্য সম্বল;

পার হয়ে যাই মস্ত সাঁকো

নিচে জ্বাল জোয়ারের জল।

তুমি স্বপ্নের মধ্যে দিলে

এতকাল—আগে তা বৃষ্টি;

শেষপবে ভূমি ক'রে দিলে
অতীতী অথচ চিরতীতী।

আর কোনো সখল না নিয়ে
গন্তব্যে অবশ্য যাওয়া যায়;
নিষিদ্ধ পাদানিতে দাঁড়িয়ে
অথবা সুলভ অবস্থায়।

অন্তরকম

উপরের ঘর থেকে সব দেখা যায়—
আকাশ, গঙ্গা, চাঁদের আলো, ফুলগাছ।
উপরের ঘরে থাকতে দেবে?
দেবে না কেন, দেবে। কিন্তু
অন্তরকম ঘরও আছে— সেদিকে ভিন্ন স্বাদ।

রাত এগারোটার সময় জোয়ার এসেছে।
উপরের ঘর থেকে দেখা গেল—
আকাশ, গঙ্গা, মন্দির, বাগানের রাস্তা, গাছপালা।

রাত্রির শেষ প্রহরে মনে হল
অন্তরকম ঘরের কথা,
উপরের ঘর আর ভালো লাগল না।

অতএব

অন্তরকম ঘরের দিকে যেতে হল।
মাঝে-মাঝে জলের শব্দ,
অচ্ছ কোনো শব্দ নাই।
পুরনো হেমন্তের শেষ পূর্ণিমায়
চতুর্দিকে চাঁদের আলো ফেটে পড়েছে।

দূর থেকে শোনা গেল অন্তরকম শব্দ,
কিসের শব্দ কে জানে।
আরেকটু এগিয়ে না গেলে
এই শব্দের সকল রহস্য অজানা থেকে যাবে।

সামান্য দূর থেকে নিঃশব্দে দেখা গেল
গাছপালার মধ্যে
একজন নিঃসঙ্গ ভক্ত বসে আছেন।
অন্তরকম ঘরের দিকে যেতে যেতে
শোনা হোলো নিঃসঙ্গ ভক্তের আন্তরিক আত্মনাদ—
ভূমি কোথায়?

পঁচিশ বছর
হঠাৎ কাল বিকেলে
পঁচিশ বছর বাদে
দশ মিনিটের জুজু
তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নিজে যেচে আমার দিকে এগিয়ে না এলে
আমি তোমাকে চিনতেই পারতাম না।
পঁচিশ বছর আগে ঘৃণাক্ষরেও ভাবি নি
কোনোদিন ভূমি এরকম ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে।

আমার মনে পড়ে গেল
পঁচিশ বছর আগে একদিন
হৃৎপূর্বে ভূমি হলুদ শাড়ি পরে একা-একা
কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি—
দূর থেকে আমি নিজের চোখে দেখেছি
সমস্ত রাস্তা চোখের পলকে বিশাল সমুদ্র হয়ে উঠল—
তোমার পায়ের কাছে সকল চেউয়ের ফণা
সাখা নীচু করে আছে।

পচিশ বছর বাদে
 হঠাৎ কাল বিকেলে
 নিজের চোখে দেখলাম তোমার ধারকাছে সমুদ্র নেই ;
 আধঘণ্টার বৃষ্টির দাপটে ট্রাম বন্ধ,
 চতুর্দিকে এলোমেলো গর্ত,
 পার্কের ঘাস নিশ্চিহ্ন ।

হঠাৎ কাল বিকেলে
 পচিশ বছর বাদে
 দশ মিনিটের জন্ম
 তোমার সঙ্গে দেখা না হলে
 ভালো হত ।

ভিক্ষা

হাত পেতে ভিক্ষা নেয় । কিন্তু সে আসলে
 পাতালে হুড়ঙ্গ খোঁড়ে, আকাশে সোপান গড়ে তোলে ।
 যন্ত্রতন্ত্র গড়ে থাকে, সমস্ত শরীরে খুলোবালি ;
 একাধারে সে ভিক্ষুক, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী ।

বহুকাল থেকে আমি স্থিরবুদ্ধি গোয়েন্দার মতো
 তাকে লক্ষ্য করে আছি । জানি
 তার মুখ থেকে কোনো আচার্যদেবের মতো বাণী
 সহসা ধরে না । তার হাত পাতা আছে অবিরত ।

স্থিরবুদ্ধি গোয়েন্দার মতো আমি তাকে
 একদিন ধরে ফেলি—মৃণোমুখি নিজস্ব পোশাকে ।
 তার কাছে আমি তারই মতো হাত পাতি
 ভিক্ষা যেন আমারও বেদান্তি ।

এত সহজেই পারি ?—বলে
 আমাকে কিরিয়ে দিল—তাকে আমি চিনি ।

‘পাতালে হুড়ঙ্গ খোঁড়ে, আকাশে সোপান গড়ে তোলে’—
 খাটি কথা । ভিক্ষা চাই, ভিক্ষা দিতে কখনো শিবি নি ।

মুক্তা
 ঝিল্লকের মধ্যে মুক্তা থাকে ।
 মস্ত পুকুরে নিখাস বন্ধ ক’রে ডুব দিয়েছি,
 হু-হাত ভরে তুলে এনেছি
 ঝিল্লক ।

ঝিল্লকের পর ঝিল্লক ভেঙেছি । মাংস আছে,
 মুক্তা নেই ।
 পুকুরের পাড়ে পাত্তিহাসের ঝাঁক—
 হু-হাত উজাড় করে তাদের খেতে দিয়েছি
 ঝিল্লকের মাংস ।

যখন কিশোর ছিলাম—
 আমার রাজস্বের মধ্যে একটা মস্ত পুকুর
 আর অশংখা ঝিল্লক আর
 পাত্তিহাসের ঝাঁক । ঝিল্লকের পর ঝিল্লক
 ভেঙেছি, একটা মুক্তাও দেখি নি ।
 পাত্তিহাসের ঝাঁক
 অশংখা ঝিল্লকের মাংস খুঁটে খুঁটে খেয়েছে ।

রাজস্ব চলে গেছে, নির্বাসনে আছি ।
 পাত্তিহাসের ঝাঁক বেশিদিন বাঁচে না ;
 নির্বাচনে খারা জয়ী
 পুকুর ভরাট করে তারা বিরাট বাড়ি তুলেছে ।

কিন্তু ঝিল্লকের মধ্যে মুক্তা থাকে । আমি
 তখন দেখি নি, এখন দেখতে পাই ।
 প্রত্যেকটি ঝিল্লকের মধ্যে মুক্তা ছিল,
 পেয়েছি, একটিও হারায় নি, প্রত্যেকটি মুক্তা
 আমার নির্বাসিত ভাণ্ডারে সম্বড়ে জমা আছে ।

১৫

অনুকাক্সা

কল্যাণ মজুমদার

ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিয়ে এসে গায়ের পাঞ্জাবি খুলছিল হর্ষ। চোখ পড়ে জানালার বাইরে। শিরীষের ডগায় খাই-খাই হাত নাড়ছে বিকেলের বোদ্ধর। পোষের বিকেল নিস্তেজ। ঠাণ্ডা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। নিজের বুকের মধ্যেও যুব মত্তপনে জেগে-ওঠা হিম-শীমের স্পর্শ পায় হর্ষ।

বিশেষ কোনো আশা দিতে পারেন নি ডাক্তারবাবু। নিজেরও তেমন ভরসা ছিল না। খাউ আটাকে কে আর আশ্বাস দিতে পারে! তবু মা চলে যাবেন— ভারতে পারে না হর্ষ। মা ছাড়া আর তো কেউ নেই! এত বড়ো পৃথিবীতে কী ভীষণ একা হয়ে যাবে ও। অথচ জীবনের নিয়ম বদলবার ক্ষমতা কারুর নেই।

—দাদা—

জানালার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘাড় ঘোরাল হর্ষ। দরজায় থতি।

—কি রে?

—মা তোমাকে একবার ডাকছেন।

—আসছি।

মা কেন ডাকছেন ও জানে। একই কথা বলছেন রোজ। কিন্তু ও কীভাবে বলবে, মা যা বলছেন তা সম্ভব নয়। হর্ষ অন্তত পারে না। মাথা নিচু করা, ক্রুপা-প্রার্থনা ওর স্বভাবের বাইরে। অথচ ডাক্তার বাবাবাব বলেছেন, দেখবেন যেন কোনো শক না পান। সব সময় প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করবেন। হার্ট-অ্যাটাকের রোগীর পক্ষে এই অতি প্রয়োজনীয় শর্তের কথা হর্ষ জানে। অবুঝ মাকে ও কী বোঝাবে? কতই বা মিথ্যে বলা যায়!

ঘর থেকে বেরিয়ে বাহাদার পা রেখেছে, সামনে এসে দাঁড়াল চন্দর-মা!

বিভাব

৩৩

ওর ছেলের নাম চন্দর, সেজজে চন্দর-মা। হর্ষ যখন কলেজে পড়ে তখন থেকে এ-বাস্তিতে কাজ করছে। রাঁধুনি হিসাবে বহাল হলেও এখন ও-ই সংসারের হাল ধরে রেখেছে। হর্ষ বলে— গভর্নর।

—ও দাদাবাবু—

—কী হলো গভর্নর?

—জামাইবাবু রাতে থাকবেন এখানে?

ওরা আসবে কিনা তাই তো হর্ষ জানে না। ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ছাড়া গেয়ে মা এসেছেন আজ আটদিন। প্রথম থেকেই রুতি এসে রয়েছে। তিথি যাওয়া আসা করে। ওদের বর অংশুমান ও দেবশও আসে। অগ্নিচন্দ্র আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেরও আসা-যাওয়া আছে। এটা একটা বিরাট সমগ্রা। কাকে চা দেবে, কখন কী খেতে দেবে তার আয়োজন করা, ঠিক ঠিক দেখাশোনা করা বেশ কঠিন কাজ। মা শুয়ে শুয়ে খোঁজ নেন আতিথেয়তা ঠিক হচ্ছে কিনা। রুতি থাকায় হুবিধ হয়েছে। গভর্নরের সঙ্গে মিলে যথাযথ করা করে। কিন্তু জামাইদের ব্যাপার আলাদা। ওরা থাকলে বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার।

—রুতিকে জিজ্ঞেস কহেছে?

—না। জামাইবাবুর কথা দিদিমণিকে জিজ্ঞেস করা যায় নাকি!

হর্ষ হাসলো। এ-সব বিষয় ও জানে না। বলল, তোমার সমগ্রাটা কি?

চন্দর-মা মলে, ওঁরা থাকলে বাজার করতে হবে। সকালে তো বাজার যাও নি।

পকেট থেকে টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে হর্ষ বলল, বাজার করে রান্না করে রাখো। ওরা না এলে ফ্রিজে তুলে দিয়ে। কাল যাওয়া যাবে।

বাহাদার শেষে মার ঘর। যেতে যেতে হর্ষ লক্ষ্য করে পাশের বাড়ির পশ্চিম দেয়ালেও আর বোদ নেই। বাহাদার গ্রীল ধরে দুটো চজুই খুনসুটি খেলছে। বাগেনভেলিয়ার লতায় হোলি। এইসব ছোটো ছোটো বিষয়গুলো ওকে খুব টাটকা রাখে। নইলে এটা তো একটা শোকের বাড়ি। অশান্তি অস্থখ মৃত্যু আর অভিসম্পাত দিয়ে দরজা জানালা বানানো। বোন ছটির বিয়ের সময় কেবল লোক দেখানো আসো-আড়ম্বর হয়েছিল।

মার বিজানার ছপাশে বসে আছে, তিথি আর রুতি। মার গলা পর্যন্ত কথল টানা। মুখটা শীর্ণ, ফাকাশে।

ছেলেকে দেখে দেবিকার চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে। হর্ষ ওর বাবার গডন ও

রচ পেয়েছে। ছ'ফুটের কাঁছাকাছি লম্বা। কর্ণা বড় গাঁদা ফুলের আঁতা। মুখটা মাংসের মতন। লোকে বলে মাছুম্বা ছেলে ভাগবান হয়। কী ভাগ্য ওর? জীবনে তো শান্তি পেল না। অথচ কৃতী ছেলে তাঁর। যুঁহিভাসিটিতে পড়ায়। নিজের ছেলেকে দেখে তারই আশ মেটে না। অথচ ঐ মেয়েটা— শুধু ঐ একটা মেয়ের জন্তেই—

—কী রে তিথি, হৃৎ বলে, গুণ্ডা ছুটোকে দেখছি না যে!

—ওদের অজ্ঞ আমি নি, দাদা। যা ছুরন্ত!

হৃৎ হাসতে হাসতে বলে, বাচ্চাটা ছুরন্ত হবে না তো কি তুই হবি? নিয়ে আসিস। মার ভালো লাগবে। কী মা, তাই তো?

দেবিকা ধীর স্বরে বলেন, তুইও খুব ছুরন্ত ছিলি, থোকা। তিথির ছেলে-দের দেখে আমার কেবল ছোট্ট তোর কথা মনে পড়ে।

শ্রুতি বলল, মা তুমি খালি বলে দাদা ছুরন্ত ছিল। আমি কোনোদিন দেখলাম না। ছেলেবেলা থেকেই দাদাকে দেখে আসছি শান্ত গম্ভীর। বাড়িতে আছে কিনা বোঝা যায় না। কথা বলতে গেলে ভয় লাগে।

দেবিকা বললেন, বড়ো হয়ে ওরকম হয়েছিলে। তাও তাদের বাবার জন্তে। থোকা তাদের বাবার স্বভাবের ঠিক উদ্ভট।

দাদা ওদের বাবার বিপরীত স্বভাবের—দু বোনই জানে। কিন্তু মা কথাটা স্তব্ধের থেকে বললেন না দুপের থেকে তা ওরা জানে না। আবার, নিজেরাই দেখেছে বাবার সঙ্গে মার সম্পর্কটা খুব সুখের ছিল না। বাবা যা উচ্ছ্বল স্বভাবের মানুষ—মেয়ে বলেই কেবল দুশ্রুতির বলে পিতৃনিন্দা করবে না, তাতে কোনো জীর পক্ষেই হুঁশি থাকে সম্ভব ছিল না।

তিথি অনেকবার শ্রুতিক বললে, মা বলেই সহ্য করে থেকেছেন। আমি হলে কবেই ছেড়ে চলে যেতাম। কল্পনা কর অংশু মধ্যার হয়ে অজ্ঞ মেয়েমানুষ নিয়ে বাড়িতে ঢুকছে—তুই কি করবি? মা তা-ও সহ্য করেছেন।

চার বছরের ছোটো বোনের চেয়ে তিথি বাবাকে কিছুটা বেশি দেখেছে, জেনেছে। ওর কৈশোরের দ্বিতীয় খুঁই প্রথম।

শ্রুতি বলে, দাদা কিছু বলত না?

তিথি বোনকে বলে, বলত কি না জানি না। তবে একদিন দাদাকে প্রচণ্ড হেগে যেতে দেখেছিলাম।

শ্রুতি অবাক—দাদা রাগতে পারে নাকি? আমি তো কোনোদিন দেখি নি।

—দাদা এমনতে শান্ত চুপচাপ থাকে। কিন্তু বেগে গেলে তুই চিনতে পারবি না। জানিস তো কী রকম একগুঁয়ে মানুষ। আর তখন সবে যুঁহিভাসিটিতে ঢুকছে।—দুশুটা তিথির চোখে এখনো জীবন্ত। এইমাত্র ঘটেছে যেন।

রাত দশটা হবে। জুরে বেহঁস দেবিকা ওসুর খেয়ে ঘুমিয়েছেন। শ্রুতিও ঘুমিয়ে আছে, বিছানার একপাশে। গাড়ির শব্দ বুকেছিল পিতৃদের এলেন। কলিংবেল বাজতেই বাইরের গেট খোলার জন্তে চাবি হাতে হৃৎ দোতলা থেকে নেমে যায়।

গেট খুলে হৃৎ দেখে একজন অচেনা স্ত্রীলোকের কোমরে হাত দিয়ে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। হৃৎ সরে বাবাকে ভেতরের ঢোকের জায়গা দেয়। স্ত্রী-লোকটিও পা বাড়ালে ও বলে—আপনি দাঁড়ান। ভেতরে যাবেন না।

হৃৎ ভরটি গম্ভীর গলা শুনে স্ত্রীলোকটি ভাবাচাচা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাবা টলটলে গলায় বলেন, তার মানে—ভেতরে যাবে না কেন?

কোনো জবাব না দিয়ে হৃৎ ভাইভারকে ডেকে বলে—ইনি যেখানে যাবেন পৌঁছে দিয়ে গাড়ি তুলে দিন। বলেই হৃৎ গেট বন্ধ করে দেয়।

বাবা চিৎকার করে ওঠেন—তুমি ভেবেছ কি? বাড়িটা কার? ,

হৃৎ ঠাণ্ডা গলায় বলে—চেষ্টা না। ঘরে যোগী আছে।

নেকস্ট টাইম আই উইল থু। য় অলদো আউট অন অ স্ট্রীট!

বাবা গর্জন করেন—ইটম মাই হাউস—

হৃৎ তাঁর স্বরে জবাব দেয়—আই ডোন্ট গিভ আ ডাম আর্বাউট ইন্টার হাউস—স্টার্ট বিহাভিং কার্ট—

ভয়ে সমস্ত তিথি ছুটে এসে দাদার হাত ধরে বলে—দাদা!—ওর চোখে জল।

হৃৎ বলে—তুই গিয়ে শুয়ে পড় তিথি। আমি থাকব মার কাছে। যা।

দাদার ঐ মূর্তি তিথি কোনোদিন ভুলবে না। ঐ আদেশ অমাত্র করার নাথ্যও ছিল না। ও ভীষণ শক্তির পায়ে উঠে যায়। এবং আশ্চর্য, বাবা আর কখনো ও কাঁজ করেন নি। তারপরেও মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে চেঁচামেচি করেছেন। মেয়েমানুষ আনেন নি আর।

পরদিন মা একটু ভালো হলেই তিথি সবিত্তারে গত রাত্রির ঘটনা বলেছিল। বিশেষ করে দাদার রাগের কথা। অল্পপুণ্ড্রবরণ দিয়ে ক্রুদ্ধ হৃৎর রূপ ব্যাখ্যা করেছিল।

দেবিকা মিতবাক বই-মুখ-করা ছেলেকে ঠিক বুঝেছিলেন। শিখেছিলেন পেটের ছেলেকেও কেন সন্নম করতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়। তাঁকে আগলে দাঁড়াবার মতন বেউ আছে ভেবে কৃতজ্ঞও বোধ করেছিলেন। আবার, বদমাশী, অসহিষ্ণু, ভয়ঙ্কর জেদী, কতু-তপসায়ণ স্বামী একবারও অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে দেখতে না আসার জন্যে ভীষণই কষ্ট পেয়েছেন মনে। নিজেকে মনে হয়েছে অবাস্তিত, অগ্রয়োজনীয়। তাহলে কেন বেঁচে থাকা? কার জন্যে! কোন্ আকর্ষণে? শুধুই ছেলেমেয়ের জন্যে? মা হয়ে? স্বামীর জন্তে নয়? স্ত্রী হিসাবে নয়? নারী হিসাবে তাঁর কোনো মূল্য নেই?

তবু দেবিকা ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, তুই নাকি বাবাকে অসন্মান করে কথা বলেছিস!

হর্ষ জবাব দেয়, তুমি ভুল শুনেছ মা। বাবা যাতে সন্মান বলায় রেখে চালেন সে-কথাই মনে করিয়ে দিয়েছি কেবল।

—তা বলে বাপকে ওভাবে বলবি?

—বাবা বলেই যা খুশি করবেন নাকি! তাঁকেও কিন্তু নায়-নীতি মানতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো আপস চল না মা। আমি অন্তত পারি না।

ছেলের প্রশান্ত হাসিখুশি মুখের আড়ালে যে একটা একঙয়ে আপসহীন মন আছে তার পরিচয় তাঁর চেয়ে আর বেশি করে জানে! বাবার অস্তিত্ব অহরোধ, অমনয়, অভিশম্পাত কিছুই গ্রাহ্য করে নি। মা বলে বলে গলা শুকিয়ে ফেলেছেন। ছেলের এক উত্তর—ও হ্যাঁ না। শুধু সেই একটা মেয়ের জন্তে। মেয়েটিকে তিনি এখন হিংসেই করেন।

হর্ষ বলল, মা, ডেকেছিলে—কিছু বলবে?

দেবিকা বললেন, শ্রবণকে খবর দিয়েছিস?

জানত হর্ষ মা একথাই বলবেন। গত তিনদিন ধরে বারবার বলছেন, ওকে একবার খবর দে। আমার দরকার আছে।

হর্ষ বলেছিল—মা, এখন ও অত্য বাড়ির বউ। খবর দিলেই কি আসতে পারবে?

মা বলেন—আমি দেখতে চেয়েছি জানলে, আমার অবস্থা শুনে ও ঠিক আসবে। তুই ওকে খবর দে, থোকা।

কোথায় খবর দেবে হর্ষ? পাঁচ বছরের ব্যবধান পেরিয়ে কোথায় পাবে ওকে? তবুও খবর নিয়েছে। শ্রবণ! এখন মণ্ডিলে। ঠিকানা

জানা নেই। জানলেও খবর দিলেই কি মণ্ডিল থেকে উড়ে আসবে শ্রবণ? সে কী সম্ভব।

মাকে এ খবরটা ও দেয়নি। কেননা মা এখন যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় আছেন তাতে সম্ভব অসম্ভবের বোধ কাজ করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মা যা না ছোড়াবান্দা আবদার করছেন, একটা কিছু বলতেই হয়।

নিতান্ত অনিচ্ছাসহ মিথ্যা করে বলল হর্ষ, ও তো এখন এখানে নেই মা। বাইরে গেছে। ফিরলেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে বা কোন করতে বলেছি।

মা বললেন—কবে ফিরবে?

হর্ষ বলে—খুব শিগগিরই বোধ হয়।

হতাশ রাস্তা স্বপ্নে মা বলেন—তাহলে হয়তো আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমার খুব দরকার ছিল।

তিথি ও স্বতি একসঙ্গে প্রশ্ন করে—কী দরকার মা? আমাদের বলা!

মা বলেন—তোদের বলে লাভ নেই। তোরা বুঝবি না।

দেবিকা পাশ ফিরে শোন। অর্থাৎ আর তিনি কথা বলতে ইচ্ছুক নন। বা অপারগ। হর্ষ বেরিয়ে আসে।

ওর পিছনে তিথিও উঠে আসে।—তুমি সত্যিই শ্রবণকে খবর দিয়েছ?

হর্ষ মাথা নাড়ে।

—তাহলে—তিথির কণ্ঠে বিশ্বাস।

—ও এখন মণ্ডিলে। খবর দেওয়া সম্ভব না।

—মণ্ডিলে?

—হ্যাঁ। ওর স্বামী ওখানে বিরাট চাকরি করে।

তিথি বলে—কিন্তু মা যে—

—কোনো উপায় নেই। তুলিয়ে তালিয়ে রাখতে হবে। সেয়ে উঠলে বুঝিয়ে বলব।

হর্ষ বলল, তুই থাকবি তো? দেশে আসবে?

তিথি বলল, না দাদা। বাচ্চাদের রেখে এসেছি। আমি এখন যাব।

—অংশুমান আসবে?

—না। স্বতি তো বলল ও মাত্রাজ গেছে অফিসের কাজে।

—ও! গভর্নরকে বলে খাস তবো। ও বোধ হয় রাত্তা বরে রেখেছে। এবাং

কৃতিকে বল একবার দেখে আসতে গভর্নর কী করছে। আর শোন, তুই একলা যাস নে। ডাইভারকে বল পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নিজের ঘরে ফিরে পড়ার টেবিলে বসল হর্ষ। টেবিলের ডানদিকে খোলা জানালা। জানালার বাইরে অন্ধকার-শুভ্রতা। দূরে চুটো-একটা তারা-মাপের আলো চোখে পড়ে। আলোর বিক্ষততা বুঝিয়ে দেয় কুয়াশা ঘন হয়ে থিরছে। ঠাণ্ডা হাওয়া শরীরে মুহূর্তে ঝাঁচ কাটে। বাতাস ভারী। হঠাৎই একটু কঁপে ওঠে হর্ষ। বাইরের ঠাণ্ডা ভারী বাতাস যেন বুকটা দখল করে ফেলছে। ও উঠে জানালা বন্ধ করে দেয়।

ডাক্তারবাবু খাই বনুন, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ও জানে, মা আর বেশিদিন নেই। যে-কোনো মুহূর্তেই চলে যেতে পারেন। তিন বছর আগে বাপ গেছেন। মাও চল গেলে একেবারে একা হয়ে যাবে। আত্মকর্ষক অর্থে অরকান। অথচ জীবনটাকে বদলাবার কোনো উপায় নেই। ওর অসহায়তার কথা কেউ বুঝবে না। বাবা বোঝেন নি। স্বতিও বোঝেন না। মা হয়তো বোঝেন, বুঝছিলেন। কিন্তু এখন, মানে শেষ স্ট্রোকের কিছু আগে থেকে, তিনিও অবুজ। সে কি তিনি তাঁর শেষ দিন আসন্ন বুঝতে পেরেছিলেন বলে? মাঝে কি তা অভ্যাস অজ্ঞান করতে পারে? কী জানি, মা হয়তো তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া টের পেয়েছিলেন। এরা হর্ষ জানে, মাও তাঁর অভিমান নিয়ে যাবেন। এখানো মাকে খুশি করা অসম্ভব। ও নিরুপায়।

অথচ একেক সময় মনে হয় মা-ই অবশ্যে বেশি ভালোবাসতেন। হর্ষের নিজের চেয়েও বেশি বোধ হয়। সেই টালমাটাল দিনে মা-ই চিংকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম স্ট্রোক। নিজস্ব ধৃতি বোধি ও বিচারবুদ্ধি নিয়ে ও ঠিকই দাঁড়িয়েছিল। যেমন এখনো। পাঁচ বছরে জীবনযাত্রায় কোনো বিহ্বল ঘটে নি। থাওয়া ঘুম রান্না খাওয়া সবই ঠিক আছে। মনে হয়েছিল বটে, জীবনের একটা অংশ যেন কেটে নেওয়া হয়েছে। সেই শূন্যতা আজো রয়েছে। হয়েছে বলেই অসহায়তা উপায়হীন, নিরীকল্প। তবু নাটকীয় কিছু করে নি। পরদিনও ঠিক রাগে গিয়েছিল। মাথা বহুত্যা পিয়েছিল। এখানে যেমন। কৃত্তী মাহুতকে আবেগের দাসত্ব মানায় না।

মা ব্যাপারটাকে ওভাবে অত সহজে মেনে নিতে পারেননি। ভেঙে পড়েছিলেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শারীরিক ভাবেই ভয়ঙ্কর হলেন।

পাঁচ বছর আগের শুক্রবারের বিকেলটা অবিকল মনে আছে। সময়টা ছিল

পৌষের শেষ। হর্ষ বেঞ্চবে বলে তৈরি হচ্ছিল। স্বতি বিকেলের ডাক নিয়ে এল। তিথির বিয়ে হয়ে গেছে কয়েকমাস আগে। চার-পাঁচটা চিঠির মধ্যে একটা ছবছ প্রকাশপত্রের মতন থাম। লাল কালিতে ঠিকানা লেখা। হলুদের ফোঁটাও ছিল এক কোণে। কোতুহলী চোখে ও খামটা খোলে। পলকের জন্মে হর্ষ মুখ শাদা হয়ে যায়। কার্ডের সঙ্গে একটা ছোট চিরকুট লেখা ছিল— 'বিশ্বাস করো আমি জানতাম না। এখন কোনো উপায় নেই। আমাকে ক্ষমা করো।'—শ্রবণ। মাত্র দশদিন আগেই অবশ্যে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিল। বাড়ি যাচ্ছিল—জামশেদপুর।

ঐ মুহূর্তটা ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। পৃথিবী জীবন সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল শিরার স্পন্দন। সাড়হীন অহুত্বিত্বীন শুষ্কপ্রাণ এক জড় পদার্থ যেন ও। সন্ধ্যা ঘোর মার ডাকে। মা কখন এসে দরজার দাঁড়িয়েছেন ও জানে না।

বিয়ের চিঠি দেখে মা বলেন—কার বিয়ে খোকা?

জবাব না দিয়ে হর্ষ টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। চিরকুটটা হাতের ভাঁজে রেখে কার্ডসহ খামটা ছুড়ে দেয় টেবিলে। মা ঠিক পিছনে। রুমাল বের করার সময় চিরকুটটা পকেটে জমা করে। রুমালে মুখ মোছে।

মা বলেন—খোকা, বললি না কার বিয়ে?

মার দিকে ফিরে গলার স্বর স্থির রেখে শান্ত ভাবে হর্ষ ঘোষণা করে— শ্রবণর, মা। আগামী বুধবার জামশেদপুরে।

—কী—কী বললি খোকা, শ্রবণর বিয়ে!—মা আতঙ্কিত চিংকার করে ওঠেন। কেউ যেন বৃকে ছুরি মেরেছে তাঁর।—না-আ-আ-আ! তা কী করে হয়—কী করে হয়—

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ঘাবার মুখে হর্ষ মাকে ধরে। স্বতি বাবাকে ডেকে আনে। তারপর ডাক্তার, নার্সিং হোম। শ্রবণর বিয়ের দিন হর্ষ সৌজন্যমূলক শুভচ্ছা-বার্তাও পাঠাতে পারে নি।

পরশুদিন স্বতি ভিজ্জেস করেছে, বিয়ের পর শ্রবণাদির সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়েছে?

হর্ষ মাথা নাড়ে। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দেবার পর আর দেখা হয় নি। মনে তার উপস্থিতি অতৃপ্ত। স্বতি তা বোঝেন না।

—একবারও দেখা হয় নি?

—না।

—তাহলে—মানে তবুও তুমি কেন—এতদিন পরেও—

—ভূই বুঝবি না, স্বতি।

ভিখির বিয়ের বছর খানেক পর থেকে বাবা চাপ দিচ্ছিলেন যাতে হর্ষ বিয়ে করে। তাঁর বন্ধুস্বানীয় এক ভ্রাতৃলোকের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার জন্তে কথাবার্তাও বলেছিলেন। বাবার যতই দোষকৃতি থাক, হর্ষ মানতে বাধ্য তিনি পারিবারিক ছিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠও। তিনি মনে করতেন উপযুক্ত ছেলেকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করাটা তাঁর কর্তব্য। এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় মেয়ের জন্তেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছেন। ছেলের বিয়েটা দিতে পারলেই তাঁর সাময়িক দায় শেষ হতো। হর্ষর অনিচ্ছার কারণ তিনি বুঝতেন না।

বাবা বলেছিলেন, তুমি আপত্তি করছ কেন?

হর্ষ বলে, কারণটা ব্যক্তিগত। বলতে পারব না।

বাবা বলেন, কিন্তু বিয়েটা কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পারিবারিকও। আমাদের ইচ্ছা আকাজ্জব কোনো দাম নেই তোমার কাছে?

হর্ষ বলে, এ বাপারে আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

বাবা হর্ষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—মা স্ক্রুয়োগী, তাঁর নিজেরও শরীর ভালো নয়। তাঁদের চলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিয়ে হয়ে স্বতিও চলে যাবে। তখন কে দেখবে হর্ষকে? এতবড়ো বাড়িতে ও একা থাকবে? তাছাড়া জীবনেরও নানা দাবি আছে। বংশধারা বজায় রাখার কথাটাও ভাবতে হবে। ওঁদের পছন্দ মেয়েকে বিয়ে করতে যদি আপত্তি থাকে হর্ষ নিজের পছন্দের কার্যকে বিয়ে করুক। তারা মেনে নেবেন। অল্প বয়সে বিয়ে করব না বলাটা একটা ক্যাশান। বয়স বাড়লেই বোঝা যায় বিয়ে কী ভীষণ প্রয়োজনীয়। অনেক বড়ো মাহুঘও তখন পাত্রী খোঁজে। স্বতন্ত্রা টিক সময়েই ও কাজটা করুক।

হর্ষ বাবার সব কথাবাই জবাব দিতে পারত। যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি। কিন্তু অহেতুক তর্কে কী লাভ! ও নিজের উত্তরে অবচল থাকে—তা সম্ভব নয়।

বাবা রেগে ধান—কেন সম্ভব নয়? আমি বলছি বলে? আমার কোনো কথাই তো তোমার পছন্দ হয় না!

হর্ষ বলে—তোমার অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়, তা ঠিক। তবে এ বিবয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। স্বাক্ষর কথাতোই আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

বাগে পৈখ্যারা বাবা চিৎকার করেন—এত করে বলছি এখন করছ না। একদিন তো করবে। তখন আমি থাকব না। সেদিন পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাঁদবে—বলে দিলাম—

মা ছুটে এসে বাবার হাত ধরে বলেছিলেন—এ কী করলে তুমি! ছেলেটাকে অভিশাপ দিলে?

বাবা বলেন, ছেলে তোমার আমাকে মাহুঘ বলেও গল্প করে না। অভিশাপও লাগবে না ওর।

—তবু, তুমি বলবে কেন! কেন বলবে? বিয়েটা ওর নিজের পছন্দের, ইচ্ছার ব্যাপার—যখন ইচ্ছে হবে করবে—তুমি এভাবে বলবে কেন? বাপ হয়ে ছেলেকে অভিশাপ দেবে তুমি?

কান্নায় ভেঙে পড়ে মা আরো কী বলেন হর্ষ শোনেন নি। ও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে তার পরে আরও কয়েকবার কথা উঠলেও বাবা স্বোভাষি করেন নি। হয়তো বুঝেছিলেন, ছেলে তাঁরই মতন একগুঁয়ে। বলে কোনো লাভ নেই।

তখন হর্ষ ভেবেছিল, মা ওকে বোঝেন। জানেন কোথায় ওর বাবা। কেননা শ্রবণার সঙ্গে হর্ষের সম্পর্কটা তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না।

আপন মনে দেখিকা শ্রবণাকে পুত্রবধু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। হুঁশী মিস্ট্রি স্বভাবের মেয়েটিকে খুবই পছন্দ ছিল তাঁর। মাসীমা ফলে যখন কাছে এসে বলত, মনে হতো তাঁর ঘোবনই যেন ভেসে এল প্রতিমাধর রূপ নিয়ে। হর্ষর পাশাপাশি যখন হেঁট যেত, তিনি খুশির আনন্দে বানভাষি হয়ে ভারতেন, আর কার্যকেই তাঁর ছেলের পাশে মানাবে না। কথা বলে বুঝতে পারতেন কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল ওর হর্ষর জন্তে। শ্রবণার কাছেই শুনতেন ছেলের মেধা জ্ঞান বুদ্ধির কথা, পড়ানোর দক্ষতা ও ছাত্রপ্রিয়তার কথা। শ্রবণা বলত আর দেবিকার বুকে হৃথের চেউ ভাঙত।

এ-বাড়িতে শ্রবণার আসা-যাওয়া ছিল অবাধ। এসেই প্রথম দেখা করত দেবিকার সঙ্গে। তারপর হর্ষর সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যে কী কথা বলত! দেবিকা ছ-একবার উঁকি দিয়ে দেখেছেন। অশালীন কিছু চোখে পড়ে নি। কানে এসেছে কবিতার লাইন বা মনোযোগ দিয়ে হর্ষ কিছু বোঝাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারতেন ওঁদের দুজনের কাছে ঘরের বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। আকাশের নীল ঘিরে রেখেছে চার দেয়াল। বাতাসে হুহুগ। দেবিকা মনে মনে বলতেন,

গুয়া স্বপ্নে থাক্, আনন্দে থাক্। যেন কোনো কষ্ট না পায়। তাঁর তাকায়ের স্বপ্ন সফল হয়ে ফুটে থাক্ ওখরে। নিজের শ্রেমহীন শ্রদ্ধাহীন বন্ধনায় জীবনের বেদনা বুকে চেপে সরে আসতেন দেবিকা। যাতে তাঁর দীর্ঘশাস ও ঘরের বাতাসে না মেশে!

হর্ষ জানে, এ-কারণেই শ্রবণার বিয়ের খবরে মা ওভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। ছেলের জন্মে যেমন শরিত হয়েছিলেন, কী জানি এই আঘাত পেয়ে কী করে বসে তেমনি সান্নাধ্যীন কষ্ট পেয়েছেন এই ভেবে, তাঁর আকাজ্ঞার স্বপ্নও কেন এভাবে চূরনার ভেঙে গেল! ছেলের জীবনটাও তাঁরই মতন বেদনাদীর্ঘ হবে?

হর্ষর কাছেও ব্যাপারটা এখনো ছুঁবাধা। অনেক ভেবেও স্থির করতে পারে নি, কেন শ্রবণা অমন করল? হতে পারে, বাড়ি যাওয়ার সময় শ্রবণা বিয়ের কথা জানত না কিছু। বাড়ি গিয়ে হঠাৎই ঐ ধরনের আচমকা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। হতে পারে। তবু ও তো হর্ষকে জানাতে পারত। দশ-বাতো দিন সময় ছিল হাতে। ট্রান্সকল টেলিগ্রাম করতে পারত। কলকাতার বিয়ে আসতে পারত। একদিনের জন্মে হলেও আসতে পারত। খবর পেলে হর্ষই যেত। শ্রবণা শিশু ছিল না। কলেজে পড়াচ্ছিল তখন। তাহলে কেন? কেন শ্রবণা একটা সন্ধ্যোগ দিল না হর্ষকে? এই জিজ্ঞাসাটা এখনো ওকে বিপন্ন করে। কেবল কি বিদেশবাসী দামী পাত্রের আকর্ষণেই ধরা দিয়েছে? এটা মানতে মন চায় না। শ্রবণা অতটাই তরল ভাবতে নিজের অহংকারে লাগে। অমন ওরল মেয়েকে হর্ষ ভালোবাসতে পারে না। তাহলে কেন? হর্ষ জানে না। অথচ শ্রবণার জায়গায় আর কেউ দখল নেবে তাও ভাবতে পারে না। সব ভালোবাসা শ্রবণাকেই দিয়েছিল। আর কারকে নতুন করে কিছু দেবার নেই। ওর আর ভালোবাসার ক্ষমতাই নেই। সেই বোধ অহুহুতি স্নায়ুর যেন লোপ পেয়ে গেছে। এটা আর কারকে বোঝানো কঠিন। কেউ মানেও না। কিন্তু হর্ষ নিজে জানে। নিজের সঙ্গে তক্কতা চলে না। নারীর কথা ভাবলেই শ্রবণাকে মনে পড়ে রক্তমাংস সহ। শ্রবণার চৌচের স্বাদ রক্ত মাথামাথি হয়ে আছে।

বোরহয় মাস দুয়ের আগে হবে। বা হঠাৎ ওকে বিয়ের জন্মে বলেন।

—কবে আছি করে নাই, তোর জন্মে ভীষণ চিন্তা হয় রে। এবার একটা

বিয়ে কর। আমি দেখে শান্তিতে মরি।

হর্ষ অবাক হয়। মা এভাবে বলবেন আশা করে নি। কী জবাব দেবে ভাবে।

মা বলেন, আমি জানি থোকা, শ্রবণাকে তুই ভুলতে পারিস নি। কিন্তু মাহুয় তো জী মাঝা গেলেও আবার বিয়ে করে। আর অমত করিস না।

—তুমিও একথা বলছ মা?

সব জেনে বুঝেও তাঁকে বলতে হচ্ছে। ছেলের জন্মে তিনি সান্নাধ্যীন উদ্ভিন্ন থাকেন। কে ওকে দেখবে? কার হাতে দিয়ে যাবেন ছেঁকে? কে নেবে সংসারের ভার? সারা বাড়িতে একলা তাঁরও ভালো লাগে না। ভীষণ একা লাগে। ছেলে বেরিয়ে গেলে কথা বলারও লোক নেই। বউ থাকলে সঙ্গী পেতেন। আর যদি একটা বাচ্চা থাকত বাড়িতে। বোঝ বোঝ তো তিথির ছেলেদের এনে রাখা যায় না! পুত্রির মাত্র এক বছর হলো বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা হয় নি এখনো। আজকাল প্র্যানিং ছাড়া কেউ কিছু করে না। কোনো দায় নেই, ভাবনা নেই। হর্ষ এখন বিয়ে করতে পারে নিশ্চয়।

হর্ষ বলে তুমি তো জানো মা, তা হয় না। পারব না আমি।

—কেন? সেই অকৃতজ্ঞ মেয়েটার জন্মে?

—না মা। মেয়েটার জন্মে নয়, মেয়েটার প্রতি আমার ভালোবাসার জন্মে। আমার পক্ষে আর কারকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

—ওরকম মনে হয়। বিয়ে করে দেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হয় না মা, জেনেজেনে আমি কারকে ঠকাতে পারব না। ভালোবাসা স্ট্যাম্প নয় মা, যে একই ছাপ বারবার লাগাব!

—একসঙ্গে থাকতে থাকতে হয়ে যাবে। করে দেখ না।

—মা, একসঙ্গে থেকে যা হয়, তা অভ্যাস। ভালোবাসা নয়। বাবার সঙ্গে তোমার যা ছিল। তা বলে কষ্ট যন্ত্রণা তুমি কি কম পেয়েছ?

ছেলের মুখে নিজের অন্তর্গত কথা শুনে কেঁপে ওঠেন দেবিকা। সারা জীবনের বিশ্বাস, সংস্কার দিয়ে ভেতরের সব শূন্যতা অপমান ও আকাজ্ঞার টান আড়াল করে রেখেছেন। ঐকড়ে ধরে থেকেছেন কর্তব্য ও দায়িত্বের দুই পোক্ত ধাম। যাতে আলগা না হয় বন্ধ মুঠি। পিছলে না যায়। যা-কিছু কান্না কেঁদেছেন গোপনে, নিজের মধ্যে। ছেলে তার সন্ধান পাক চান নি তিনি। নিজের লজ্জা দেবিকা সম্বন্ধে ঢেকে রেখেছেন সকলের অগোচরে।

দেবিকা বলেছিলেন, সে আমার ভাগো যা ছিল, হয়েছে। আমার কথাটা শোন, ধোকা।

হর্ষ বলে, এ-অভ্যুত্থান আমাকে কোরো না মা।

আর করেন নি। কিন্তু, হঠাৎ শ্রবণকে দেখার জন্তে বাস্তব হয়ে পড়েছেন কেন? কী কারণ থাকতে পারে, ভেবে পায় না হর্ষ। অথচ শ্রবণকে খবর দেবার উপায় কী! খবর দিলে কি ও আসবে? কাছাকাছি থাকলে হয়তো আসত। অত দূর থেকে আসা কি সম্ভব? মা এমন অবুধ বায়না ধরেছেন। কী করবে ও?

বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হর্ষ। জুতোর শব্দ তুলে ঘরে ঢুকলো অংশুমান। ওকে দেখে হর্ষ খুশি হয়। স্বতির বরকে একটু বেশি পছন্দ করে। হাসিখুশি মেজাজের ছেলে। তুলনায় তিথির বর দেবেশ চাপা স্বভাবের।

হর্ষ বলল, তুমি নাকি মাস্টার্স গিয়েছিলে?

—যাবার কথা ছিল। ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে গেল। তাই দেবেশদাকে তুলে নিয়ে চলে এলাম।

—দেবেশ কোথায়?

—মার ঘরে।

গলা নামিয়ে মজার হুহুে অংশুমান বললো, দাদা, মা নাকি আপনার লেডি-লাভের জন্তে অস্থির হয়ে পড়েছেন! খবর পেলেন?

মাথা নেড়ে হর্ষ অংশুমানকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে—কী করি বেলো তো?

অংশুমান বলে, মুশকিল। মাত শমুদ্র চণ্ডা প্রেম আপনার। হুহুমানও পেরুতে পারবে না!

—ইয়াকি হচ্ছে!

হর্ষর কথাব ওপরেই চিংকার ভেদে এলো—দাদা—অংশু—। দেবেশের গলা।

অংশুমানসহ হর্ষ দ্রুত পায়ে ছুটে গেল। মার ঘরের সামনে দেবেশ।

—মা যেন কেমন করছেন। আপনাকে চাইছেন।

হর্ষ মার কাছে মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। মার কপালে ঘাম ভেতরে কোনো একটা কষ্ট হচ্ছে। মার হাত নিজের হাতে তুলে ডাকল—মা—

মার হাত ঠাণ্ডা। হর্ষ বিচলিত বোধ করে। ইন্দ্রিতে অংশুমানকে ডেকে বলে, ভাতারবাবুকে ফোন কর। যেন এখুনি আসেন।

মার ঠোঁটে কষ্টের ধ্বনি। শরীরে অস্থিরতা। হর্ষ জিজ্ঞাসা চোখে স্বতির ঝিকি তাকায়। ওই ছিল সাধারণ।

স্বতি কিসকিন্দ করে বলে—ভালোই ছিলেন। দেবেশদাকে দেখে কথাও বললেন। তারপর হঠাৎই বলেন শ্রবণ আসেনি? শ্রবণা?

হর্ষর কপালে ভাঁজ পড়ে। ও মার গা ঘেঁষে বসে ডাকে—মা—মা—
একটু পরে চোখ খুলে দেখিকা বলেন, থোকা শ্রবণা আসে নি? আমি বলাতেও এল না?—খুব দীর্ঘ করে।

হর্ষ বলে—আসবে মা, আসবে।

যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাঁক ধরা গলায় দেখিকা বলেন—আমার দরকার ছিল। শ্রবণাকে দরকার ছিল।

—কী দরকার, মা?

—একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।

হর্ষ বলে—আমাকে বলো মা। আমি ওকে জিজ্ঞেস করে আসব। এখন তোমার কষ্ট হচ্ছে। পরে বোলো মা।—হর্ষ মার কপালে হাত রাখে।

দেখিকা বলেন, না, এখনি বলি। আমি শ্রবণার কাছে জানতে চাই, কিসের জন্যে—কেন—থোকায় এত ভালোবাসা ফেলে চলে গেল! কেন চলে গেল! কী পেয়েছে ও যা এই ভালোবাসার চেয়েও দামী। আমি জানতে চাই।

স্বতি দেবেশ চুপ। হর্ষ অস্থিতি বোধ করে। ঘর ছোঁড়া উৎকণ্ঠ স্তব্ধতা। হর্ষ মার কপালে মাথায় হাত বুলায়।

—থোকা—

—আমি বলব মা। শ্রবণাকে বলব। এখন চুপ করে থাকো। জল বাবে মা?

দেখিকা ছেলের কথা শুনেছেন কিনা বোঝা যায় না। চোখ বেয়ে জল পড়ে। হাঁক বাড়ে। ফুলে গুঁঠে বুক। প্রতি শ্বাসে যেন ভেঙে যাচ্ছে শরীরের প্রতিরোধ। হাঁ মুখ করে শ্বাস টানবেন।

—থোকা—

—এই যে মা আমি তোমার কাছেই আছি।

দেখিকা ছেলের হাত ধোঁলে। হর্ষ মার হাত ধরে। ওর ডান কব্জির ওপর দেখিকার ডান মৃতি শক্ত।

জড়িত গলায় দেখিকা বলেন, থোকা—থোকা পরের জন্মে আমি শ্রবণা হয়ে জন্মাব—শুধু তোমার ভালোবাসা—সবটুকু ভালোবাসা পাবার জন্তে—ভালোবাসা ফেলে আমি যাব না—যাব না—

দেখিকার বৃকে একটা বিশাল ঢেউ ভাঙে। হর্ষ টের পায় ওর কব্জি ধরা হাত নিস্পন্দ। ও মার বৃকে মাথা রাখে।

কবিতা

অলোকরঞ্জনের কবিতা

সূরজিৎ ঘোষ

পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে অত্যন্ত বিশিষ্ট কবি স্বভাব-স্বপ্ন অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত। ছন্দের পারঙ্গমতায়, তীক্ষ্ণ বাচনভঙ্গিতে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে অভিনবত্বে প্রথম থেকেই তিনি পাঠকদের মনোযোগ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন নিজের দিকে। আমরা যখন কিশোর, সেই সময় থেকেই তাঁর উপস্থিতির উজ্জ্বলতা আমাদের ঘন্সামাত্র কবিতা-অভিজ্ঞতার গায়েও এসে লাগছিল। কিন্তু তারও কত আগে থেকেই যে তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়েছিলেন তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক কবি অলোক সরকার-এর স্মৃতিচারণে (শতভিষার পঁচিশ বছর)।

এখন এই ১৯৮২ সালে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশের কবিদের কবিতার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় তা হল,

ক. এরা অনেকেই নিজেদের বিশ্বাস, আবেগ বা যন্ত্রণাকে চিহ্নকর করে জানাতে চাইতেন বা এখনো চান।

খ. বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি অনীহা প্রকাশ, সামাজিক নানা বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা।

গ. নারী শরীরের রহস্য ও সৌন্দর্য, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতা, শরীরী প্রেম ও তার অবসার অনেকেই কবিতার প্রধান উপজীব্য।

ঘ. আবার কেউ কেউ এই সব কিছুকে ছাপিয়ে এক গভীর দর্শনে পৌছতে চেয়েছেন। সে দর্শন কোনো শুভ আন্তিকারই হোক বা কোনো নিরাশ্রয় উৎকণ্ঠিত অসহায়ত্বই হোক।

অলোকরঞ্জন হলেন এই শেষোক্ত ধরনের কবি। তাঁর কবিতার দর্শনের

নিভাব

৫৩

ভিত্তি প্রোথিত এক গভীর অস্তিবোধে এবং ক্রমেই তা এক বিশ্বজনীনতার অবয়ব ধারণ করছে।

অলোকরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঘোবন বাড়ল'। এই প্রথম বইটিই তাঁকে এমন এক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা খুব কম কবির ভাগ্যে ঘটে। এরপর একে একে বেরিয়েছে 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', 'রক্তাক্ত স্বপোখা', 'ছোঁকাবুকের মুখোশ', 'গিলাটিনে আলপনা', 'লঘুসদীত ভোবের হাওয়ার মুখে' এবং এখন পর্যন্ত সংশোধনের 'জবাবদিহির টিলা'। আরও বহু অল্পবাদ কবিতা, গ্রন্থ, যা মূল্যগ্রহণ হয়েও তাঁর স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে প্রসঙ্গে এই পরিচয়ের আলোচনার স্থান নেই। এ ছাড়া পত্রপত্রিকায় ইদানীং তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে যা সংগ্রহ করে আবার ছুটি গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। কোনো গ্রন্থেই আলোচনা করে আলোচনা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। সব মিলিয়ে তাঁর কবিতার যে রূপটি সেই রূপের মধ্যে জেগে-ওঠা কবির যে ব্যক্তিত্বটুকু আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে সে সন্দেহেই সামান্য ছু একটি কথাই এই প্রতিবেশন।

প্রথম ঘোবনে যে বাড়লধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন অলোকরঞ্জন তার শান্ত ও আনন্দিত রূপটির ছবি এত কাল পরেও মান হ'ল না আমাদের কাছে। সেই শুদ্ধ আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণের মধ্যে কোনো বিযুক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। আমরা কেবল ধ্যানের বীজময়ের মতো শুনেছি।

"এজমে জানি না, তবু আর জন্মে হুজাতা ছিলাম"। কখনো বা পরম বিশ্বাসের মতো নিজেই বলেছি,

'আমরা যাব জলের মতো পায়ে পায়ে

পাশের গায়ে, পাশের গায়ে, পাশের গায়ে।'

কিন্তু এই তন্ময় বিশ্বাস, দৃঢ় আন্তিকাবোধের চারপাশে ক্রমে জমা হতে লাগল আধুনিক প্রত্যয়হীন জীবনের বিবিধ যন্ত্রণা। গোড়া ঈশ্বরভক্তের মতো অলোকরঞ্জন কিরিয়ে গিলেন না তাঁদের। বরং নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করতে চাইলেন সেই অবিধাস ও সন্দেহের বিষ। লেখা হলো 'নিষিদ্ধ কোজাগরী'। যদিও তাতে তিনি লিখেছিলেন,

"তবে শোনো, এই নগরীর সন্তান

আমিও, অথচ যে-রাখাল দুর্বদী,

আমি তার কাছে সঁপেছি মনপ্রাণ,

কেন না শহরে পাঠভদ্র বড়ো বেশি।"

তবু নিঃসঙ্গ বাথালের পবিত্র ছোটো মাঠটি যে ক্রমেই জর্জরিত পরিবেশে ঘিরে যাচ্ছে, শুদ্ধ কবির সঙ্গে পারিপাশ্বিকের সেতু হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতা আর অস্বীকার করার উপায় হইল না। এই গ্রন্থে। শান্ত আশ্রমগততার ব্যক্তিগত ভুবন থেকে ক্রমে অবৈধ ক্রেনের বহির্ভাগে প্রবেশ করলেন কবি। তবে এই ঘৃণা, দ্বিধাদীর্ঘ পরিবেশের অমোঘ অনিবাধ্যতা স্বীকার করে নিয়েও প্রাক্তন স্বর্গকে ছাড়লেন না কখনো। এরই মধ্যে নিজস্ব ভঙ্গিতে তাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টাও চলতে লাগল। তাই 'পেলব আততায়ীর তৃণ যে বইতে গাঁয়ের সরল 'বহিন্কে' অবজায়-সন্দেহে ছিড়ে ছিড়ে পুরুষদের হাতে তুলে দেয়, সেখানেই আবার দেখি 'রেললাইনের ওপার থেকে একটি শিশু এসে' কবিকে নিয়ে যায় এক 'আকাশ সর্বস্ব' ছাড়িনিতে। সেখানে গিয়ে 'সকল-স্তম্ভ জননীটির কাছে। বলে : "মাগো, জাথো জাথো কাকে আজ এনেছি, আর আমাকে বকেই পারবে না।"

ঐতিহ্যবাহী অস্ত্রায়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে করতেও অলোকরঞ্জনর সহজাত আন্তিক্যবোধ মরে না। এই প্রচ্ছন্ন, গাঢ় অহুত্বীয় বিশ্বাস 'রক্তাক্ত বয়োথা' থেকে 'ছোকাবুন্দির মুখোশ'এ পৌছেও অবিকৃত রহস্যময়তায় বিহ্বল। আসলে অলোকরঞ্জনকে অনেক সময় মনে হয় এক নিপুণ বহুস্তম্ভী। নানা পোশাকে, নানা রঙে, নানা ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়িয়ে জীবনকে যে আশ্বাদ করে চলেছে। বাবহারিক জগতের লঘু চটুল চাষের টেবিল থেকে বাংলার গ্রামে গ্রামে, শায়্য পৃথিবীর মন্দির-গাঁজায় আর শিল্পভবনে, টেবলটেনিস-এর চব্বর থেকে সোনালী ফুটবল-এর জগতে যার অনায়াস গতি। তবে সে ভ্রমণ নয় কোনো অগভীর সাংবাদিকের অথবা শৌখিন ট্রাফিক্ট-এর, সে ভ্রমণের তীব্র অভিজ্ঞতা ক্রমশ আমাদের এক গুচ্ছ আয়িক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন আলোর দিগন্তে পৌছে দেয়। অলোকরঞ্জন তাঁর ব্যক্তিগত কাব্যদর্শন নির্মাণ করেন এই বিচিত্র ভাবঘূর্ণন পদ্ধতিতেই। মনে পড়ে 'নিবাসন' কবিতার সেই উপলব্ধি

"আমি যত গ্রাম দেখি

মনে হয়

মাগের শৈশব।

আমি যত গ্রামে যত মুক্তক পাহাড়শ্রেণী দেখি

মনে হয়

প্রিয়ার শৈশব।

পাহাড়ের দ্বয়ে যত নীলচে হলুদ বর্ণা দেখি

মনে হয়

দেশগায়ে ছিল কিঙ্ক ছেড়ে-আমা প্রতিটি মাহুষ।

বর্নার পথেই নদী, নদীর শিররে

বাশের সাঁকোর অভিমান

যেই দেখি, মনে হয়

নোয়াখালি, ধীর সেতু, আর সে-নাছোড় ভগবান।

অলোকরঞ্জনর প্রতীতি কোনো উদাসীন আধ্যাত্মিকতা নয়, সে ঐ নাছোড় ভগবান দ্বার উদ্দেশ্যে তিনি বলতে পারেন, "এই জাথো করপুটে একটি মাহুষ। বিখাসের জল, ভূমি পান বরো, আমি জল না থেয়ে মরব।" তিনি আর কোনো নিষ্পূর্ব বাউল নন, জীবন-সংস্রাবে প্রবলভাবে যুক্ত, ধৈর্য-মাহুর্গ, ভটিলতা-বিকলতায় পোড় খাওয়া এক সংবেদনশীল কবিচিত্ত। তাঁর ধর্ম কোনো ভঙ্গুর শাস্ত্র নয়, নয় কোনো নিবায়নর শূন্যতার চর্চা। প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মাহুর্গের আন্তরিক সন্তানই তিনি যে চিরদিন অনেক বেশি মূল্য দিয়েছেন তার প্রমাণ সাম্প্রতিক 'জ্বাংবদিহির টিলা' কাব্যগ্রন্থেও স্পষ্ট।

উল্লিখিত এই সমস্ত কারণেই অলোকরঞ্জনকে দেখি বুদ্ধকে অবতার হিসেবে না দেখে পুরুষ হিসেবে দেখতে, দেখি ভালাবাসার প্রবৃত্তি সযত্নে সাধ্যাতে মত্ত হতে, দেখি শিল্প ও প্রেমের সম্পূর্ণতার জন্ত ছুটে মরতে। তাঁর বইগুলিও এই ছোট্টার জগতে এক-এক-সময়ের এক-একটি আলোড়ন ধরে রেখেছে। কখনো তা সরল গ্রামীণ, কখনো সে শহুরে মুশায়েরায় বাস্তব, কখনো বা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্বাস ও নৈরাশ্যের টানাপোড়েন থেকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে কবির কেন্দ্রে স্থিত সত্যটিকে। 'গিলোনে আলপনা' থেকে 'লঘুসঙ্গীত ভোরের হাওয়ার মুখে' পৌছে মনে হয়েছিল যেন এক আশ্চর্য ভোর, যখন অন্ধকারের নিরেট প্রাচীর একটি ছোট পাখির ঠোঁটের এক-এক আঘাতে হুলে যাচ্ছে আর একটু একটু করে বেরিয়ে পড়ছে আলো। কিন্তু যখনই জানতে গেছি,

এ কোন্ পাখি, হৃদযাত্রা, না ছাইরঙা কাবাসী?

বুড়িঘোয়া হলদে খণ্ডন?

কক না নীল পতঙ্গজুক

অথবা রাজস্বকুন বিলম্বণ?

তখনে অলোকরঞ্জন আমাদের ছেড়ে পোড়ে গিয়ে উঠেছেন 'জবাবদিহি টিলায়'। পাঠকে নিয়ে এই এক খেলা তাঁর। ছুঃখতাপের উপত্যকা থেকে দিবানিশির স্বতন্ত্র আচরণের আপাতজুহু পেরিয়ে এক অভিজ্ঞতা, বধন শিল্পময় হয়ে ওঠে হতায়া। গিলাটিনের দৃষ্টি আলপনার বিভ্রমে ঘুরে যায় নিঃশব্দ জবাবদিহিতে।

অলোকরঞ্জনের সচেতন আঙ্গিক-মনস্কতার কোনো দিক নিয়েই আলোচনা করি নি এই পরিসরে, যদিও তা বাদ দিলে কবির ব্যক্তিত্বকে বোঝানো যায় না পুরোপুরি। তবু যে তা নিয়ে কিছু বলি নি তার কারণ তাঁর সম্বন্ধে প্রায় সব আলোচনাতেই ঐ আঙ্গিক-নৈপুণ্যের কথাই সর্বাগ্রে বলা হয়, যার আড়ালে চাপা পড়ে যায় তাঁর কবিতা শিল্প। একই কারণে তাঁর ছন্দ-পারঙ্গমতা ও বাঙ্গালি উচ্চারণের কথাও আর বিস্তার করে বলছি না। পাঠক বড়ো বেশি মনোযোগ এদিকে দিয়েই বাসে আছেন। এ কথাও অবশ্য তাই স্বীকার করে নিতেই হয় যে ঐ নৈপুণ্যই ঘটনাচক্রে অনেক সময় অলোকরঞ্জনের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা। একটু যেন শিথিল হলে ভালো হতো, একটু ঘনিষ্ঠত্ব করতেন তবেই যেন মনে হতো আরো কাছের মানুষ বলে।

যাক সে কথা, কিন্তু এ প্রশংসা তাঁর একটি প্রিয় আঙ্গিকের কথা না বললেই নয়। গল্পের ভঙ্গিতে এক অন্তর্নিহিত সত্যকে উন্মোচিত করা তাঁর প্রিয় ধরন। উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই; তাঁর কবিতার পাঠকের কাছে এ রকম কবিতার স্বত্তি অপরিহার্য। কিন্তু গল্পগুলি যে আসলে গল্প নয়, তার মধ্য দিয়ে কবি যে আমাদের নিয়ে যান এক করুণ উপলব্ধির ভ্রমতে সে কথা ভুললে চলবে না। এই রচনার সঙ্গে যুক্ত তাঁর কবিতাগুলোর 'দ্রবত' কবিতাটিও তেমনিই একটি অভিজ্ঞতা।

এই কবিতাগুলোর কথা বধন এসে পড়লে তখন আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলি যে কবির এই সাম্প্রতিকতম মত খোজনার তাঁর দর্শন যেন পরিণত হয়ে উঠেছে আরো। এখন বোধ হয় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মনে নিয়েছেন সময়কে, তাঁর প্রৌঢ় বয়সকে। তাই তাকেই তাঁর 'ভূমি-ব ভূমি.....নিবন্ধন' এর হাতে ভুলে দিয়ে আবার 'স্বপ্নভাষ্য' বলে শুরু করতে চান নতুন খেলা। কিন্তু সেই-সঙ্গে তাঁর দর্শনের বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি কি তাকে মরিচেরে নিয়ে যাচ্ছে না আমাদের কাছ থেকে? এই গুলোর সবকটি কবিতাই কি আশ্রয় হবে আমাদের?

হেতো এ আমরাই সীমাবদ্ধতা। এতদিন তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ

ছিল যে বড়ো বেশি বাঙ্গালি তিনি। লক্ষ্য করেছি প্রায় মুম্বাদোমের মতো 'ধুকুনি' আর 'তুকুনি' দিয়ে অসংখ্য কবিতা শেষ করবার প্রবণতা তাঁর, তবু সেই মায়ায় নিজেকে জড়িয়েছিও বাববার। আজ কি তবে নাগালের বাইরে চলে গিয়ে তাঁর বিশ্বনাগরিকেরে উত্তীর্ণ হওয়ার বিরুদ্ধেই আমার অক্ষম অভিযোগ? ক্রীতদাসের মতো যে বলেছিলেন "কবিতা ধর্মবিশ্বাসের মতো তা আলোকিত করে তাদেরই ঘাটা তাতে বিশ্বাস করে"—আমি কি তবে সেই মোল বিশ্বাস থেকেই ভ্রষ্ট? জানি না। জেগেটা বলতে পারবেন। একজন অচরাঙ্গি পাঠক হিসেবে আমার কেবল এইটুকু স্বাক্ষরোক্তি যে ক্রমেই তিনি বড়ো বেশি জটিল আর দূরের হয়ে যাচ্ছেন আমার কাছে। এখনো মাঝে মাঝে মনে হয় ধরতে পারছি, আবার পরক্ষণেই হারিয়ে ফেলাছি হুজুটুকু। তাঁর সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত করে সজ্ঞা একটি নিবন্ধ লেখার বাসনা ছিল আমার। কিন্তু তাঁর বিচিত্র অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখা লেখবার যোগ্যতা, আমার আর থাকবে কিনা তা নিয়েই এখন সন্দেহ জাগছে। তাই এই লেখার শেষেই তাঁর কবিতা ও কবিতাজীবনের প্রতি আমার মনোভাব জাগিয়ে রাখি তাঁরই ভাষা থেকে:

দ্বিতীয় ভল্যুম বেরুবে কি বেরুবে না

জানি না। শুধুই প্রথম ভল্যুমে

যুমে জাগরণে জাগরণে যুমে

একটি শব্দ লিখে রাখি: 'ভালোবাসা'।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আটটি কবিতা

সপ্তম গুণ্ডে

ভাজিল সপ্তম বৃত্তে বেরকম

দাত্তকে গভীরে নিয়ে গিয়ে

নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়েছিলেন

কাপিয়ে দিয়েছিলেন সহযোগীর আত্মস্বত্ব

তেমন সত্যীর্থ খুঁজে

চরাচরে

কুঁজো হয়ে আসা আমার শরীরের ভিক্ষার বাটি

পেতে আছি আমি

ভদ্র আয়ুর্নিয়াম আচাষতে দীর্ণ করে দিয়ে

তার সঙ্গে স্বাস্থ্যায় সখা আর তীত্র মতান্তর
উদ্ঘাটিত করে দেবে অনন্তের চিহ্নন প্রান্তর ॥

সাবিকখন

ফিরে আসবে
তোমার দিকেই ফিরে আসবে
উদ্ধত ঐ

কোমারী, তার বেণীর মধ্যে
আরু এক প্রতিজ্ঞা আর
তার তিহরের লাবণ্য এক
অনবচ্চ শৌর্ধ নিয়ে
তোমার দিকেই ফিরে আসবে
তখন আমি
তোমার মুখে স্তনতে চাই না
স্বলভ কবির কবিস্বলভ
প্রত্যাখান :

‘ধ্রুবতী, কিংবা বড়োই মুখরা এই
মহিলা চান
আমার পংস’ ইত্যাদি অছিল— তোমার
জিহ্না যেন সত্যের সৌজন্তে হঠাৎ
কর করে দেয় তোমার-ভূমি ; স্বকুমারীর
ভিতর থেকে ঈশ্বরী এক
তোমায় যেন জয় করে নেয় ।

যে-মুহুর্তে

এই বলেছি, কাপোরয়ে
ছর কিন্তু আমি নিজেই, অল্পপাড়ার
একটি কিশোর হঠাৎ আমার

ভিতরঘরে মুখ লুকেতে
যেই এসেছে তস্মিন তার
কবি ও বিপ্লবী স্বভাব
লুপ্ত ক’রে উন্মোদনের থাবায় তাকে
অর্থ দিয়ে শেষ করেছি এই কবিতা ॥

নির্ধারণ

বতিচেল্লির ‘চিরবসন্ত’ ছবিটাকে ওরা ছিঁ ডেথুঁ ডে শেষে
কেলে দিয়েছিল, চূর্ণ অংশগুলিকেও নিয়ে অনায়াসে খে-লে
খেলছিল ।

আর এমন সময় আচম্কা এল কণবদন্ত
শিরীষে-শিম্বে, রমণীর চূলে, পুরুষের ভীর্ণ-সাহসী আঙুলে,
আর তাকে নিয়ে কী করবে সেটা বুঝতে না পেরে হা-হতভত
তস্মিন ওরা আরো একবার ডাক দিল বড়ো বতিচেল্লিকে !

দত্তক

সহযাত্রী তাঁর ছোট্ট ছেলেটাকে সমস্তক্ষণ
ভুল বোঝাচ্ছিলেন । আমি অনন্তোপায় স্তনছিলাম ।
অন্তরলনি মহম্মটকে তিনি রাজভবন ব’লে
কোট্ট উইলিয়ামের মাঠে রাজভবন প্রয়োগ করলেন ;
ছেলেটা সহাস্তে ‘বাবা ওটা কী ?’ ‘ওখানে কাল রাতে
জিগলজিকাল সার্ভে ব’লে একটা জাহুধর ছিল,
এখন ওখানে থাকে নহুধ রাজার বংশধর ।’
‘গাছের মতন ওটা বাবা কী বলা-না’ ‘ওরা ওটা
ওরাং ওটাং বলে’ ; শেক্সপীর সরণীকে
লাউডনপ্লট ব’লে অক্রেসেই চালিয়ে দিলেন,
অভঃপর তিনি যেই প্র্যানেটারিয়ামের মধ্যে ঢুকে
মঙ্গলগ্রহকে গুণ্য এই মর্মে গনাজ করলেন
‘আমি তাঁর দুই চোখে ঈশ্বরের পূলা দিয়ে গেই
ছেলেটিকে এখন নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছি ।’

ভাগের রং

জুসলপুরের মাৰ্বেল রকে
মোজ করে বসেছিলেন
পাবলো নেকদার বণিত
লরীর স্বন্দর স্বকে
ভাগ্য যেমন ওতপ্রোত
ঠিক সেরকম হবার ব্রত
সঙ্গে এনেছিলেন নরেন
অবিকল স্বমনোনীত
নিও-লিটের নিয়ন আলোর
দেখাছিল আত্মহীত
এই যেন-বা ঈশ্বর ছোয়
তখন কি আর জেনেছিলাম
জীব-পকেটে জিন্মা ক'রে
আমাদের এই তৃপ্ত নিজাম
এনেছেন তিন কিন্নরীয়ে
পিঙ্গলা স্তম্ভা ইড়া
ভিন্নমুখী তাদের প্রেমে
মাৰ্বেল-রক উঠল ঘেমে
তবু তাদের স্বকে বরং
দৌড়াপোর কিরোজা রং
জর্জরিত তখন নরেন
ওদের রেপেই সরে পড়েন

সাতকাহন

খেতকরদী চেতন করবী
পাল করবী জড়,
তুমি একবার স্পষ্ট ভেবে ছাপো
কংকত নিৰ্বাপ্ত
জটিলতত্ত্ব, বাহিরে বাহ্যর

অন্ধরে নিশ্চল,

কিন্তু অনেক বোবা পাথর আছে
ভিতরে বয় জল।

তুমি যখন নীলাভ বর্ধাতি
মেলো আমার পানে,
আমি ভাবি আকাশ ছেয়ে ফেলি
আমার গানে-গানে,
আমি ভাবি সমস্ত পৃথিবী
ভাসাই ভেলার মতো,
কিন্তু আমার শরীর আছে আজ
শবসাধনারত।

হয়তো ভীষণ বৃষ্টি হবে, আমি
আচম্কা চোখ তুলে
তাকাবো ঐ মাঠের দিকে, আমার
শান্ত শরীর ছুঁলে
দেখবে তুমি গুনবে তুমি সবি
অন্ধরে-অন্ধরে,
তফাৎ শুধু পুঁবেব বাতাস বহে
অধিক শব্দ ক'রে।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে

তুমি মাছ

চৌদিকে তোমায় বেজে উঠেছে নিগ্রো নাকাডা ষড়্ গোষ্ঠামীর মৃদঙ্গ
তুমি গোটা ব্যাপারটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো
তুমি যা করবে সেটাই হয়ে উঠবে সমগ্র মহাশব্দের মানদণ্ড

তুমি মাছ

তোমার পরিণীতাকে সত্যোক্তনাথের মতো প্রকাশে ঘোড়ার পিঠে

বসিয়ে নিয়ে যাও যারা তোমাকে ঈর্ষণ বলবে
তোমার অঙ্করণে মেতে উঠবে তারাই

মাহুষ তুমি

স্বাধীন অস্থখ সারাবে বলে এসেছো পৃথিবীতে

অজ্ঞ তোমার বুড়ো মাস্তুরমশাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন

নিজে

তাকে নিয়ে তোমার ধরিত্রী ঘুরিয়ে আসবার সময়

দেখতে পেয়েছো ধর্মকাম এক যুবা

তাকে অবজ্ঞা না করে তোমরা গল্প করতে-করতে এগিয়ে যাও ॥

উৎসর্গ

কৃষ্ণনন্দ ভূমিকা এত পণ্যগোহেয়ান পরজ্ঞান

বুদ্ধনট্টা সরিয়ান স্বাক্ষরসমি পুণ্যে ।

—ধর্মপাল ভিষ্ণু

সবশেষের বিকেলবেলায় মল্লিকাভূষণে

ঘে-গাছ থেকে দিয়েছিলাম মল্লিকা তোমাকে

আজকে বধন সেইদিকে হঠাৎ

চোখ পড়েছে স্বল্প আমার হাত :

আরো অনেক ফুল ধরেছে গাছের অধঃশাখে ।

আজকে আবার বিকেল হবে, তখন আমি থাকে

কৃষ্ণনন্দ দেবো, তিনি আরেকজন

সেজন আমার তুমি-র তুমি, সবাই বলে তিনি নিরঞ্জন ;

গাছ থেকে ফুল না তুলে তাঁর মল্লিকাভূষণ হাতে

দেবো আমার প্রৌঢ় বয়স বলব : 'সুপ্রভাত' ॥

সম্পূর্ণ

শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী

সুন্নীল গঙ্গোপাধ্যায়

গাজীপুরের হাটে একদিন হঠাৎ গোলমাল লাগল। মিঠে আলু আর কুমড়োর ব্যাপারীদের মধ্যে বসবার জায়গা নিয়ে প্রায়ই কথার টঙ্কর হয়, এক একদিন আশুপ্ত জলে। তা সেদিনকার আশুপ্ত এমন কিছু নয়, ধোঁয়াই বেশি। গলা ফাটানো চিৎকার, পেট উজাড় করা পালমন্ড, ঠেলাঠেলি, ছ' একজন লাঠিও তুলেছিল। সেই লাঠির ঘা শুধু একজনের মাথাতেই পড়ল। সে আর কে হবে, হাজু ছাড়া? সে মিঠে আলুও বেচে না, কুমড়োও বেচে না। সে একটা মধো-নাচে-ঘোড়া।

হাজুর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরুতেই ছ' দলই জাতকে উঠলো। কাজিয়া খামিয়ে ছ' দলই হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার ওপর। তখন কত আহা-উহ। লাঠির ঘা খেয়ে হাজু মাটিতে বসে পড়লেও অবশ্য একটা টু-শব্দ পর্যন্ত করে নি, ছ' হাতে মাথা চেপে ধরে সে ভীত জন্তুর মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। যেন সবটাই তার দোষ। সত্যিই তো তাই, সহ্যহুত্বিত্তি ফুরিয়ে যাবার পর সবাই বলতে লাগলো, তুই মাঝখানে এসে পড়লি কেন হারামজাদা?

হাজুর ভাগ্যটাই এরকম। বিপদ যেন তাকে টানে। এর আগে একদিন এই হাটেই কে যেন একটা ঝাঁড়ের ল্যাজ মুড়ে ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিন সেই ক্ষ্যাপা ঝাঁড়টা শুধু হাজুকেই তো গুঁতলিয়ে সপাট করে গেল। আর কাকুর গায়ে একটা ঝাঁড় পর্যন্ত লাগে নি। তার আগে একদিন পুষ্কর থেকে সাপলা তুলতে গেল একটা জল-টোড়া সাপ কামড়ে দিয়েছিল হাজুকে। গাজী-পুরের কোনো মাহুষকে জল-টোড়া সাপের দংশন সেই প্রথম।

গাজীপুরের হাটে হাজু কেন ঘুরে বেড়ায় জিজ্ঞেস করো তো? সে ব্যাপারীও না, খদ্দেরও না। সে এমনিই ঘুরে বেড়ায়। পরনে সবুজ-কালো লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি। সরলরেখার মতন চেহারা, সেইজন্মই তার হাত-পা বেশি লম্বা ধাড়েরা দেখায়। সাতদিন-দশদিন অন্তর সে দাড়ি কাষায়। চেনা

বা অচেনা যে-কোনো লোকের মুখের দিকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাকে মাঝে। তা বলে, তার দৃষ্টিতে কোনো কাঙালপনা নেই, বরং উন্মোহিত, সে যেন একজন উদাসী।

গাজীপুরের হাট ভালো জায়গা নয়। অনেক টাকার লেনদেন হয়, তাই শত্রুনিদের নজর আছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খটাখটি লাগাবার কিংবা হান্ধামা উদ্দেশ্যে দেবার মতন লোকেরও অভাব নেই। দোকানীরা অধিকাংশ হিন্দু হলেও মহাজন মুসলমান। নতুন এম এল এ হয়েছে শেখ আনোয়ার আলী, কিন্তু পরাজিত এম. এল. এ. বিষ্ণু সিকদারের দাপট এখনো যথেষ্ট। এইসব মিলিয়ে এখানে মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় আছে স্বস্থ স্বস্তোর ওপর, যে-কোনো সময় সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে।

এইরকম জায়গায় ধুরন্ধর মাছর ছাড়া স্ববিধে করতে পারে না। চোপার জোর কিংবা হাতের গুলির জোর কিংবা টাকার জোর, একটা কিছু জোর থাকা চাই। হাজুর এর কোনোটা নেই। তার যেন কোনো বোধ-ভায়াই নেই। সে কাকুর কাছে কিছু চাইতে জানে না, দিতেও জানে না। তার বয়েস বখন আর-একটু কম ছিল, তখন প্রায়ই দেখা যেত ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা তালগাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। স্বর্গাস্তুর সময় সময় আকাশের একটা দিক ডুবে থাকে লাল রঙে, হাজুর সেই রঙের মধ্যে কী যেন দেখে। অনেকে ভাবতো, এ ছেলেটা কফির-টকির হয়ে যাচ্ছে না তো!

সেই তালগাছ থেকে একদিন নিচে পড়ে গিয়েছিল হাজুর। এখন আর সে সেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে না। এখন সে খালের জলে সেই লাল রঙের আকাশের ছবি দেখে।

হাজুর মাথা ফাটার পর তার চাচার বন্ধু মোজাম্মেল গাঁদা ফুলের পাতা ছেড়ে রস লাগিয়ে দিল সেখানে। তারপর তার হাতে একটা বিড়ি দিয়ে বলল, ভালো করে ভেবে গ্ধাষ তো, কে তোকে মেরেছে? তুই দেখতে পেরেছিলিস?

হাজুর শেখ ছ' দিকে ঘাড় নেড়ে বললে, না, মোজাম্মেল চাচা।

মোজাম্মেল তার দিকে অরজার চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, কে বলে তুই কোনো কন্দের না? তুই মার খেলি বলি তো ঝগড়া শেষে গেল, নইলে আরো কতদূর গড়াত কে জানে। যা, বাড়ি যা। তাকে মেরেছি আমি!

বিড়িটা ধরিয়ে হাজুর বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। মোজাম্মেলের কথা একটুও দাগ কাটে না তার মনে। তার মাথা এখনো দপদপ করছে, একটা রক্তের ধারা তার কাঁধ বেয়ে নেমে এসে পিঠের কাছে পেঞ্জিটা রক্তিম করে দিয়েছে।

শীতের শুকনো খাল পায়ে হেঁটে পার হয়ে হাজুর মাঠের মধ্য দিয়ে আসে আশ্পেট হাঁটতে থাকে। কেউ তাকে কোনোদিন হনহনিয়ে হাঁটতে দেখেনি। তার জীবনে সব-কিছুই ঋণ। খোদা তাল্লা তাকে এইভাবে গড়েছেন, সে কী করবে! দুপুরবেলার আকাশের নিচ দিয়ে তার ছায়া দেখতে দেখতে চলে।

মোজা বাড়ির ছেলে হাজুর যেন হিন্দু বাড়ির এঁড়ে। সে কখনো কোনো কাজে লাগল না। মাঠের কাজ, জলের কাজ, ঘর-বাড়ির কাজ কিছুই সে পারে না। সে তার বাপ-চাচার কাছে এইজ্ঞার পরেয়েছে অনেক, তারপর একসময় সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। ও তো ফাঁকি বাজ নয়। ও পারে না। মাঠের আগাছা নিড়োতে দিলেও সে হাতের কান্ডেখানা নিয়ে উঁবু হয়ে চুপ করে বসে থাকে। সে আগাছাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে। যেন সে কত কী চিন্তা করছে, আসলে সে কিছুই ভাবে না।

সংসারের নিয়ম অহুয়ারী হাজুরও বয়সকালে বিয়ে হয়েছে। জন্মে গেছে চারটি সন্তান। তবু হাজুর টিক পামী হলো না, পিতা হলো না। তার ছেলেরা কেউ তাকে মানে না, ফকুড়ির স্বরে কথা বলে। তার স্ত্রী সায়েরা অতি মুখরা, সারা দিনরাত বকতে বকতে সায়েরার মুখে কেনা উঠে যায় তবু হাজুর সামান্য হাঁশ-বোধ নেই। সে রাগও করে না, করিংকরামও হয় না। সে যে-রকম সেই রকমই থাকে।

বাড়ি পৌছোবার মুখে পুকুরে পা ধুয়ে নেয় হাজুর। এক পায়ের পাতা দিয়ে আর-এক পায়ের পাতা রগড়িয়ে খুব খাঁ খিরিভাবে, তার কোনো ব্যস্ততা নেই। এখন থেকে রাস্তার পথস্থ সে ঠায় বসে থাকবে বারান্দায়, যতক্ষণ না তাকে খাবার দেওয়া হবে। একমাত্র খাওয়ার প্রতিটি টান আছে হাজুর, সে যেতে ভালোবাসে।

ইদানীং অবশ্য রোজ ছ'বেলার খাওয়া টিক টিক পাওয়া যাচ্ছে না। এতকাল বৃহৎ একানবতী পরিবারে গোলে হরিবোলে তারটা জুটে যেত। রোপা ছেলের ওপরে মায়ের টান বেশ। এই বাথ ছেলেটির প্রতিভা তার আশ্চর্য বড়ো মার্য ছিল। আশ্চর্য ইন্তেকাল হয়েছে গত সালে। বাপ গেছে

আগেই। বড়ো ভাই নিজের অন্ন আলাদা করে নিয়েছে। এখন কী করে সংসার চলে তা হাজু জানে না।

সায়েরদারই চোখ পড়ল প্রথম। আপনের মাথায় রক্ত ?

হাজু বলল, হ্যাঁ। রক্ত।

—কী করে কাটল ? আ ? আবার কোথা থেকে পড়ে পাল্যনে ? কথা বলতে বলতে সায়েরদা এগিয়ে আসে, আর তার গলাও চড়তে থাকে। ঊঁট, মজবুত চেহারা সায়েরদার, চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে বোঝাই যায় না। সারাদিন তাকে খাটা-খাটনি করতে হয়, ছুঁজন পুরুষ মাহুষের কাজ সে একলা করে। তার জিহেও খুব ধার।

হাজু'র বড় ছেলের বয়স তের, কিন্তু এর মধ্যেই সে শেয়ানা মাহুষের মতন কথা বলতে শিখেছে। এক বাড়িতে সে রাখালির কাজ করে। সে-ও মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাপকে ঠেস দিয়ে কথা শোনাতে লাগল। ক্রমে ক্রমে বাড়ির অন্ত লোকজনও সেখানে এসে ভিড় জমায়।

হাজুর কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। সে জানে, এই দিনটাও অন্ত সব দিনের মতনই। কিছুক্ষণ সবাই মিলে তাকে বকাবকি করবে, তারপর এক-সময় থেমেও যাবে। রাতের অন্ধকার নামবে, শেখাল ও রাত-চরা পাখি ডাকবে, তারপর একসময় সব চূপ। যেমন সব দিন হয়। কিন্তু তখনো হাজু জানে না, আজ তার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে।

একটু বাদেই জানাজানি হয়ে গেল যে হাজু আছাড় খেয়ে মাথা ফাটায় নি, তাকে কেউ লাঠি দিয়ে মেরেছে। তা শুনে কান্নার উদ্দাম জাগল, কান্নার ফোড়, কান্নার ছুখ। সবাই জানে, হাজুর মতন নিপাট ভালোমাহুষ কখনো মার খাওয়ার মতন কোনো কাজ করতে পারে না। তবু কী বিচিত্র এই দুনিয়া, হাজুই মার খায়।

রক্তে মাথার চুল থানিকটা চাপ বেঁধে আছে। এত লোকের এত কথা শুনেও হাজু'র মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। কান্নার বিদগ্ধে তার কোনো রূপ নেই, আভ্যেগ নেই, সে শুধু বলল, কী জানি, কী করে লাগল। মাথায় একটা বাড়ি পইড়ল, আমি বইসে পড়লাম। বেশি লাপে নি, এই মোটে ঐটুখানি রক্ত...

সায়েরদার দাদা একলাগ এসে পৌঁচেছে একটু আগে। সে-ও সব শুনল। একলাগ জীবনে পোড়-খাণ্ডা মাহুষ, সে অনেক দেখেছে, সে জানে, আজ-

কালকার দিনে নিরাহ, ভালোমাহুষ হওয়ার বিপদ কতখানি। তাদের বাড়ি ছ'খানা গ্রাম পরেই। যদিও সে অনেকদিন ধরে শহরে আছে, তবু গ্রামের খবর রাখে। শহরে থাকা শাণিত কান দিয়ে সে শুনতে পায় গ্রাম-পতনের শব্দ।

শহরে যাবার পথে বোনের বাড়িতে ছ'দুও থেমেছিল, সব বুঝে শুনে একলাগ হঠাৎ প্রস্তাব দিল, হাজু তার সঙ্গে শহরে চলুক। সেখানে সে হাজুকে মাহুষ করে দেবে, ছ' পরস্য রোজগারও করতে পারবে।

প্রথম প্রথম কথাটায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। লাবাগোবা হাজু শহরে গেলে তো ছ' দিনেই গাড়ি চাপা পড়ে মরবে। আর ও করবে পরস্য রোজগার ? ও কী কাজ জানে ? গ্রামেই কিছু পারল না, শহরে তো কাকের মাংস কাকে ছিঁড়ে খায় !

একলাগ সকলের আপত্তি খণ্ডন করে দিল। ঘরে আগুন লাগলে অতি নির্বাধও বাঁচতে চেষ্টা করে। শহরে সর্বক্ষণ জলছে সেই আগুন। সেই আগুনই ওকে বাঁচতে শেখাবে। এতদিন গ্রামে থেকেও তো ওর কিছু হুসার হলো না। শহরে গেলে আর কিছু না হোক খিড়ি বেঁধেও দিনে পাঁচ-সাত টাকা পাবে। শহরে কেউ না খেয়ে থাকে না।

হাজু একলাগের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুনতে লাগল এ-সব কথা। শহর কী তা সে জানে না। ওদিকে মুনীভাড়া আর এদিকে স্থলমান-পুর, এই আট-দশখানা গ্রামের বুজের বাইরে সে যায় নি কখনো। তবু একলাগ যখন জিজ্ঞেস করলো, হাজু, তুমি যাবে তো আমার সঙ্গে ? হাজু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নোড়ে বলল, হ্যাঁ।

রাজিবেলা যাত্রা স্থগিত রইলো। পরদিন সকালে ছুটি পোঁটলা বেঁধে নিয়ে হাজু রওনা হলো একলাগের সঙ্গে। তার মুখে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। একলাগ সায়েরদাকে বলে গেল, তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি। দেখিগ, এক মাস ছ' মাস পরেই ও তোর নামে টাকা পাঠাবে মানি অর্ডারে।

আড়ংঘাটা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হবে, মাঝখানে সাত মাইল রাস্তা। ঝালের মাটি কেটে নতুন পথ তৈরি হয়েছে। আজকের সকালটি বেশ ছিমছাম। রোদ্দুরের তাপ নেই, বাতাস বইছে ফিনফিনে। ঝালের জলে আকাশের ছায়া দেখতে দেখতে হাজু হাঁটতে লাগল। একলাগ কথা বলতে ভালোবাসে, অনেক কথা সে অনগল বলে যাচ্ছে, তার অর্বেকই হাজুর

মাথায় ঢুকছে না। জলের মধ্যে আকাশকে যে এত হৃদয় দেখায় তা যেন সে আজই আবিষ্কার করল।

হুসমানপুরের কাছাকাছি এসে একলাস বলল, ওরে বাবা, ও কি! ও হাজু, ডানদিকে মাঠের মধ্যে চেয়ে দাঁড়া!

ঝাঙা হাতে নিয়ে একটি মিছিল আসছে ডান দিক থেকে। অন্তত শ-দেড়েক লোক হবে। কী যেন চিংকারও করছে তারা। এদিকে খালের এপাশেও একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরও হাতে ঝাঙা, লাঠি, খস্তা, কড়ুলও আছে।

একলাস বলল, আজ বৃষ্টি এখানে কাজিয়া লাগবে! ও হাজু, জোরে পা চালা। আমার আবার এর মধ্যে না পড়ে যাই।

হাজু তো জোরে হাঁটতে পারে না, সে অবাক চোখে মিছিলটা দেখে। মাঠ ছেড়ে এম্বাফমেন্টের ওপর উঠছে মিছিলটা, ঠিক যেন একটা মন্তবড়ো দাঁড়ানো সাপের মতন এঁকেবঁকে। কাছেই একটা বাশের সাঁকো, সেই সাঁকো দিয়ে খাল পার হয়ে ওরা ওদিকের মাঠে নামবে। তারপরই শুক হবে লড়াই।

হাজু এর আগে যখন হুসমানপুরে এসেছিল, তখন ঐ সাঁকোটা সে দেখে নি। ওটা এর মধ্যে কারা বানালো? এই লড়াইয়ের জন্তই বানিয়েছে?

একলাস হনহনিয়ে ধানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, হাজু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে তাকিয়ে আছে মিছিলটার দিকে। সব জিনিষই সে এরকম মনোযোগ দিয়ে দেখে।

ওদিকে মিছিল ও মাঠের লোকদের টাচামেচি তুড়ে উঠেছে।

একলাস ফিরে এসে হাজুর হাত ধরে টান মেরে থমকে বলল, হাঁ করে দেখতেছিস কি, বেগুড়ক? আবার মাথায় লাঠির বাড়ি খাবার শব্দ হয়েছে? চল!

প্রায় ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতেই তাকে টেনে চলল একলাস। ধামল একবারে হুসমানপুর ছাড়িয়ে রতন আগরওয়ারের কোন্ড স্টোরেরজর কাছে এসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বানিকঞ্চ দম ফিরিয়ে আনলো ছুঁজনে।

তারপর একলাস বলল, আজ যা ব্যাপার তাখলাম, অত্যক্ষণে পাঁচ-সাতটা লাশ পইড়ে গ্যাছে শুধানে।

হাজু যেন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মাটিতে চিং, উপুড়, 'কাং হয়ে পড়ে

আছে সাতজন মাহু। যে-জমিতে ধান হবার কথা, সেখানে চাপ চাপ রক্ত।

একলাস বলল, মাহু কেন মাহুকে মারে জিনিস?

সায়োদা বলে যে হাজু যখন চিন্তা করে তখন তার চোখের চাউনি একেবারে গাই-পোরর মতন হয়ে যায়। সেই রকমই চোপ এখন হাজুর। সে একলাসের প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠে বলল, আমি ও-সব বুঝি না একলাসভাই।

—কেন বুঝিস না? একটু ভালবেই বোঝা যায়।

—ভাবি তো। আমার ছোটোবেলায় বড়ো মোল্লা করেছিলেন যে আমার মাথার মধ্যে ধোবর পোড়া, তাই আমি কিছু বুঝি না!

—হেং! যতদূর! মাহু মাহুদের মারে নিজের বাঁচাবার জন্তে। তোর যে যদি কেউ মারতে আসে, তুই আগ বাড়িয়ে তারে মারবি। নইলে বাঁচতে পারবি না।

—আমি তো কাকুরে মারি না, তবু মাহুকে কেন আমারে মারে?

—তুই যে একটা বন্দা গোক হয়েছিলি। চল কলকাতায় তোর মাহুদন করে দেব।

কোন্ড স্টোরেরজর সামনের টিউবওয়েল থেকে পেটভরে পানি খেয়ে নিয়ে ওরা শরীর ঠাণ্ডা করে নেয়। তারপর আবার হাঁটতে থাকে।

কলকাতায় মৌলালির কাছে দরগা রোড়ে একলাসের ডেরা। একখানা দোতলা মাঠকোঠায় থাকে বাগো-চোন্দ জন। এটা ওদের মেস বাড়ির মতন। সকলেরই বৌ-বান্ধা আছে গ্রামে। এখানে ওরা নিজেরাই রান্নাবাড়ি করে খায়। সকালে উঠেই প্রত্যেকে চলে যায় যে-যার কাজে, ফেরে সেই সন্দের পর।

এত লোকের রান্নার মধ্যে একজন অতিরিক্ত মাহুদের খাওয়া দিতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু হাজুকে একটা কিছু করতে হবে তো? প্রথমে তাকে দেওয়া হলো রান্নার কাজ। হাজু ও-কাজের কিছু জানে না, শুধু যে ভাত পোড়ালো তাই নয়, নিজের হাতও পোড়ালো। উহনের আগুনের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, যেন ঐ আগুনও খুব একটা দেখবার জিনিষ!

তারপর তাকে দেওয়া হলো জামা-কাপড় কাচা আর বাসনপত্র মাজার

কাজ। সন্ধ্যাবেলা অজ্জ সবাই কাজ থেকে ফিরে এসে দেখলো: উঠোনে ডাঁই করা বাসনপত্র ও ভিজো জামাকাপড় ছড়িয়ে বসে আছে হাজু। কল থেকে পানি পড়ছে দরদর করে, সেই পানি ঝড়ে পড়ার দৃশ্য ও শব্দে সে যেন মস্তমুগ্ধ হয়ে আছে।

এ বাড়ির মুন্সি হলো সইফুল্লা। সে স্থল কাজেজ কোটে চাপারাসির কাজ করে, বেশ রাশভারী মানুষ। সারাদিন খেতে পিটে আসার পর এরকম দৃশ্য দেখে মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল, সে তেড়ে গিয়ে হাজুকে কান ঝাঁপাটি এক ঝাঁপড় ঘেরে বলল, শালা, শরতান্নের টেক!

পাশে দাঁড়িয়েছিল একলাস, সে গম্ভীর ভাবে বললে, ওরে আমি মানুষ করবার জন্ম এনিছ, ছ' চারটে চড়-চাপাটি তো দিতেই হবে।

তা হাজু একটু মাহুষ হলো বৈকি। সেই সন্ধ্যাবেলা তাকে সব বাসন মাজতে হলো। কাপড়ও কাচতে হলো। সর্বক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে রইল একলাস আর সইফুল্লা, সে হাত চালানো একটু বদ্ব করলেই ছুঁজনে তার পিঠে কোঁচকা দেয়।

হাজুর অস্বস্তি এজন্য কোনো ছুখ নেই। বড়ো ভালো লাগছে তার এ জায়গাটা। করেকদিনের মধ্যেই সে এখানকার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেল। এই মাঠকোঠার বাসিন্দা চোদ্দজন লোকই তাকে পালাক্রমে মাহুষ হবার জন্ম উপদেশ দেয়, কাজে ভুল করলে মারে। এর মধ্যে তিন-চার জন তো প্রায় তার ছেলের বয়েসী। তারাও হাজুর ঝাড়ে হাত দিয়ে ঠেলা মারে, তবু হাজুর বেশ লাগে।

ছপুরবেলা সারা বাড়ি শুনশান, রাস্তা দিয়ে কত রকম মাহুষ হেঁটে যায় কত বিচিত্র সব ফেরিওয়াল। বাড়ির সামনের রকে বসে হাজু একদৃষ্টে সেই-সব মাহুষ দেখে।

কাছেই একটা মসজিদ। সকাল-সন্ধ্যা সেখানে থেকে আজ্ঞানের সুর শোনা যায় মাইজোকোনে। হাজু আগে কখনো এরকম মাইজোকোনে আজান শোনে নি। এই সুর শোনা মাত্র তার রোমাঞ্চ হয়, যেন বেহেশত থেকে স্বয়ং খোদা মালিকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

হাজু একবার নামাজে বসলে আর উঠতেই চায় না। সে মাটির দিকে দৃষ্টিভাবে চেয়ে থাকে। ঐ ভাবেরই সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারে। নঈম আর কাদের তাকে দু'হাত ধরে টেনে তোলে।

একলাস তার বোনকে কথা দিয়ে এসেছিল যে হাজুর রোজগারের ব্যবস্থাও সে করে দেবে। এরকম ভাবে আর-পাঁচজনের দায় বসে খেলে তো তার জীবনের কোনো সুরাহা হবে না। কাছাকাছি এক নগ্নিতে বাড়িবাধার কাজ হয়। একলাস বলে কয়ে হাজুকে দেখানে ভিড়িয়ে দিল। কাজ খুব সোজা, দৌঁদোঁদোঁড়ি নেই, ভুজোঁড়ি নেই, গায়ে খাটনি নেই। ওপরওয়ালার হুকুম শোনারও বাপার নেই। একজায়গার পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপর মশলার ডালা নিয়ে বিড়ি বেঁধে বাবে। হাজার ছ' টাকা। কেউ কেউ দিনে দেড়-ছ হাজারও পেয়ে যায়। হাজু প্রথম প্রথম হাজারই ঝাঁপুক। অন্তত পাঁচশো।

প্রথম দিন হাজু বিড়ি ঝাঁপুক পাঁচটা। তারপরের দিন সাতটা। অল্প কারিগররা হাসাহাসি করে। ঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে তারা টেঁচিয়ে বলে, ও মিঞা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

হাজু কিন্তু ঘুমোয় না। বিড়ির মশলার দিকে চেয়ে থেকেই তার আর পলক পড়ে না। বিড়ির মশলার রূপ আর গন্ধেই সে মোহিত, সেইজন্মই তার হাত চলে না। অনেক ধাতানিতে ও দিনে দশটার বেশি উৎপাদন করতে পারল না হাজু। মালিক একলাসকে ভেঁকে বলল, এ লোককে রাখা অনস্বস্ত। শুণ্ড শুণ্ড একটা ডালা আটকে রাখে। দশটা বিড়ির মজুরিই তো হয় না।

সংগারে আর-পাঁচজন যে-সব কাজ জানে, হাজু তার কোনোটাই পারে না। হয়তো তার জন্ম অজ্ঞ ধরনের কোনো কাজ নির্দিষ্ট ছিল। সেটা সে কখনো খুঁজে পায় নি।

এরপর আরেকজন হয়তো সে-রকমই একটা কাজের সন্ধান এনে দিল। এই মাঠকোঠার মেসে মাঝে মাঝে বেশি রান্ধিরের দিকে এসে হাজির হয় ইমতিয়াজ। স্বন্দর নাহুসহুগ চেহারা, মুখে চাপা দাড়ি। ইমতিয়াজ খুব বড়ো একটা হোটেলের রাঁধুনির সহকারীর কাজ করে। সে সইফুল্লার এক গায়ের লোক। মাহুষটি বেশ আশুবে, সে এখানে আসে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সে এলে এখানেও বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। কারণ, ইমতিয়াজ বড়ো একটা ডেকচি ভর্তি করে আনে নানা রকম উপাদয়ে খাবার। বিরিয়ানি, মুগুঁর ঝোল, কিম্বা আর মটর হুঁটির ঝাল। এ-সব খাবার সে ছুরি করে আনে, না হোটেলের বাড়তি পরিত্যক্ত সে গ্রন্থ কেউ করে না।

হাজু এ-রকম ষাণ্ড কখনো যায় নি আগে। সে বড়ো উপভোগ করে এ-সব যায়। ইমতিয়াজও পছন্দ করে হাজুকে। অন্তরা যখন কোনো কারণে হাজুকে বকাঝকা দেয়, তখন ইমতিয়াজ বলে, আঁহা রে, এরকম ভালোমাহুই বা আজকাল কটা দেখা যায়? যে নিজের ভালোচুই পৰ্যন্ত বোঝে না, সে ছনিয়ার কারুর বাড়ী ভাতে ছাই দেয় না।

সইফুল্লা বলল, দুপুরে এ বাড়িতে যদি চোর পড়ে, আমাদের হাজু কিচ্ছু কবে না। শুধু ভাবভেড়িয়ে ছাখবে। চোরগুলোইনে ও ভালোবাসবে।

ইমতিয়াজ হা-হা করে হেসে বলে, যা দিনকাল পড়েছে ছুলাডাই, কে যে চোর আর কে চোর না, তা বাছা বড়ো শক্ত। যাই হোক, হাজুকে আমি আমার হোটেলের একটা কাজ দিতে পারি।

বাকি সবাই আঁতকে উঠল। কত বড়ো হোটেলের কাজ করে ইমতিয়াজ, সেখানে সাহেব-মেমরা থাকে। দিল্ল-বোয়াই থেকে বড়ো মাহুইরা এসে থাকে। পেয়াজ একখানা দালান। দূর থেকে দেখলেই তাঁক লেগে যায়। একবার কী একটা বিপদে পড়ে কাদের গিয়েছিল ইমতিয়াজের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে, হোটেলের দারোয়ান তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। ডিউটির সময় রহুইঘর থেকে কেউ বেহুতেও পারবে না, বাইরের কোনো লোক সেখানে ঢুকতেও পারবে না। -

হোটেলের কাজে সব সময়ই হুঁদ শাকা উপরি রোজগারের সুযোগ থাকে বলে এখানকার অনেকেই এ হোটেলের চাকরির জন্ত আজি জানিয়ে রেখেছে। ইমতিয়াজ এতদিন সুবিধে করতে পারে নি। আজ কিনা সে হাজুকে চাকরি দিতে চায়?

সকলে একসঙ্গে নানা কথা বলতে যাচ্ছিল, তাদের হাত তুলে ধামিয়ে দিয়ে প্রকৃত মুকরির মতন গম্ভীরভাবে সইফুল্লা বলল, এ-সব কোনো কাজের কথা নয়। শেষে তোর নিজেরই কোনো বিপদ হবে। এই পাখাটা হোটেলের জিনিসপত্তর কোনটা ভাঙবে, কোনটা হারাবে কোনটা নষ্ট করবে, পানির সাথে প্যাছাব মিশায় দেবে, তখন তোর চাকরি নিয়ে টানাটানি হোক আর কি! যে বিড়ি বাঁধার কাজটাও পারে না, সে আর কোন কাজটা পারবে? তারচে ও খোদার খাশিটা এখানে যেমন বসে বসে থাকে, তেমনই থাক। আগার জীব, গুরে ফেলতে তো দিতে পারি না।

ইমতিয়াজ এ-সব শুনেও নিবৃত্ত হলো না। সে বললো, সে-রকম ভয়

কিছু নাই। ও যে কাজ করবে, তাতে ভাঙাভাঙির কিছু নাই। কাজ খুব সহজ।

কাদের বলল, তা হলে সে কাজটা আমাদের দিলেন না কেন? আমাদের কারখানা লক আউট হবে শুনছি—

ইমতিয়াজ বলল, সে কাজ তুই পারবি না। সবাই কি সব কাজ পারে? আমি যে-কাজের কথা বলছি, তা শুধু এই হাজুই পারবে। কাজ হলো শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সেলাম দেওয়া।

কাদের আর নদ্রম একসঙ্গে বলে উঠল, ও ভুলে যাবে। ও সেলাম দিতেও ভুলে যাবে!

ইমতিয়াজ বললো, তা ছ'চরবার ভুলে গেলেও ক্ষেতি নেই। কেউ অত লক্ষ্য করে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেই হলো।

একলাস জিঞ্জেস করল, কী রে হাজু, তুই হোটেলের কাজ করতে যাবি?

হাজু সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। সে যে তখনই স্বগন্ধ পেল ভালো ভালো রান্নার। কোণ্ডা, কাবাব, কালিয়া, আরো হরেক রকম সব পদ।

ইমতিয়াজই গরজ করে এটালি বাজার থেকে দুটি পাংলুন আর দুখানা কুঁতা কিনে দিল হাজুকে। তারপর নিয়ে গেল হোটেলের।

কয়েকদিনের মধ্যেই সে কাজ দক্ষণ পছন্দ হয়ে গেল হাজুর। বড়ো স্বন্দর চাকরি। দৌড়োদৌড়ি নেই, গায়ে খাটা নেই, ওপরওয়ালার বকাঝকা নেই। বিড়ি বাঁধার চেয়ে অনেক সহজ।

হোটেল ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের একতলায় বগমণে সাদা রঙের পুরুষ পেছাপাখানার মধ্যে সে দেয়াল ঘেঁষে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবুরা দরজা ঠেলে ঢুকলে সে একটা সেলাম তোকে। অবশ্য সে সেলাম দিল কি না দিল তা কোনো বাবু দেখেই না। সে বাবুদের পেছাপের ছড়ছড় শব্দ শোনে। বিভিন্ন বাবুর পেছাপের বিভিন্ন রকম শব্দ। গন্ধও আলাদা। তারপর বাবুরা যদি বেগিনে এসে হাত ধোয়, তা হলে সে সাবান ভোয়ালে এগিয়ে দেবে। অনেক বাবুই ও-সব নেয় না। এমন-কি পেছাপ করার পর হাতে পানি পর্যন্ত না ছুঁয়ে ছড়ছড় করে বেরিয়ে যায়।

এটা গোলপাখানা নয়, শুধু পেছাপাখানা। পেছাপের মতন একটা সামান্য ব্যাপারের জন্ত যে মাহুই এত স্বন্দর ঘর বানাতে পারে, তা কি এমন-কি

সবজাত্যাই সইফুল্ল পৰ্যন্ত জানে? দেয়াল থেকে যেন চোখ পিছলে যায়। আর কত বড়ো আয়না। যখন আর কিছু দেখার থাকে না, তখন হাঙ্কু সেই আয়নার নিজেকে দেখে।

হুপুর একটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত ভিটটি। মাথাখনে ছ'বার তার আখবটার জন্ত ছুটি। বাকি সময় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাতে কোনো কষ্ট নেই হাঙ্কুর, কোনো বিকার নেই। এতদিনে সে এমন একটা জায়গায় আশ্রয় পেয়েছে, যেখানে সারাদিনে তাকে বকবার কেউ নেই।

বাবুরা কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। অনেকে তাকে দেখতেই পায় না। আবার কেউ কেউ বাবার সময় তাকে খুচরো হুড়ি-পঁচিশ পরশা দিয়ে যায় এমনি এমনি।

দিনের বেলা তেমন ভিড় থাকে না। সন্দের পর থেকে বাবুরা আসতে শুরু করে। একতলায় ছ'খানা বার রুম, যত রাত বাড়তে যতই সেখানে রঙ-তামাসা বেশি জমে, আর ততই হাঙ্কুর সাদা ঘরখানায় ঘন ঘন দরজা খোলে।

সরাবী যে আগে ছ'চারজন দেখে নি হাঙ্কু, তা নয়। তাদের গাজীপুরের হাটে তাড়ি বিক্রি হয়। সে কোনোদিন যায় নি বটে তবে চেনাশুনো লোকদের সেই তাড়ি খেয়ে হজ্ব করতে দেখেছে। কিন্তু এখানকার সরাবীরা একেবারে অন্য কিসিযের। হজ্ব নেই, রংগড়া মারামারি নেই। হ্যাঁ, অনেক বাবুর সে পা টলতে দেখেছে বটে, অনেকে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলে, কেউ কেউ হিসির পর আর প্যাটুলের বোতামের জায়গা বন্ধ করতে পারে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দোলে। ছ'একজন বমি করে। ছ'একজন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানাই যেন চিনতে পারে না।

হাঙ্কু দেয়াল ঘেঁষে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে সব দেখে। কোনো বাবু বমি করলেও সে সাহায্যের জন্ত এগিয়ে যায় না। ইমতিয়াজ তাকে পই পই করে বলে দিয়েছে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে হাঙ্কু কোনো কথা বলেবে না, কেউ না ডাকলে সে কাছে যাবে না।

হুপুরবেলা থাকে শুধু ছাপখালিনের গন্ধ, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধটা বদলায়।

একদিন রাত প্রায় পৌনে দশটার সময় ছ'জন ছোকরা বাবু ঢুকল'সেই বাথরুমে। চোখ লাল, মাথার চুল উঁকোখুঁকো, বেশ টলটলে অবস্থা।

হাঙ্কু এর মধ্যেই অনেক নিয়মিত বাবুর মুখ চিনে গেছে। এই ছ'জনকে

সে প্রথম দেখল। নতুন মুখ দেখলেই সে আরো গভীর মনোযোগ দিয়ে সৈদিক দেখে, তার কথাবার্তা শোনে, অবশ্য বাবুদের বেশির ভাগ কথাবার্তাই সে বুঝতে পারে না।

ছোকরা বাবু ছ'জন কবি। এতবড়ো হোটলে কবিদের যাতায়াত বিশেষ নেই, তবে কখনো কখনো কোনো ধনী ভক্ত তাদের নিয়ে আসে এখানে।

এক কবি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে খুব কাতর গলায় বলল, এটা আমি সহ করতে পারি না! যতবার দেখি, রাগে আমার গা জ্বলে যায়।

অন্য কবি দেয়ালকে জিজ্ঞেস করল, কোন্টা? ঐ মেয়েটার সঙ্গে বেঁটে লোকটা তো? বকবক করে কানের পোকা খসিয়ে দিচ্ছে। এরপর আমি ওকে মারব!

প্রথম কবি বলল, তানয়। ঐ যে পেছাপাখানার আর্টগেট! কোনো মানে হয়, পেছাপাখানার মধ্যে সারাক্ষণ একটা লোককে দাঁড় করিয়ে রাখা।

—ব্রিটিশ লিগেসি! ইংরেজদের কায়দায় কুৎসিততম অহুকরণ!

—খোদ ইংল্যান্ডে এখানে এ-রকম আছে?

—কলোনিগুলোতে পিছেই তো ওরা এইসব নোংরামি করত!

—এ দেশটা এখনো মারোয়াড়ীদের কলোনি!

ছই কবি বেসিনে এলো হাত ধুতে। একজন চোখেমুখে জল ছোটাতো লাগল। অতজন একদৃষ্টে আয়নার দেখতে লাগল নিজেকে।

সাবান আর ভোগালে হাতে পাথরের মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হাঙ্কু।

একজন কবি হঠাৎ তার দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো, ঘর কাঁহা? মুরক কাঁহা যায়?

খুঁটোয় বাধা গোন্ধর মতন চোখ করে দাঁড়িয়ে রইল হাঙ্কু। অতক্তিত প্রশ্নের সে উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না।

মাতালের একরকম জেদ থাকে। যেন এই লোকটার দেশ কোথায় তা না জানতে পারলে পরবর্তী পেগটি বিভাদ হয়ে যাবে। তাই সেই কবিট হাঙ্কুর গুতনি ধরে আবার কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, উত্তর দিচ্ছ না কেন? বাকি কোথায় তোমার?

হাঙ্কু ঈষৎ কেঁপে গিয়ে বলল, গাজীপুর সাহেব?

—কোন জেলায়?

—মেদিনীপুর।

—নাম কী?

—হাঙ্গু।

—হাঙ্গু? হাঙ্গু আবার নাম হয় নাকি? তোমার মা তোমায় কী নাম-
ধরে ডাকে তা জানতে চাইছি। ভালো নাম কী?

জন্মের পর থেকে সবাই তাকে হাঙ্গু বলেই ডাকছে। তবে তার আর
একটা নাম আছে বটে, কিন্তু বহুদিন তার ব্যবহার নেই।

সে বলল, শাজান্, সাহেব!

কবিতা বিরক্তভাবে বলল, পিকিউলিয়ার মান! উইথ আ পিকিউলিয়ার
নেই! শাজান্ কারো নাম শুনেছিল আগে? হিন্দু না মুসলমান?

হাঙ্গু আর-একবার কৈপে উঠে মিনমিনে গলায় বললো, আমরা মোছলমান।

দ্বিতীয় কবিতা এবারে অটহাশ্ব করে উঠল, তারপর বলল, বুঝলি না?
শাজাহান! তা বাবা, সম্রাট শাজাহান, তোমায় এই পেছাপথানায় কে বন্দী
করে রাখল? আগ্রা ফোর্ট কী হলো?

প্রথম কবিতা তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, চল চল। ডিসগাষ্টিং!
আমরা এ-সব সিস্টেম এখনো মেনে নিচ্ছি, ম্যানেজারকে গিয়ে এখনো লাথি
মারতে পারছি না—

—পাঁচ পেগ খাবার পর এ-সব কথা ভোর মনে পড়ে। কাল সকালে
আবার ফুস! ম্যানেজারকে লাথি মারলে কী হবে, আমাদেরই আর ঢুকতে
দেবে না এখানে!

—তবু একদিন ম্যানেজারের পেছনে লাথি মারব ঠিক!

দরজার কাছে গিয়ে দ্বিতীয় কবিতা ঈষৎ টলে গিয়ে জড়ানো গলায় বলল,
বন্দগী, সম্রাট। একসময় তুমি সারে হিন্দুস্তানকা মালেক থা, এখন থাকো
এই পেছাপথানায় বন্দী হয়ে। গুড নাইট!

ছই বাবুর এইসব কথায় একটুও রেখাপাত হলো না হাঙ্গুর মনে। প্রায়
কিছুই সে বোঝে নি। এ-সব সন্ন্যাসী বাবুদের খেলার কথা। বাবুরা যে
তাকে মারধোর করে নি, মাথা ফাটিয়ে দেয়নি, এই যথেষ্ট!

কিন্তু এর ষ্টের মিটল না। একটু পরেই আর-একজন বাঙালীবাবু ঢুকল।
একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্যাক্টের সামনেটা খুলতে খুলতে পাশ ফিরে জিজ্ঞেস
করলো, ঠাঁ বাবা, তোমার নাম নাকি শাজাহান? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

বার কয়ে কবিরয় নাকি এই নাম নিয়ে খুব দাপাদাপি করেছে। শেষ
পর্যন্ত তারা এমনই বেসামাল হয়ে যায় যে তাদের বার করে দেয়। কিন্তু সেই
থেকে অনেকেই এই পেছাপথানার অকিঞ্চিৎকর মাহুঘটির নাম জেনে গেছে।
এরপর থেকে কোনো কোনো বাবু তার নাম ধরে ডেকে বলে, এই শাজাহান,
তোয়ালে দে।

তার নামের এই পদোন্নতিতে হাঙ্গুর অবস্থা কোনো পরিবর্তন হয় না।
অনেক সময় বাবুরা ঐ নামে ডাকলে সে ঠিক বুঝতেও পারে না। বাবুদের
উচ্চারণ অল্প রকম। তাছাড়া কয়েকপাছ পেটে পড়লে বাবুদের জিভও বদলে
যায়।

হাঙ্গুর অবস্থা সবচেয়ে ভালো লাগে দুপুরের দিকটা। শনি-রবি ছাড়া
অন্তদিন দুপুর তিনটে থেকে ছটার মধ্যে একজন ছুঁজন বাবুও আসে কি না
সন্দেহ। ইচ্ছে করলে সে এই সময় একটু বাইরে যেতেও পারে। কিন্তু
হাঙ্গু যায় না। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চকচকে দেয়াল দেখে। তার কাছে
এমন সুন্দর দৃশ্য আর নেই।

একদিন দুপুরে সে দেখলো, সেই দেয়াল দিয়ে নেমে আসছে পিঁপড়ের
সারি। অনেকখানি লম্বা। সব লাল পিঁপড়ে, তারা অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ, কেউ
লাইন ভাঙে না। কেন পিঁপড়েগুলো বাথরুমের দেয়াল দিয়ে আসছে,
কোথায় তারা যেতে চায়, তা হাঙ্গু বোঝাবারও চেষ্টা করল না। দেওয়ানের
সাদা টালির ওপর সেই লাল পিঁপড়ের রেখার বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে, হাঙ্গু মুগ্ধ
হয়ে চেয়ে রইল সেদিকে।

হঠাৎ হাঙ্গুর মনে পড়ল একলাসের সঙ্গে আসবার সময় স্থলমানপুরের
কাছে সেই মিছিলটার কথা। খাল ধার দিয়ে এসে সাঁকো পার হচ্ছিল।
সেই মিছিলটাও এরকমই দেখতে ছিল না?

কল থেকে খানিকটা পানি নিয়ে হাঙ্গু দেয়ালে একটু রেখা আঁকলো।
এই হলো সেই খালটা। আর এই হলো সাঁকো। এত পিচ্ছিল দেয়ালে
পানি ধরে না। তাই হাঙ্গু মোটা করে দাগ দিতে লাগল।

পিঁপড়ের সারি এসে যেম্নে গেল সেই জলের রেখার কাছে। সামনের
দিকে কয়েকটি পিঁপড়ে দাঁড়িয়ে গেল ছুঁপাশে, একটা ছুটো আবার দৌড়ে
ফিরে যেতে লাগল পেছন দিকে। যেন কোনো পরামর্শ করতে যাচ্ছে।

হাঙ্গু দাক্ষণ অবাক। পিঁপড়ের মিছিল সাঁকোর ওপর দিয়ে খাল পার

হবে না? বাঃ বেশ মজা তো! সে ফিসফিস করে বলল, গেই ভালো বাপজানোয়া, কী দরকার ওদিক পানে যাবার? শুধু শুধু দাঙ্গা-কাজিয়া করে কী লাভ? এদিকেও তো কত জায়গা রয়েছে।

আর-একটু মোটা করে জলের দাগ দিতেই পিঁপড়ের মিছিলটি পাশ ফিরলো। তারা ধরল অন্ধ পথ। হাঙ্গু জীবনে যেন এত আনন্দ পায় নি। এরা তার কথা শুনে। এরা তাকে মানে।

দেয়ালে নানা রকম জলের রেখা টানতে টানতে সে বলতে লাগলো, এই দিকে! এই দিকে—

ঈং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্ষা।

বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়।।

ম.স্ম.হিতং দেবী সমস্তমন্তঃ

ঈং বৈ প্রসন্ন। ভূবি মুক্তিহেতু ॥

যে ঋষি দিব্যজ্ঞানে দেবীর পরমাশক্তি কল্পনা করেছিলেন অমৃত তিনিই দেবী আরাধনায় মানব আত্মার পরম আকৃতি নিবেদন করে বলেছিলেন, আমাকে অনন্ত রূপ দান করো। অনন্ত জয়, অনন্ত মশ, পূর্ব করো আমাকে যার মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতির বীজ নিহিত তিনিই দান করবেন মুক্তির অভয়গাথী।

দেবী পূজার মধ্য দিয়েই যুগে যুগে এই পূর্ণতাকে আবাহন করেছে ভারতবর্ষ।

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতাঃ ব্যাঙ্গালোর

With Compliments from

SEN & PANDIT LTD.

ELECTRONICS DIVISION

16B, Lake View Road.

Phone : 42-4026.

Gm : SENELDIV

THE LEADER IN VOLTAGE STABILISERS

With Best Compliments

HINDUSTHAN BUILDING SOCIETY LTD

HINDUSTHAN BUILDINGS

4, Chittaranjan Avenue

Calcutta-700072

১৯৫৫-৫৬ : ১৯৫৬-৫৭

Phone : 27-9719/27-6329/27-7601

শরৎ সঙ্কায় আপনাকে
উজ্জ্বলতর করে তুলুন
এন, টি. সি-র মনমাতানো
শাড়ীতে।
ক্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা)

৭, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৩

সম্প্রতি প্রকাশিত

চৈতন্য ভাগবত :	রুদ্রানন্দ দাস-বিরচিত	
	শ্রীস্বকুমার সেন সম্পাদিত	৪০.০০
জয়দেব :	স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত	
	শ্রীস্ববোধকুমার চৌধুরী-অনুদিত	৪০.০০
ভগবান বুদ্ধ :	ধর্মানন্দ কোসাম্বী রচিত	
	শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য-অনুদিত	১৫.০০
বাংলার সাহিত্য ইতিহাস :	শ্রীস্বকুমার সেন	১৫.০০

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র স্টেডিয়াম

ফোন : ৪৬-১৩২০

কলিকাতা-২২

পুরস্কার

সোমপ্রকাশ ও সেকালের বাঙালী সমাজ

পদ্মা পাল

॥ ১ ॥ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা এবং তার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ সম্পর্কে একালের সংবাদ-সাময়িক পত্রের পাঠকসম্প্রদায়ের অল্পসংখ্যক তেমন কিছু প্রবল নয়। প্রকৃতপক্ষে, নাম-ছটি আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত বললেই চলে। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশে, দ্বারকানাথের সোমপ্রকাশ নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূচনা করেছিল। সোমপ্রকাশ, দ্বারকানাথের নাম বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী করে রেখেছে। অন্ধের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্র' প্রথম খণ্ডে, দ্বারকানাথ প্রসঙ্গে, একজায়গার মন্তব্য করেছেন—“সোমপ্রকাশ দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি। তিনি বাংলা সংবাদ-পত্রকে নির্ভরযোগ্য রাজনীতির ও সমাজ-সংস্কার-নীতির বাহন করিয়া বাংলাদেশের জনসাধারণের চেতনা ঐ সকল বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য স্বত্ত্বেও তাঁহার ভাষার প্রাজ্ঞতা ও ওজস্বিতার জগ্গই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অগ্রতম প্রধান ধর্ম—স্বংসিত দলাদলি ও পরস্পর কর্দম নিক্ষেপকে বিষবৎ বর্জন করিয়াছিলেন।” ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’তেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সম্পর্কে বলছেন—“তত দিন পর্যন্ত (ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত) বাংলা সংবাদপত্রে নিষ্ঠা, শুচিতা ও প্রাজ্ঞতার অভাব ছিল। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণের ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও সাধনায় মূলতঃ এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।”

স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন বিদ্যাবূষণের ভাগিনেয়। তাঁর ‘রায়তন্ত্র লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে মাতুলের সম্পাদিত পত্রিকার কথা বলতে গিয়ে, শাস্ত্রীমহাশয়ের সেই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ও অনগ্রস্বের কথা

এইভাবে স্বরণ করেছেন—“প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বহুসমাজের নৈতিক বাহুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিস্কৃত হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিস্কৃতি ও লালিত্য, তেমনই মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনই নীতির উৎকর্ষ।”

এতগুলি মন্তব্যকে পাশাপাশি রাখার কারণ একটাই। তা হল, দ্বারকানাথ সম্পর্কে আমাদের অপরিস্রব এবং তজ্জনিত দূরত্ব। এই মন্তব্যগুলির আলোকে, দ্বারকানাথ এবং সোমপ্রকাশ প্রসঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় এগোনো যেতে পারে।

২২। ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত এবং নাগরিক বাঙালীর চিন্তাজগতে যে নবজাগরণ তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রথম দুগু প্রকাশ ঘটেছিল রাজা রামমোহনের কর্মধারায়। এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জীবনে যুগপ্রাচীন জড়ত্বশাপ মোচনের আয়োজন কার্যকরী হতে শুরু করে। রামমোহন ব্যবহারিক জীবনে বাস্তব প্রয়োজন ও যুক্তিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন। স্বদেশের মানুষকে আত্মবিশ্বাস জ্ঞানালেন অল্প প্রথাধর্মগতের গণ্ডী ও সমাজশাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে, জীবনের উন্মুক্ত ও প্রসারিত ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে। জীর্ণ শাস্ত্রবিধি ও সংস্কারের অন্ধতার বিরুদ্ধে এভাবেই প্রথম স্তরের ব্যক্তিত্বের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

রামমোহনে যার সূচনা, সেই জাগরণের পূর্ণতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে। বর্ষকায়, দরিদ্র এই ব্রাহ্মণ সম্ভ্রমের মধ্যে যেন সে যুগের সকল সাধনা ও বেদনা রূপ নিয়েছিল। মানবচরিত্রের অন্তর্দর্শন স্তম্ভ মছাভূতবাধকে আগ্রত করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর সমগ্রজীবনবাণী যে বিরাট কর্মযজ্ঞ—তারও মূল প্রেরণা ছিল ঐ মানবতাবোধের উন্মেষ। বিদ্যাসাগর এবং দ্বারকানাথ—পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। তাঁদের উভয়েরই কর্মক্ষেত্র ছিল সংস্কৃত কলেজ। প্রধানত বিদ্যাসাগরের প্রযত্নেই দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। “সহায্যার্থী ছাত্রগণের গুণ্যস্বার্থের পদমর্যাদা ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া দেওয়া তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি চেষ্টা ও যত্ন-পরাক্রম হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিহার্য্য, শ্রীমুখ্যারাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাসূর্য্য প্রভৃতি অনেকেরই কণ্ঠ-কাজের সহধি

করিয়া দিয়াছিলেন” (‘বিদ্যাসাগর’: চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অবশ্য দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে এই পদের যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। তাঁর নিজস্ব জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা সব-কিছুই ছিল সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করার পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি। তা না হলে স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁর জন্ত চেষ্টা করতেন না।

১৮৪৫ সালে দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান থেকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। পরের বছরই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, বিদ্যাসাগরই নাকি দ্বারকানাথের কাছে সোমপ্রকাশ প্রকাশনার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন। সারদাপ্রসাদ নামে, তাঁদের প্রিয় জৈনক বধির পণ্ডিতকে কাজ জোগাড় করে দেওয়া ছিল তাঁর অত্যন্ত উদ্দেশ্য।

১৮৫৮তে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হল। দ্বারকানাথ ছিলেন সম্পাদক। যশ-মুদ্রাস্থানের ব্যয়ভারও তিনি গ্রহণ করেন। লেখকদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথের পণ্ডিত বন্ধুগণী এবং বিদ্যাসাগর নিজে। কাজ এগোতে শুরু করলে কিন্তু সারদাপ্রসাদ আর এলেন না। অপরূপ লেখকেরাও তেমন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। সোমপ্রকাশের ভার সম্পূর্ণভাবেই দ্বারকানাথের উপর জড় হয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা বাদে, বৎসামাত্র অবসরের সবটুকুই ব্যয়িত হতে লাগল সোমপ্রকাশের জন্ত। সোমপ্রকাশের প্রত্যেক সংখ্যায় নিয়লিখিত শ্লোকটি যুক্তিত হত : প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ স্বরস্বতী শ্রুতিমহতী ন ইয়ীত্যং।” অন্নদিনের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছে এ পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই দ্বারকানাথ সম্পাদনা-কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ সনের ২ জানুয়ারি থেকে দ্বারকানাথ কিছুদিনের জন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব তাগ করেন। তখন পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। ১৮৭৪ সালে স্বাস্থ্যজনিত কারণে দ্বারকানাথ সম্পাদকের কার্যভার তাগ করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত কাশী যাত্রা করেন। এই সময় শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস সোমপ্রকাশ সম্পাদনার ভার নেন। ১৮৭৮-এর মার্চে বহুবিকৃত ‘ভারনাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট’ জারি হয় এবং তার ঠিক একবছর পরেই ‘লাহোরস্থ সংবাদ-দাতা’র একটি পত্র প্রকাশের জন্ত সোমপ্রকাশ রাজরোয়ে পড়ে। গভর্নমেন্ট একহাজার টাকা জামানত ও মুচলেকা দাবি করেন। এই

আইনের প্রতিবাদে ধারকনাথ পত্রিকা বন্ধ করে দেন। তদানীন্তন ছোটোলট জার রিচার্ড টেম্পল ধারকনাথকে রাজভবনে ডেকে পাঠিয়ে, পত্রিকা চালু রাখার জরুজ্ঞ বিশেষ অহরোধ করেন। পরে অবশু 'ভারনাকিউলার প্রেস আক্ট' উঠে যাবার পর, আবার সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হতে থাকে। তা হলেও, সোমপ্রকাশের প্রণয়ন তখন ক্রমশ অস্বাভাবিক হতে থাকে। পরে ধারকনাথ কিছুদিন 'কল্লজম' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। প্রায় বছরখানেক বন্ধ থাকার পর ১৮৮২-এর এপ্রিল থেকে আবার সোমপ্রকাশ নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৬ সালের ২০ আগস্ট ধারকনাথ বিত্যাভূষণ লোকান্তরিত হন। তার মৃত্যুর পরেও অবশু কিছুদিন সোমপ্রকাশ বেরিয়েছিল।

৩৩ ১৮৫০-এর কিছুদিন আগে পরে প্রকাশিত, সোমপ্রকাশের অগ্রজ সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সংবাদপ্রভাকর' (সম্পাদনা: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) এবং 'তত্ত্ববোধিনী' (সম্পাদনা: অক্ষয়কুমার দত্ত)। শেষোক্ত পত্রিকার সম্পাদনা-কার্যে অক্ষয়কুমারকে সক্রিয় সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী নিম্নলিখিত বহুদায় পঠক সম্প্রদায়কে জানপদ ও উচ্চমার্গীয় আলোচনার প্রবৃত্ত করেছিল। স্বসংগঠিত পঞ্চাচচার সঙ্ঘে সঙ্ঘে শিক্ষিত পঠক-মানসের রুচির প্রসার—এই দুই আদর্শের রূপায়ণেই তত্ত্ববোধিনীর চেষ্টা নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ঠিক ঠিক সংবাদপত্র বলতে যা বৃষ্টি, তত্ত্ববোধিনী তা কখনোই ছিল না। এ পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য সবসময়ই ছিল ধর্মতত্ত্বের আলোচনা এবং বিশেষ করে মফঃগল বাংলার 'ব্রহ্মনিষ্ঠ সামাজিক'দের সঙ্ঘে মানস সংযোগ রচনা করা। অপরদিকে দৈনন্দিন সংবাদ পরিবেশনার দায়িত্ব প্রধানত রূপে ছিল প্রভাকরের উপর। তার সঙ্ঘে পাশাপাশি এই দায়িত্ব নিয়েছিল সংবাদ ভাষ্যর, বহুদৃত, রসরাজ, জ্ঞানদর্পণ ইত্যাদি পত্রিকাসমূহ।

কিন্তু এই সব পত্র-পত্রিকাগুলির সাধারণ প্রবণতা ছিল দ্বুণ্য রুচিবিকারকে প্রশ্রয় দেবার দিকে। তার ফলে, অচিরেই এই সব পত্র-পত্রিকা স্থায়ী পঠকের সমর্থন হারাতে বসল। অধিকাংশ সংবাদপত্রেই পরস্পরের প্রতি কর্দর্ষ কাদা ছোড়াছুড়ি এবং দোষারোপের ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত এবং স্বাভাবিক ছিল। "প্রভাকর ও ভাষ্যের একপ অদ্ভুত কটুচি চলিত যে তাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়" (রামতত্ত্ব লাহিড়ী ও তৎকালীন বহুসমাজ)।

শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী বাঙালী সম্প্রদায়ের পক্ষে এই কটিবিকার দীর্ঘকাল সহ করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজি ভাষায় সংবাদপত্রও প্রকাশ করেছিলেন। *Hindoo Patriot* (হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), *Bengal Spectator* (রামমোহন ঘোষ) ইত্যাদি পত্রিকাও একালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

পরিশীলিত রুচির পাঠকের "ছি ছি রব" নিবারণের উদ্দেশ্যে ১৮৫০ থেকে '৫৮-র মধ্যে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট জ্ঞেয়ীয় বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিসার্ধ-সংগ্রহ' এবং তার পরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত 'রহস্যসন্দর্ভের' নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি সংবাদপত্র নয়। গল্পের ভাষায় 'মহাযুগা জ্ঞাতব্য তথ্যবিষয়াদির বর্ণনা' করে, এ-সব পত্রিকায় সমকালের পাঠকগুটিকে তৃপ্ত করার আয়োজন করা হয়েছিল। সোমপ্রকাশের আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বেই প্রকাশিত হয় পারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদারের সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'। অবশু এ পত্রিকার ভাষা ছিল আলালী ভাষার।

সোমপ্রকাশের আগে বাংলা সাময়িকপত্রে সামাজিক জীবনের ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ হত না বললেই হয়। যদিও সাহিত্যিকর্মে, বিশেষ করে নাটকে, বাঙালীর গুরুতর সামাজিক সমস্যাগুলি অন্তর্নিহিত উপস্থিত ছিল ('কুলীন কুলসর্ব' : রামনারায়ণ তর্করত্ন; 'বিধবাবিবাহ' : উমেশচন্দ্র মিত্র ইত্যাদি)। অবশু এর কারণ হিসাবে, আলোচনা ও সমালোচনার উপযোগী সামাজিক তথ্য রাজনৈতিক চেতনার অপ্রভুলতাকে নির্দেশ করা যেতে পারে। সোমপ্রকাশের প্রকাশনার অব্যবহিত পূর্বের কতকগুলি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ, এখানে একান্ত প্রয়োজন। এই ঘটনাগুলি বাংলাদেশ ও বাঙালীর জাতীয় জীবনেতিহাসে অনেকগুলি গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম ঘটনার কাল ১৮৫৭। এই বছর সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনা মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ। মহারানীর শাসনাধীন বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের ধারা বহুপথ ধরে চলতে শুরু করল। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে এসে দাঁড়ালেন বিদ্যাসাগর। সিপাহী বিদ্রোহের আগেই ১৮৫৬-তে বিদ্যাসাগরের একক প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ

আইনসিদ্ধ হয়। হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ আইনসম্মত হওয়ার ফলে বাংলার সমাজজীবনে বিমিশ্র ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হয়। এই ঘটনা ছাড়াও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু মরগীয় দৃষ্টান্ত রচিত হয়। বিজ্ঞাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াসে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও দেশবচস্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের নবরূপায়ণ ঘটে। সোমপ্রকাশ যে বছর প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সেই ১৮৫৮-তেই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও বহুবিধ পরিবর্তন হচ্ছিল হতে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রভাব সমাজের সর্বস্তরেই বিচিত্রমুখী হয়ে দেখা দিতে চাইল। বুদ্ধিজীবী বাঙালী মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এঁদের মাধ্যমে সমাজে নতুন একধরনের রাজনৈতিক কর্মজীবনের সূত্রপাত হল। সামাজিক জীবনের বহু মুণ্ডপ্রচলিত এবং প্রাচীন মূল্যবোধ বিনশিত ও ভাঙনের মুখোমুখি এসে পড়াল (অবশ্য এই ভাঙন শতাব্দীর প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল।) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিচিত্রমুখী পরিবর্তনের তেউ এসে আছড়ে পড়তে থাকে। এই সব পরিবর্তনের খবরাখবর সেকালের সাময়িক পত্রাদিতে অবশ্যই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সেই সব পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সোমপ্রকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শ্রীমুক্ত বিনয় ঘোষের মতে—“অন্ততঃ উনিশ শতকের যষ্ঠ ও সপ্তম দশকে তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন পত্রিকা ছিল বলে মনে হয় না।” (ভূমিকা : ‘সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র’, ৬র্থ খণ্ড।)

৪৪। সোমপ্রকাশ উদারপন্থী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখপত্র ছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। সমাজের নানাবিধ সমস্যা—‘অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, স্বাধীনতা, প্রত্যেকটি বিষয়ে সোমপ্রকাশের আলোচনার ধারা, নীতি এবং ভাষাব্যবহার পূর্ববর্তী সাময়িক পত্রিকাগুলি থেকে বিশেষ রূপে স্বতন্ত্র ছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতামতের ক্ষেত্রে এ পত্রিকা ছিল উদারনৈতিক। শিবনাথ শাস্ত্রীর দেখায় পাই—“চিন্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদন-বিষয়ে অক্ষয়বাবু চিন্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন-বিষয়ে বিজ্ঞানচন্দ্র মহাশয়ের চিন্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি। তাঁহার অল্পরূপ সমগ্র জগদমনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে বাহা লিখিতেন তাহার একপংক্তি কাহারও তুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অরূপ করিয়া কিছু লিখিতেন না” (‘রামতল্লাহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’।)

“মতের উদারতা এবং বুদ্ধিমূর্ততা”ই ছিল সোমপ্রকাশের জনপ্রিয়তার অত্যন্ত প্রধান কারণ। দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। উনিবিংশ শতকের পঞ্চম দশক থেকে শুরু করে প্রায় আটের দশক পর্যন্ত, জাতীয় জীবনের বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, এই পত্রিকা জন্মতর গঠনের স্বকঠোর কর্তব্য পালন করে যায়। এই সময়ের মধ্যে যে-সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সোমপ্রকাশ তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও ঔপার্ণগুণে সেই সেই পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে। মনে রাখতে হবে, এই সময়ে সাংবাদিকতার কোনো বশিষ্ঠ ও স্থিতিশীল আদর্শ এদেশে গড়ে ওঠে নি। জাতীয় জীবন ঘাতপ্রতিঘাতে তরঙ্গচ্ছল হয়ে উঠছিল এবং ঘটনাধারার গতিপ্রকৃতি ছিল জট পরিবর্তনশীল। তার মধ্যেও সোমপ্রকাশের কর্তব্যের ধারকানাথ চেষ্টা করেছেন, বতর্দর সত্ত্বব একটি সূত্র ও মূল মানসিকতার আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতে। সেই আদর্শ অঙ্গুরণ করে, সমকালের বাংলাদেশ ও বাঙালীর সমাজ-জীবনকে সোমপ্রকাশ কিভাবে তার আত্মদর্শনে প্রতিফলিত করেছিল, পরবর্তী আলোচনায় আমরা সেদিকে অগ্রসর হব।

সমাজ-জীবন ও সামাজিক সমস্যার নানা দিক, যেমন—শ্রী-স্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা, গ্রাম ও নগরজীবনের পরিবর্তনের চেহারা ইত্যাদি বহু ব্যাপারে সোমপ্রকাশ আলোচনা ও মতপ্রকাশ করেছে। বিনয় ঘোষ এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তা সোমপ্রকাশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করবে—“প্রত্যেকটি বিষয়ে যে সোমপ্রকাশ প্রগতিশীল বা উন্নতিশীল দলের মতামত অঙ্গের মত সমর্থন করেছেন তা নয়। কিন্তু তা না করলেও কোথাও অঙ্গের মত প্রাচীন পন্থীদের গোড়া মনোভাবও সোমপ্রকাশ সমর্থন করেন নি। বিচারশীল উন্মুক্ত মন নিয়ে সোমপ্রকাশ প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা বিশ্লেষণের মধ্যে সোমপ্রকাশ আশ্চর্য সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিচারভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি সোমপ্রকাশ যেমন সমর্থন করেন নি, তেমনি প্রগতি বা উন্নতির নামে যেসেচ্ছাচারিতাকেও অহুমোদন করেন নি।”

বাঙালীর দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক অবনতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ ঘোষাও বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারজনিত অন্ধতাকে এই অবনতির মূল বলে নির্দেশ করেছেন। তাই সমাজবিজ্ঞানের নিখুঁত বিচারশীল বিশ্লেষণরীতির অহরূপ। বাঙালীর আর্থিক দুর্গতি ও শোচনীয় অবনতির এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্যে রয়েছে সমাজ-তাত্ত্বিকের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার চিহ্ন।

৥ ৫ ৥ রামমোহন-বিজ্ঞাসাগরের যুগ ব্যক্তিহীন ছিল এই শতাব্দীর (১৯শ) নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। উভয়েরই শ্রেষ্ঠ চরিত্রার্থী ছিল নারীমহাদার উপযুক্ত স্বীকৃতি-রচনায়। নবযুগের নবীন জীবনবোধের উদ্গাতা পুরুষেরা বুঝেছিলেন, যে সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা স্বীকৃত নয়, সেই সমাজ ও সেই জাতির জীবনের অগ্রগতি নিকট হতে বাধ্য। তাই, মুখ্যত সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁরা নারীর স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক স্বীকৃতিতে মগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় বাঙালী জাতির চ্যুতম কলঙ্ক ঘোষিত হয়েছিল তার নিবিচার নারীলঙ্ঘনায়। বাল্যে জনক, যৌবনে ভর্তা এবং বার্ষিকো পুত্রের অধীন নারী ছিল, পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র। যত্নবৎ সন্তান উৎপাদন করা ছাড়া সমাজে তার অস্তিত্ব কোনো ভূমিকাও ছিল না। নবযুগের প্রাণপুরুষেরা তাই সব-কিছুর আগে নারীমুক্তির ক্ষেত্রেই প্রসারিত এবং উদ্বোধিত করতে চাইলেন।

এই নারীমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতির ছুটি রূপ। প্রথমত মধ্যযুগীয় সমাজের বহু নারীলঙ্ঘনাকারী প্রথা, যেমন—বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীভ রক্ষা ইত্যাদি প্রবলভাবে খণ্ডিত হয়েছে। অপরদিকে রামমোহন থেকে বিজ্ঞাসাগর, বর মনীষীর বহু সাধনায় সত্যদাহ নিবারণ থেকে বিধবাবিবাহের সমর্থনে আইনও তৈরি হয়েছে। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত হয়েছে সোচ্চার, নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও চর্চার ব্যবস্থা এবং প্রস্তুতি হয়েছে ব্যাপক।

দ্বারকানাথ বিজ্ঞাসাগরের ঘনিষ্ঠ প্রহর ছিলেন। তত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত ধারণার ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ছিল আশ্চর্যভাবে উদার ও প্রগতিবাদী। স্বতরাং সোম-প্রকাশে নারীমহাদার স্বীকৃতি ও নারীমুক্তির সমর্থনে সংগত কারণেই যুক্তিজনাল রচিত হয়েছে। সোমপ্রকাশ বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ঘোরতর বিরোধী।

বিধবাবিবাহের অন্ধ সমর্থক না হলেও, যুক্তি ও উদারতার দিক থেকে তার সামাজিক ফলাফল দর্শনে আগ্রহী। বাঙালী সমাজের কুপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সোমপ্রকাশ সবচেয়ে বেশি কথা বলেছে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রসঙ্গে। এ পত্রিকার সমাজচিন্তা-সম্পর্কিত রচনাগুলির দিকে নজর করলে দেখা যায়, প্রায় বারো-চোদ্দটি রচনার মূল কেন্দ্রে রয়েছে নারীজাতির সমতার প্রসঙ্গ। এগুলির শীর্ষনাম যথাক্রমে—‘কন্ডাদার’, ‘হিন্দুমার্জ’, ‘বাল্যবিবাহ ও হিন্দু সমাজের পরিবর্তন’, ‘মোগলদরায় বিজ্ঞানসাহিত্যী সভা ও বিধবাবিবাহ’, ‘ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ে কত্যা আদানপ্রদান’, ‘সনাতন ধর্মের দ্বন্দ্বী সভা : কত্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণার্থ গবর্ণমেন্টের আবেদন’ ইত্যাদি। এছাড়া বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং বিধবাবিবাহের উপর বহু চিঠিপত্র এবং অকল্পিত পত্রপত্রিকাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বয়ঃ বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের চিঠিও প্রকাশিত হয়েছে। বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না, বাল্যবিবাহ সমাজের কিরূপ ক্ষতি করছে সে-সব ব্যাপারেও সোমপ্রকাশের নিজস্ব মতামত রয়েছে।

দ্বারকানাথের ব্যক্তিচরিত্রের গভীরেই নিহিত ছিল নারীসমাজের প্রতি আতান্ত্রিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি মিশ্রিত এক মানসিকতা। যে দ্বারকানাথ সোম-প্রকাশের পাতায়, সাহিত্যবিচার ও সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল মতামত রেখেছেন, আশ্চর্য হয়ে দেখি যে সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সর্বদাই প্রগতিশীল সংস্কারকের। বিশেষ করে সমাজে অবহেলিত নারীসমাজের প্রাণমূলক কোনো কাজে তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণার কদাপি অভাব ঘটত না। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আশ্রয়িত্রে মাতুল দ্বারকানাথের ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। এইসব ঘটনা গল্পের চেয়েও আকর্ষণীয় এবং এগুলি প্রমাণ করে, নারীসমাজের প্রতি কী গভীর ও নিবিড় মমতা তাঁর এই জাতীয় কর্মের উৎসরূপে কাজ করত। এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একবার বিজ্ঞানমগ্ন মহাশয় খবর পেলেন যে, তাঁর স্বগ্রামস্থ জৈনক ধনী ব্যক্তি এক বিধবা রমণীর অসহায়তার স্ত্রযোগ নিয়ে তার ধর্মনাশ করেছে। মেয়েটি ঐ ধনী পরিবারেরই দাসী ছিল। অসহায়তা হবার পর তাকে সেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরুপায় মেয়েটির কান্না দ্বারকানাথকে এমন বিচলিত করল যে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিধবান্ন মাছঘটির কাছে লোক

পাঠিয়ে মেয়েটির ভরণ-পোষণের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করলেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর সে প্রয়াস নিষ্ফল হল। এরপর ঐ অসহায় মেয়েটির পক্ষ-অবলম্বন করে দ্বারকানাথ স্বয়ং আদালতের দ্বারস্থ হলেন, নিজ বায়ে মামলা চালাবার ব্যবস্থা করলেন—এবং শেষ পর্যন্ত ঐ ধনী ব্যক্তিটি চক্ষুলাঙ্কার খাতিরে সেই মেয়েটিকে সারাজীবন মাসিক চার টাকা করে খোরপোষ দিতে বাধ্য হল। বিধবা মেয়েটি এবং তার গর্ভস্থ সন্তানের যাবতীয় স্বরক্ষার উপায়ও দ্বারকানাথ করে দিলেন। পাপের প্রতি সহজাত ঘৃণা এবং দুঃস্থ অবহেলিত নারীজাতির প্রতি হৃৎকণ্ঠীয় মমতা—এই উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁর চরিত্রে একটি আশ্চর্য দৃঢ়তা সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই দৃঢ়তা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও তাঁকে অসহায় নারীর মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট করে ছে।

এই দৃঢ়তা থেকেই বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের তীব্রতম বিরোধিতাকে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক তাঁর পত্রিকার অস্তিত্ব কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। ‘বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজের পরিবর্তন’ শীর্ষক সম্পাদকীয় বক্তব্যে, সোমপ্রকাশে বলা হয়েছে—“বাল্যবিবাহের উন্মূল একটি মহোপকারক বিষয়। সে পরিবর্তে (পরিবর্তনে) অল্প লোকের অভিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।... বাল্যবিবাহ বহু দোষের আকর। আমরা যে এত হীনবীর্ঘ ও হীনবল, দেশের জলবায়ু প্রভৃতির দোষই তাহার একমাত্র কারণ নয়, বাল্যবিবাহ বহুল পরিমাণে উহার সহায়তা করিয়া থাকে।... বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে অপূর্ণ বীজে সন্তান উৎপন্ন করিতেছেন। সে সন্তানের বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা কি?”

সেকালের বাংলাদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তার অতি নির্মম সমালোচনা সোমপ্রকাশে বেরিয়েছে। এখানে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে। দ্বারকানাথ নিজেই ছিলেন দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ। স্বতরাং বৈদিক সম্প্রদায়ের বাল্যবিবাহ-সম্পর্কিত সমস্তাগুলি কবেকারে মূল থেকে দেখে তার সমালোচনার উপায় নির্দেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তত্বপূর্ণ আত্মসমালোচনার নির্মমতাও তাঁকে এ সমস্তার তীব্রতার গভীরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। উপরিউক্ত সম্পাদকীয়তে বৈদিক সম্প্রদায়ের বাল্যবিবাহের কুফল নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—“অজ্ঞ অজ্ঞাতি দারপরিগ্রহ করিয়া যে সময়ে সংসারে প্রবেশ করেন, বৈদিকেরা তখন পৌত্র প্রাপ্তোজ্জ্বলি বহু পরিবারে

বেষ্টিত হইয়া বিষম বিব্রত হন।... অল্প বয়সে বিবাহ সমুদয় হরণ করিয়া লয়।... পুরুষপরম্পরা এই দুর্দশা হইয়া আসিতেছে; এই নিমিত্ত বৈদিক শ্রেণী মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি নরনগোচর হন না,” এছাড়া আরো কতকগুলি গুরুতর অনিষ্টও বৈদিক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর “পেটে পেটে সঘন্ম”—এর ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে। বাল্যবিবাহের কারণে এ সম্প্রদায়ের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ফারাক খুব কমই থাকে। তার ফলে—“এদেশে গচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন; স্বতরাং বৈদিক স্ত্রীগণ অতিশয় ব্যাপিতা হইয়া পড়েন।... সমবয়স্ক হওয়াতে পুরুষেরা স্ত্রীর মনোরঞ্জে সমর্থ হন না। সম্প্রসুখভোগ করাইয়া যে উচ্ছাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবেন, পুরুষের সে ক্ষমতাও জন্মে না, কাজে কাজেই পুরুষকে স্ত্রীর অহৃত্য হইয়া চলিতে হয়।”

পুরুষপরম্পরাগত এই প্রথা লঙ্ঘন করে বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা কোনো বৈদিকই করেন না। অতীব কষ্ট ভোগ করে এবং সম্প্রদায়গতভাবে দিনে দিনে বিনষ্টির সম্মুখীন হয়েও এই জঘন্য প্রথাতে বিলুপ্ত করবার জন্য কোনো চিন্তা বা সংকল্প তাঁদের মনে উদয় হয় না। তাঁরা আবার মুক্তি খাড়া করেন অজ্ঞভাবে। তাঁদের মতে পূর্বপুরুষের স্থাপিত এই প্রথার বিলোপসাধন হয়তো উচিত কাজ হবে না। সোমপ্রকাশ তীব্র বিজ্ঞপ সহযোগে তাঁদের প্রতি মন্তব্য রেখেছে—“পূর্বপুরুষের প্রতি কি চমৎকার ভক্তি! মন্থপান করিবার, গাঁজা খাইবার এবং অগম্যাগমন করিবার সময় পূর্বপুরুষ কোথায় থাকেন?”

এদেশের মাহুরের কাছে কল্জাজমের মতো বিপর্যয় আর কিছু ছিল না। সেই বিপর্যয়ের কারণ নির্দেশ করে সোমপ্রকাশের সংখ্যা বিশেষে ‘কল্জাদায়’ নামে একটি রচনা স্থান পায়। কল্জাজমকে কেন এদেশীয়রা বিপদ জ্ঞান করেন, সে সম্পর্কে সোমপ্রকাশে চারটি কারণ দেখানো হয়েছে। প্রথম কৌলীজ, দ্বিতীয় বাসাবিহা, তৃতীয় শিকাবিরহ এবং চতুর্থ কল্জার বিবাহদায়। এই চারটি কারণই যথোপযুক্ত এবং স্বনিপুণ বক্ত্রির সাহায্যে ব্যাখ্যাত, বিশ্লেষিত ও সমর্থিত। এইসব বক্ত্রির কার্যকারিতা অজ্ঞাপিও স্বীকার না করে উপায় নেই। বীভৎস কল্জাদায় প্রথার আলোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ শত্রুনির্দেশের কথাও স্মরণ করেছে—“এই কুসংস্কৃত প্রথা যে পূর্বে ছিল না তাহা ধর্মশাস্ত্রকারদিগের বচন দ্বারা ই সপ্রমাণ হইতেছে।” ঐ একই প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ বঙ্গদেশীয়

মাছুষগুলির স্বভাবধর্মের অতি বাস্তব মূল্যায়ন করেছে—“লোকের স্বার্থপরতা দীর্ঘে শাঙ্গ যথাবিধি প্রতিপালিত হয় না, অনেক স্থলে লোকের স্বার্থ অহুসারে উহা পরিবর্তিত করা হয়। থাকে।” সবশেষে সোমপ্রকাশ শিক্ষিত, নবীন যুবসম্প্রদায়ের কাছে এই সামাজিক কুপ্রথা বিলোপের জ্ঞাত আবেদন রেখেছে—“এতদিন যুগান্তর আবিপত্য ছিল... এখন দিন দিন কৃতবিজ্ঞের দলপুষ্টি হইতেছে... এখন আর এ বাবহার শোভা পায় না। কৃতবিজ্ঞেরা উদাসীন পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক নিয়ম পরিবর্তনে যত্নবান হউক।”

বঙ্গদেশীয় সমাজের কল্যাণজনিত সমস্যাগুলির সামাধিকনকে সোমপ্রকাশ সমধিক জোর দিতে চেয়েছে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধের উপর। যদিচ সোমপ্রকাশে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জ্ঞাত বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের “বহু শ্রম চেষ্টা ও অর্থব্যয়”-এর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে, তথাপি বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশের মত হল এই যে, এ-দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার—কেননা সমাজের দীর্ঘপোষিত সংস্কারাঙ্কতা এ প্রয়াসের একান্ত বিরোধী। সে তুলনায় বাল্যবিবাহ নিবারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সোমপ্রকাশের মতে—“উপযুক্ত বয়সে বালিকার বিবাহ দিলে আজকাল কাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হয় না।” মনে হয় শিক্ষার ক্রমপ্রসারের কথা মনে রেখেই সোমপ্রকাশ এমন মন্তব্য করেছে। স্বতরাং বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের মতো স্নানমন্ডল মাছুষ যদি বাল্যবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করতেন, তবে নিশ্চয়ই সমাজদেহ থেকে এই চুইকটটি অপসারণ হতে পারত, এবং—“তাহাতে চিরবৈধব্যের কষ্টও বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইত। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা বাল্যবিধবাদিগের কষ্ট নিবারণই প্রধান উদ্দেশ্য। বয়স্ক হইয়া ষাঁহার বিধবা হইয়াছেন তাঁহাদিগের পুনবিবাহ হইল বা না হইল সমাজ তদুজ্জ্বল বিশেষ চিন্তিত হন না।” অরঙ্গ সোমপ্রকাশ তথা ষারকানাদেবের এ মন্তব্য বিতর্কের সম্ভাবনামুক্ত নয়। ‘বয়স্ক’ শব্দটি ক্রি কৌন বয়সের বিধবার প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে সে প্রসঙ্গেও আলোচনা উঠতে পারে। তবে এ কথাগুলি থেকে অন্তত এটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সোমপ্রকাশের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। তবে বাল্যবিবাহের সমস্যাটিকে এখানে যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে, তা একই সঙ্গে বিধবার পুনবিবাহের সমস্যা দূর করতও কাজ লাগবে। সেদিক থেকে, এই দৃষ্টান্তের বাস্তবতাটুকু অবস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে

বাংলাদেশে দশবছরের কমবয়সী বাল্যবিধবার সংখ্যা ছিল ৩৬,৩৯৪ জন এবং দশ থেকে চৌদ্দবছর বয়সের বাল্যবিধবার সংখ্যা ছিল ৭০,৩০৬ জন। পনেরো বছরের মধ্যে বাল্যবিধবার সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। বৈধব্যের এই ভয়ংকর-করুণ চিত্রের সঙ্গে বাল্যবিবাহের যে কত ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। স্বতরাং সোমপ্রকাশের দৃষ্টান্তের অবস্থাটুকু বাস্তবতাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

দশবছরের কম বয়সের প্রায় নয়লক্ষ বিবাহিতা বালিকার অস্তিত্ব ১৮৮৪-৮৫-র বাংলাদেশে বর্তমান ছিল। এই বালিকাবধূরা এবং তাদের কাছাকাছি বয়সের আরো সব বিবাহিতা বালিকাদের ‘কোণের বউ’ বলে অভিহিত করে, সোমপ্রকাশের জৈনিক পত্রলেখক সতীপ্রসাদ সেন তাদের চরবস্থার বিবরণ দিয়ে লিখছেন—“কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্ঘ্যেই দোষী... কোণের বউ নিজ কিছু বলিতে পায় না। তাহার হইয়া বলিবারও কেহ নাই। কোণের বউ পৃথিবীর সকল স্থখে বঞ্চিত... সকল জীরই এই দুর্দশা, সকল জীরই এই লাজনা। সকল জীরই এই পরিণাম।”

সম্পাদকের উত্তরে নবাবুর কষ্টের কারণগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। সম্পাদকের মতে—“এ কষ্ট বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষার ফল।... বাল্যবিবাহ এখনকার সময়ের উপযোগী নয়। বাল্যবিবাহের পরিবর্তন এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এমনি অনাস্রব (একগুঁয়ে) কালের গতির এমনি বিরোধী, প্রাচীন প্রথার এমনি ভক্ত, যে বাল্যবিবাহনিবন্ধন দেশের বিষম দুর্দশা ঘটতেছে... তাঁহার ইহা দেখিয়াও দেখেন না।... দেশের এমনি বিকৃত শোচনীয় অবস্থা যে, সকল অমঙ্গলের আকর যে বাল্যবিবাহ তাহা সমাজের দুর্দৃষ্টি অর্গল ভগ্ন করিতে পারিতেছে না, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্বরূপান সেই অর্গল ভগ্ন করিয়া সমাজভিত্তিতে শত শত ছিদ্র করিতেছে, তাহাতে কোন কথা নাই।” লক্ষ্য করবার ব্যাপার এই যে, বিজ্ঞাসাগর ও ষারকানাদ উভয়েই নারীসমাজের দুর্দশা মোচনে সমভাবে আগ্রহ পোষণ করেছেন। বিজ্ঞাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বর্ষজ্ঞি নিয়োগ করে এই দুর্দশার মূল উৎপাতন করতে চেয়েছেন, আর ষারকানাদ তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে জোর দিতে চেয়েছেন বাল্যবিবাহ রোধের উপর।

বোম্বাইয়ের পার্শী সমাজ-সংস্কারক বাইরাম জি. এম. মালাবারি ১৮৮৫ সাল নাগাদ বাল্যবিবাহ ও বাল্যবৈধব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন

সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই এই আন্দোলনের তরঙ্গ এসে পৌঁছেয়। স্বাভাবতই বাংলাদেশের শিক্ষিত এবং প্রগতিবাদী মাধবের কাছে এর প্রতিক্রিয়া তীব্রতর আকারে দেখা দেয়। এ বিষয়ে সোমপ্রকাশে লেখা হয়েছে—“হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মালাবারি মহাশয় ব্যাখ্যিতপ্রাণ হইয়া তাহা দূর করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই হিন্দুগণ আমরা আপনাদিগের সামাজিক মহল্লামহলের প্রতি এত উদাসীন এ চুখ রাখিবার স্থান কোথায়?” সোমপ্রকাশ এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদের চেষ্টার উল্লেখ এবং প্রশংসা করেছে, কিন্তু ব্রাহ্মদের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নি। সোমপ্রকাশের মতে—“তাঁহারা সমাজের লোক নন বলিয়া তাঁহাদের সমুদয় যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে। সমাজ তৎপ্রতি জরুণ নয় করেন নাই।” সোমপ্রকাশের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোনো পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান যদি এ ব্যাপারে মনোযোগী ও সচেষ্ট হন, তবে তাঁদের প্রযত্নে এ কুপ্রথা নিশ্চয়ই নিবারিত হত।

অল্পবয়সী মেয়েদের বৈধব্যের সমস্যাটি কৌলীজ ও বহবিবাহের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাঙালীসমাজে এককালে বহবিবাহ যে ভয়ংকর আকারে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রধান কারণই ছিল কৌলীজ প্রথা প্রকাশ। সোমপ্রকাশ ছিল বহবিবাহের ঘোরতর বিরোধী। ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৩০ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত ‘বহবিবাহ হওয়া উচিত কিনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে সোমপ্রকাশ যে মতামত প্রকাশ করেছে তাতে এ জাতীয় সামাজিক প্রথাটির উচ্ছেদ চেষ্টায় সরকারের হস্তক্ষেপ তাঁদের কামা না হলেও, বহবিবাহের প্রতি কোনো আহতুল্লাও দেখানো প্রকাশিত হয় নি। সোমপ্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও মৌলিক। রচনাটিতে বলা হয়েছে—“সামাজ সংস্কার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঋষি শ্রাহ্মের কাণ্ড উপস্থিত হয়।... উভয় পক্ষই স্ববির বচন তুলিয়া আপনাব মনোমত তাহার ব্যাখ্যা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান।... আমরা বিস্মিত হইলাম, উল্লিখিত পণ্ডিত দলের স্তায় বিজ্ঞাপাগরও বহবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইষ্টলাভ কি? বহবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোকে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন? ইহারা মুখে বলেন শাস্ত্র অল্পদূরে চলেন কিন্তু বাবদার দেখিয়া বোধ হয়, শাস্ত্র মানেন না।” এই আশ্রয়-সমালাচনার পর সোমপ্রকাশ আরো বলেছে বহবিবাহের মতো সামাজিক

কুপ্রথা অবলোপের জন্ত, কথায় কথায় শাস্ত্রকারদের শরণ করা যেমন উচিত নয়, তেমনই নিবৃত্তিতার কাজ প্রতিপদে সরকারের শরণাপন্ন হওয়া। সমাজের সাধারণ মাধবের পক্ষে তবে বিধেয় কি? সোমপ্রকাশ এর উত্তরে বলছে—“যদি গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজসংস্কার আবশ্যক হয়, অসংখ্যবার তাঁহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে দাদাক ডাকা স্থবির নয়। তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট দ্বারা সমুদায় আচার ও ধর্মেরও সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অত উতলা হইলে চলে না।”

সোমপ্রকাশে উল্লিখিত একটি তথ্য থেকে জানা যায়, বিজ্ঞাপাগর মহাশয়ের বহবিবাহ সম্পর্কে লিখিত একটি প্রস্তাবে আছে যে, কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলিতে যেখানে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে সেখানে শিক্ষিত সামাজিকের মনে সমাজ-সংস্কারের প্ৰস্হা ও উৎসাহ বিলক্ষণ সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। কাজেই এ কথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, আধুনিক শিক্ষার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারের প্রবণতাও সেকালের জনমানসে ক্রমশ জাগরু হচ্ছিল। সোমপ্রকাশের মতে এ প্রয়োজনে বিদেশি সরকারের দ্বারস্থ হতে হবে না। এছাড়া এ ব্যাপারে সোমপ্রকাশের একটি অভিনব এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রস্তাব রয়েছে। সোমপ্রকাশ বলেন, ধার্মা অকারণে অপ্রয়োজনে একাধিক বিবাহ করবেন তাঁদের প্রত্যেক বিবাহিণী পঁচাত্তর টাকা করে কর দিতে হবে। কেননা ব্যবতীয় দুগের মধ্যে অর্ধদণ্ডই সবচেয়ে গুরুদণ্ড। এবং, “অর্ধদণ্ড আছে, প্রবণমাত্র এ আবেদন গবর্ণমেন্টের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে। নিঃস্বপ অপর্যাপ্ত কুলীন কুমারেরাই উপদ্রব করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবাহ-ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। অপর লাভ এই, গবর্ণমেন্টের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল না।” সোমপ্রকাশের এ প্রস্তাবে যথেষ্ট বাস্তববুদ্ধি আছে এবং তদানীন্তন সমাজে তা যথেষ্টই কার্যকরী হত তাতে সন্দেহ নেই।

সমাজের এই নিষ্ঠুরতম কুপ্রথা দূর করার অভিপ্রায়ে সোমপ্রকাশের বহু পৃষ্ঠার পরিশ্রম ব্যয়িত হয়েছে। কেবলমাত্র বালিকা কল্লার বিবাহ নিষিদ্ধ করাই যথেষ্ট হয়। সোমপ্রকাশের ৩১ ভাদ্র ১২৯১-এর সংখ্যায় বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত একটি রচনায় বলা হয়েছে—“এইরূপ একটি নিয়ম হওয়া আবশ্যক, পুরুষ যাবৎ যোগ্য না হইবে, যাবৎ জীবিকা অর্জনে সমর্থ না হইবে, তাবৎ

পুল্কষের বিবাহ হইবে না। এ নিয়মটি বলবৎ হইলে ক্রমে কষ্কার বিবাহ-কালেরও পরিবর্তন হইয়া আসিবে— ফলতঃ আমরা বেশ বৃদ্ধিতে পারিতেছি, পুল্কষেরা যোগ্য ও উপার্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিবার রীতি অবলম্বিত না হওয়াতেই আমাদের দেশের অধিকাংশ ছদ্মশা ঘটিয়াছে।”

সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থিতিশীল ও অহসরণযোগ্য আদর্শ বেকালে স্থাপিত হয় নি, সেই সময়ের যাবতীয় সমাজচিত্তার ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশ যে স্বচ্ছ উদার এবং বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের সাম্প্রদায়িকের পক্ষেও অহসরণযোগ্য। পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, কেবল নারীসম্প্রদায়ের সমস্তা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায়নির্দেশই নয়, এ পত্রিকা তৎকালীন সমাজের প্রায় প্রতিটি আলোচনামোঘ্য বিষয়ের দিকেই প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাত করেছিল।

৬। সোমপ্রকাশের বহু রচনায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর চারিত্রিক লক্ষণগুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই রচনাগুলির মূল স্রু আত্মসমালোচনামূলক। বাঙালীচরিত্রে বহু দুর্বল ও গণ্যবলীর সমিবেশ হয়েছে। কিন্তু চারিত্রিক দোষগুলি সম্পর্কে সমগ্র সমাজ-চক্কেই সম্মানে নির্মীলিত থাকে। বাঙালীর শোচনীয় দুর্গতি দেখে সোমপ্রকাশ এই অবর্ণনীয় দুঃবস্থার কারণগুলিকে সমাজবিজ্ঞানীর নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন। সোমপ্রকাশের মতে প্রথমত অশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সামাজিকের সংখ্যাধিক্য এই শোচনীয় দুর্দশার জন্মদায়ী। এই অশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের বৃদ্ধি ও মানসিকতা ইউরোপীয় সমাজের ও সভ্যতার গুণগুলি গ্রহণ করতে অসমর্থ ছিল কিন্তু দোষগুলি নির্বিচারে আয়ত্ত করেছিল। সোমপ্রকাশ দ্বিতীয় কারণরূপে নির্দেশ করেছেন সনাতন শাস্ত্রনির্দেশের প্রতি তৎকালীন বাঙালীর অশ্রদ্ধা। শাস্ত্রের নির্দেশ ও অহুশাসন লঙ্ঘন করলে পাপভাগী হতে হবে, এই আশঙ্কা আগে থাকলেও ক্রমশঃ তা সমাজমানস থেকে দূরীভূত হয়েছে। সোমপ্রকাশ আক্ষেপ করে বলেছেন, “এমন সুরাপানাদি করিলে ধর্মে পতিত অশ্রদ্ধেয় ও অপাণ্ডেয় হইয়া থাকিতে হয় না।” তৃতীয়ত, চাকরিজীবী বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের প্রভাবে অধিকাংশ মাছুয়ই সম্ভ্রমতার মুখ দেখেছে। তার ফলে সাধারণ মাছুয় বাসনা সংঘম ও চিন্তাশমনের প্রয়োজনীয়তা অহুভব করতে ক্রমেই বিপর্যস্ত হচ্ছে। অর্থদুর্গতি থাকার ফলে কামনাপূরণে কোনো অভাব ও ব্যাঘাতই ঘটছে না। চতুর্থত,

“বান্ধালিদিগের বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি নাই। আত্মসকর কার্যে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, স্তব্রাং বিলাপেই গাঢ়তর অহুরাগ জন্মিয়াছে। এটি বাস্তবিক শোচনীয় অবস্থা সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের এই বৈকল্য ভরা দূরীভূত হইয়া যে কবে পূর্ণমাত্রা হইবে আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি।”

এই বৈকল্যের কলঙ্করূপা বাঙালীর জাতীয় জীবন থেকে অত্যাধি অপনোদিত হয় নি। বৃহত্তর ভারতবর্ষের সর্ববিধ কর্মসামান্যের ক্ষেত্রে থেকে বাঙালীর দ্রুত পশ্চাদগমন ও নির্বাসন এ কথাই প্রমাণ করে যে, আজও বাঙালী সোমপ্রকাশের উল্লিখিত সেই হীনবীর্য, স্ত্রীশাসিত, অলস জাতিই রয়ে গেছে। ১২৭৯—১৩০৯, শতাধিক দশবছর অতিক্রম করেও সে জাতিগর্বে সংগ্রামবিমুখ, আত্মবিস্মৃত, পরনির্ভর অথচ পরশ্রীকাতর!

অনুনা বাঙালীচরিত্রের বিলাসপ্রিয়তা ও বাহ্যিক আড়ম্বর বাহ্যিক ক্রমশই ভগ্নাবস্থায় ফলিত দিকে এগিয়েছে। সোমপ্রকাশ সেই দোষগুলির দিকে শতাব্দীকাল আগেই সতর্কতাসূচক অঙ্গুলিসংকেত করেছিল। মোগল শাসনাধীনে থাকার সময়ে মোগলের অতিরিক্ত বিলাসপ্রবণতাকে বাঙালী তার আপন চরিত্রে অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। আবার ইংরেজের শাসনকালে, এই দৃঢ়্য পরাহরণ প্রবৃত্তি তাকে শিথিয়েছে— “বচনবাজি ও গলাবাজি” এবং কার্যকলাপের বাহ্যিক আড়ম্বর। স্বাধীন বাঙালী জাতির চরিত্রের গভীরে এই বিশেষ দোষগুলি বহুদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে। এইসব চারিত্রিক ক্রটি ও দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা বোধহয় আমাদের সাধের অতীত ব্যাপার।

বুটশ-অধিকৃত বাংলাদেশের সমাজে দুটি জীবন্ত উপজবের কথা সোমপ্রকাশ উল্লেখ করেছেন। এ দুই উপজব যথাক্রমে ‘নাগরিক লোফার’ ও ‘সামাজিক লোফার’। নাগরিক লোফার “ছিন্নবস্ত্র পরিধারী বিকটমুখ বলবান অর্ধ দম্ভার আকৃতি।” সে কর্মহীনতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। গুণ্ডিয়া, দাঙ্গাবাজি ও নারীনিগ্রহে বহুপরিচর এই নাগরিক লোফাররা এতদিন পরেও বাঙালীর সমাজে যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান।

সোমপ্রকাশ যে সামাজিক লোফারের কথা বলেছেন, তিনি আরো উচ্চ-মার্গের পথিক। এই জাতীয় লোফারদের বিচ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য নেই বললেই চলে, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যের লোকদেখানো প্রকাশটি বড়ই মারাত্মক। পরিশ্রমে এরা অনাগ্রহী, লোক ঠকিয়ে কাজ হাসিল করার কৃত্তিতে এরা অস্থিতির।

“ইহাদিগের এমন চমৎকার ক্ষমতা এই, তোমার টাকা লইবে, কিন্তু দেখাইবে যেন তোমার টাকা লইয়া তোমারই মহা উপকার করিল।” এইসব গুণধর লোকাদরের আহার-বিহার, শয়ন-ভোজন সব-কিছুই অত্যুক্তি এবং তার বয় নির্বাহের ভার সবটাই অপরের ঘাড়ে। “লোকার এক এক জনকে পাইয়া বসিলে তাহার ভিটায় ঘুঘু না চরাইয়া ছাড়ে না।” অতদিন আগেকার বাংলা-দেশে এই সামাজিক লোকাদর শ্রেণীর উপদ্রব দেখে দ্বারকানাথ আকাজিক হয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে তাদের বীভৎস রূপান্তর দেখলে না জানি তিনি কতখানি বিচলিত হতেন!

বর্তমান বাংলাদেশের শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে এই লোকাদরের বিপুল সংখ্যার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতির ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে সঙ্কে পাঁজা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে এই লোকাদরের সংখ্যা। আজকের বাঙালী মধ্যবিত্তের পায়ের তলার মাটি এই নতুন সামাজিক লোকাদরের আক্রমণে ঢুলে উঠছে। এইসব পরজীবী পরগাছাগুলিকে নির্মম হাতে মূলসমেত উপড়ে না ফেললে সমাজের ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে উঠবে।

সোমপ্রকাশ বাঙালী জাতির বিচিত্র দুর্বলতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বাঙালীর যাবতীয় লক্ষণসমূহ সবই হৃৎ, স্বজাতি ও স্বজনের সীমারেই আবদ্ধ। মনের স্থিরতা ও দৃঢ়তা এ জাতির নেই। এই মন প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারহীন “কিংস্কপ ফলের ঝায়। সামান্য কারণরূপে উদ্ভাপে ফটু করিয়া কেবল কতকগুলি তুল্যম লঘুকার্য্য করিয়া চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সমাজের পবিঃ দেখেকে মলিন করিয়া থাকে।” এই কারণে বাঙালী চিত্তের ধর্মাহুতি ও ধর্মবোধ সত্যই দোলাচল। তাদের হৃদয়মন ধর্ম ও সত্যকে আশ্রয় করে দৃঢ়তায় স্থিত হতে পারে না।

সোমপ্রকাশ মনে করে এই দৃঢ়তার অভাব থেকেই বহুতর ক্ষুদ্র বৃহৎ দুর্বলতা বাঙালীর অন্তরমনকে প্রতিনিয়ত অধিকার করছে। প্রথমত যুক্তি-বুদ্ধিহীন একধরনের লোকলজ্জা বাঙালীর সামাজিক তথা অর্থনৈতিক জীবনে বহু সর্বনাশ ও দুর্গতিকে ভেকে আনছে। দ্বিতীয়ত ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানা থাকু আর না থাকু তার অন্তর্গত বিশেষ লোকচাতার পালনের প্রবণতা বাঙালীর উন্নতির মূল কুঠারখাত করছে।

বংশধারার অভিমান ও অকারণ অযৌক্তিক লোকলজ্জার ফলে, একদা

বিশ্বশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো উত্তরপুরুষ অনেক সময় কেবলমাত্র ঠাট্টাবট বজায় রাখার কারণে পথের ভিক্ষকে পরিণত হন এবং তাঁর সমগ্র পরিবারটি ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়। এর ওপর রয়েছে ধর্মান্তরণ ও লোকচাতারের বিবিধ পালনীয় ইতিকর্তব্য। পিতামাতার শ্রাদ্ধ, পুত্রকন্মার বিবাহ, গৃহদেবতার নিত্যসেবা, বারো মাসে তেরো পার্বণ পালনের কারণে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে, সেকালের প্রায় সব বাঙালী গৃহস্থকেই বহু অর্থ ব্যয় করতে হত। এইসব তথাকথিত পুণ্যকর্মের অতুষ্ঠান ব্যাধী করতেন, তাঁদের বিশ্বাস ছিল এতে একদিকে তাঁদের পারমায়িক ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে এবং অপর-দিকে সমাজ ও তাঁদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এই আত্মভিমান, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। সোমপ্রকাশের মত—“ইহাতে সাধারণকে আলস্য-পরবশ করে। অতিথিশালা স্থাপন করিলেন বা অন্নস্ব দিলেন, কতকগুলি লোক সেখানে পরপিত্তে পেটে পুরিয়া আলস্য ও পাপের আশ্রয় দিতে লাগিল ও অকর্মণ্য হইয়া সমাজের অব্যবহার্য্য জীব হইতে লাগিল।” এ দৃষ্টিভঙ্গি আবেগরহিত এবং নিরুত্তভাবে বাস্তব। এখনও এ মস্তব্যের সারবত্তা ও যৌক্তিকতাকে কোনোমতেই লঘু করে দেখা চলে না।

ইংরেজের আমলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী বাংলার বাইরে সোম-প্রকাশের ভাষায় “চাকুরী, অথবা কুহুরী” করতে বেরিয়েছিলেন। তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল ইংরেজি শিক্ষা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত ভারত-বর্ষের সর্বত্রই তখন, এই বাঙালী চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল। এই বিভাজনমণী ও গরিত বাঙালী যুবকদের সখন্দে সোম-প্রকাশ প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই লিখেছিল—“বাহাদুর বিভাজনমণী হইয়া বিদেশে থাকিয়া ২০/২৫ টাকা বেতনে রেলওয়ের থালাসী বা নিরাশ্রয় পথিকদিগের অথবা পোস্ট অফিসের পিয়নদিগের উপর বনগ্রামের জঙ্ঘু রাজার মত বিলক্ষণ আধিপত্য প্রদর্শন দ্বারা অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া আত্মল্লাঘা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন কিরূপ উন্নত উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, তাহা চরিত্রেই প্রকাশিত হইতেছে।” বর্তমানের বাঙালীকে সেই মিথ্যা আত্মভিমানের খোঁসায় অবশ্যই চরমমূল্যে দিতে হচ্ছে বা হবে।

এইসব প্রাঙ্গণী বন্ধযুবকের চরিত্র বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে সোমপ্রকাশ তাদের বিশেষণ দিয়েছে “অব্যবস্থিত চিত্ত” এবং সন্দেহ পোষণ করেছে—“তাঁহারা কি মানসিক বলে উন্নত? এই দুর্বলমনা ব্যক্তিদিগের দ্বারা কি

কখন সমাজের উন্নতি হইতে পারে?" এই ছর্বলতার স্বরূপটি কি রকম? এই বাঙালী যুবকেরা যখন নিজস্বদের পরিবারের মধ্যে থাকেন, তখন তাঁরা গৃহপালিত বিভালের মতো শান্তশিষ্ট। গুরুজনকে মাত্ত করে চলেন, সমাজভয়ে দেবদ্বিজ ভক্তিও রাখেন। কিন্তু এইসব গৃহপালিত মার্জারাই বহির্জাতি করলে রন বেড়ালে পরিণত হয়ে যান। স্বর্ধর্ম ও স্বসংস্কার পরিতাগ করে হয়ে ওঠেন পরম নাস্তিক কিংবা চরমপন্থী রিকর্মার। আবার বিদেশ থেকে ফেরার সময় তাঁদের পুরো চেহারা বদলে যায়। ফেলে দেওয়া উপবীত আবার যথাস্থানে জায়গা পায়। শূশ্রুশ্রু নিম্ন করা হয় এবং যে রিকর্মার কিছুদিন আগেই হিন্দু দেবদেবীকে খড়্গ-দড়ি সর্ধ, পৌত্তলিকের উপাসনা করার সামগ্রীমাত্র বলে ভাবতেন, তিনিই আবার সানন্দ সেই পৌত্তলিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সেই পুতুল প্রতিমাকেই এক ত্রুজ্ঞানে পূজা করেন। সোমপ্রকাশ একটি অতি ক্ষুদ্র বিক্রূপের শলাকা তাঁদের প্রতি নিধেপ করেছে—“জিজ্ঞাসা করি অরুজলের শফরী বলিয়াই কি একুপ করা হয়?” এ বিক্রূপের হৃদ্যতা ছর্বলচেতা যুব সমাজকে অবশু স্পর্শ করেছিল বলে বোধ হয়।

সোমপ্রকাশের সমাজবিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে একটির শীর্ধনাম—“যাহারা বিলাত যাইতে চান তাহাদের হইতে দেশের লাভ কি?” এই রচনাটিতে বিলাতক্ষেত্রেতা, সাহেবসাজা বাবুদের যে চমৎকার চিত্র সোমপ্রকাশ দিয়েছে, তার উপভোগ্যতা একালেও সমপরিমাণে বর্তমান। একে তো বহুজাতি বহুধর্ম বহু মতের অসংখ্য মাহুয় ভারতবর্ধ বাস করেন। এক সম্প্রদায়ের লোক অরু সম্প্রদায়ের লোকের বিরুদ্ধচারণ করতে সর্বদাই ব্যস্ত। যুগা ভিন্ন অরু কোনো অরুত্বিত একের জ্ঞাত অরুতর মনে বিরাজ করে না। ধর্মে, বিশ্বাসে, সামাজিকতায়, আচারে-বিচারে সকলেই ভিন্ন পথের। সোমপ্রকাশের মতে—“ধর্মীতার দিন চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজের সজীব দেবতারার অনেক বলি গিয়াছেন, আর কেন? এখন অরু কোন নৈবেত্তের আহরণ কর। যাহাতে দেশের মুগ্ধী উজ্জল হয়, তাহার চেষ্ঠা দেখ।”

এ দেশের রুতবিরুত সমাজের মতিগতি বড়ো চমৎকার। উরুশিক্ষা লাভের জ্ঞাত তাঁদের অনেকেই সমুদ্রপারে রওনা দেন কিন্তু প্রতাবর্তন করার সময়, সাবেক বলতে তাঁদের কেবল পাজ্রবর্ধটুকুই অবশিষ্ট থাকে। কেননা সেটুকু কোনোমতেই যাবার নয়। সোমপ্রকাশের মতে—“আর সকল এক রাজির মধ্যে বরলিয়া যায়।... স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে আর যেন মাহুয় নয়।...

ভাষা বাঙ্গালা কিন্তু রোমানবর্ধে লিখিত; ভিতরে বাঙ্গালী কিন্তু ইংরাজি কেতান্তে সমাজে পরিচিত। এঁরা দেশীয় লোকের ভারি শত্রু। খাটি সাহেবরাও বরং ভারতবাসীদিগকে স্নেহ-মমতা করেন, কিন্তু ইহাদের রুদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই। যাহাদের মাহুয়, যাহাদের সঙ্গে থাকিরা এতবড় হইলেন, ছুদিন বিলাতে যাইরা তাহাদিগকে নিগাধি বলেন... বিলাতে বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে যাওয়া নিন্দনীয় নহে, কিন্তু ইহার আছরুদিক দোষগুলিকে মার্জনা করা যায় না।”

এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষিত যুবসমাজ আচার-বাবহারে পরাকরুণসর্বপ। তাঁদের আহাৰ্ধ পরিধেয় সবই সাহেবি কেতার। সোমপ্রকাশ আশঙ্কা করেছে—“আমরা বলি উরুতর বিজ্ঞাশিক্ষার পরিণামফল যদি এইখানে আসিরা দাঁড়ায়, তবে তেমন বিজ্ঞাশিক্ষাকে দূর হইতে নমস্কার করিরা এই অরুতাপূর্ণ ভারতগর্ভেই তাহারা থাকুন, আর উন্নতির কাজ নাই।”

সাহেবসাজা বাঙালীর দল আমাদের মধ্যে আজও অছেন। তাঁরা আরো এককান্তি সরেশ। বিলাত যাবারও দরকার পড়ে নি, সেখানে না গিয়েই তাঁরা স্বদেশে, স্বজাতি ও স্বসংস্কৃতিকে অতি হীনজ্ঞানে বর্জন করে ফেলেছেন। এঁদের সন্তানোরা মা-বাবাকে বিজাতীয় ভাবে সন্ধান করেন, মাতৃভাষায় কথাপ-কথনে তাঁদের সম্মানহানি হয়, লজ্জার কারণ ঘটে। এঁদের পোশাক-আশাক, চলাফেরা, ধরনধারণ সবই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে ধার করা। স্বাহীনতা লাভের পর তিনটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে—তবু এই মূরুপুচ্ছধারী দাঁড়-লাকদের সংখ্যা বিদ্যুতমাত্রও কমে নি। সোমপ্রকাশের পরিচালকেরা একালে বর্তমান থাকলে তাঁরা কী বিশেষণ এঁদের সবিশেষ ব্যাখ্যা করতেন তা জানতে ইচ্ছে করে।

অবশু সোমপ্রকাশ এ সমস্কার একপাফিক দিকটাই কেবল পর্যালোচনা করে নি, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছে যে—“আমাদেরও সমাজের প্রচুর নিষ্ঠুরতা আছে।” এই নিষ্ঠুরতা প্রায়শ্চিত্ত নামে একধরনের গ্রহসন তৈরি করে এইসব উরুশিক্ষিত যুবকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এতে যে দিনে দিনে হিন্দু সমাজও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই নিষ্ঠুর সত্যটির দিকেও সোম-প্রকাশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, “স্বযোগ্য পাজগুলি ক্রমে ক্রমে যখন সমাজের বহিচ্ছৃত হইতে চলিলেন, তখন মঙ্গলের আশা কোথা?”

বর্তমান সমাজের সমস্কাটা ঠিক এ ধরনের না হলেও স্বযোগ্য পাজদের

হারানোর ব্যাপারটা প্রায় একই রকম আছে মনে হয়। এখনও যোগ্যতা-সম্পন্ন এবং কৃতবিদ্য যুবসম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ বিদেশ থেকে আর ফেরেন না কিংবা দেশে ফিরে আসার পরেও আবার বিদেশে যাবার সুযোগ-সন্ধান করে বেড়ান। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার যথোচিত মূল্যায়ন ও মর্যাদাদান, যে-কোনো কারণেই হোক, স্বদেশের সমাজ ও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই বিদেশ যাত্রার তরঙ্গরোধ করতে না পারলে স্বাধীন দেশের বহু উন্নতিই রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেদিক থেকে বিচার করলে সোমপ্রকাশের উপরি-উক্ত মন্তব্যগুলি আজও প্রয়োজনীয়তা হারায় নি।

৥ ৭ ॥ বাঙালীর জাতীয় সংহতি ও সাজাত্যবোধের উপরে সোমপ্রকাশে বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকার রাজনৈতিক চেতনা ছিল অতি স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও প্রখর। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল সাম্প্রদায়িক উদারতা ও জাতীয় সংহতি বোধ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী বাঙালীর চিন্তায় সাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটে। এই জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক ছিলেন ধারা, সেই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালী হিন্দুরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বতরাং সংগত কারণেই এই জাতীয়তার চেতনা ছিল উগ্র হিন্দুত্বকেন্দ্রিক। শিক্ষিত হিন্দুদের পরিচালিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে জাতীয়তার বাণী ধ্বনিত হতে থাকে তার সবটুকুই ছিল হিন্দু জাতির জাতীয়তাবোধের স্বরে বাঁধা। কিন্তু সোমপ্রকাশ সর্বত্র এই স্বরে স্বর মেলাতে আগ্রহী হয় নি। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে এ পত্রিকার জাতীয়তার স্বরের স্বর ও উচ্চারণভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। সেই স্বরে আছে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সর্বজাতির সংহতি ও একতার কামনা। এই সামগ্রিক সংহতির সাধনা বোধ করি স্বাধীন ভারতবর্ষেরও সবচেয়ে বড়ো সাধনা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল— উত্তরে পশ্চিম পূবে, দক্ষিণাণ্ডে আধার্বর্তে, হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও দাঙ্গায় বাধিত হয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছে—“ইছারা সকলেই যদি বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তবে ভারত উৎসর যাইতে ত একদিনও লাগে না। ধর্ম কর্ণে সকলে আপন আপন বিশ্বাসমত কাজ করুন কিন্তু সামাজিক কাজে একতা চাই। নতুবা নিজ নিজ উন্নতিও হইবে না। স্বদেশেরও উন্নতি হইবে না।” এই ‘ইছারা’ হলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ— যেমন, হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান এবং নব্যোদ্যত ব্রহ্মজ্ঞানী সম্প্রদায় ইত্যাদি। ১৮৮১ সালে এ রচনাটি যখন সোম-

প্রকাশে স্থান পায়, তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও অঞ্চলে ইংরেজ শাসকদের দুরভিসন্ধি ও বিভেদাত্মক শাসননীতির ফলে যাবো মাঝেই ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যেত। এই দাঙ্গা সমাজজীবনের স্বস্থ পরিবেশকে বিধ্বস্ত করে তুলত। সোমপ্রকাশ এই উপরিলিখিত মন্তব্যটি করেছিল, মূলতানের একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে সোমপ্রকাশে লেখা হয় যে, বাংলাদেশে এ দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ। ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যতই প্রভেদ ও পার্থক্য থাকে-না কেন তাঁরা একই প্রদেশের অধিবাসী বলে পরস্পরের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রদেশে এখনও সে সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। সামান্যতম উদ্ভ্রাণিতেই হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের রক্ত দেখার জগৎক্ষেপে ওঠেন। সোমপ্রকাশ বলেছে— “দেশের অনিষ্টে আমাদের অনিষ্ট, তাই আমাদের প্রার্থনা হিন্দু ও মুসলমানে ভবিষ্যতে আর যেন বিবাদ না ঘটে।”

সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য— ইত্যাকার সামাজিক বিকৃতি ও দুর্নীতিগুলি সবসময়ই সোমপ্রকাশে নিম্নিত হয়েছে। মুসলিম সমাজের বহু অঙ্গ কুসংস্কার, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁদের বীতশ্রদ্ধা ও উদাসীনতা এবং আরো নানারকমের সমস্যা নিয়ে সোমপ্রকাশ বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছে। কিন্তু এ পত্রিকার কোথাও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ বা বৈরভাব প্রকাশ পায় নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার অহরহিতর কারণে যে তাঁদের ধর্মাস্বাধীনতা ও গোঁড়ামি একথা সোমপ্রকাশে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মসংস্কার এবং তজ্জাত বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— “এ ধর্ম উদার্য ও নিরপেক্ষতা নাই। ‘আমাদিগকে সাহায্য কর না কর, তুমি কাকের ও বধা’ ইহা মুখে না বলা হউক গোঁড়া মুসলমান মাজেরই মনোগত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্মের ভ্রাতা মুসলমান ধর্মবন্ধনও শিথিল হইতেছে। এই নিমিত্ত গোঁড়া মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অগ্ররক্ত নহেন। যে কৃতবিদ্য মুসলমান মহম্মদের ধর্মে অবিশ্বাস করেন, তিনিই শত্রু বলিয়া বিবেচিত হন... ইহাতেই মুসলমানগণ কখনই আপনাদিগকে ভারতবর্ষের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিলেন না, ইহাতেই তাঁহারা ইংরাজী শিথিতে অসম্মত। গোঁড়ামী ইহার ফল। গোঁড়ামী হইতে অজ্ঞ সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বন্দ্ব ও বৃষ্টি সাহায্যের প্রতি গোপনীয় বিদ্বেষ ভাব জন্মে।”

এই বিশ্লেষণের মধ্যে যেমন সমাজ সম্পর্কে গভীর ভূয়োদর্শন লক্ষিত হয়, তেমনই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয় এই বিশ্লেষণের শাস্ত্র এবং অহুত্তেজিত ভঙ্গিটিকে। কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্নও এই বিশ্লেষণে নেই।

শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের আচার্য্যতাই নয়, হিন্দুসমাজের দীর্ঘপোষিত ধর্মীয় সংস্কারগুলির পরিচয় এবং সেগুলির সময়েচিত্তি এবং প্রয়োজনানুগ পরিবর্তনের চিন্তাও সোমপ্রকাশ করেছে। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন অস্বাভাবিকের মতো সোমপ্রকাশেরও কাম্য; এবং এ প্রতিকার দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলকভাবে অনেক আধুনিক। প্রাচীন হিন্দুসামাজিকগত যে সব লোকহিতকর ব্যবস্থাদির উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি যাতে লোকসমাজে পুনঃপ্রচলিত হয় সে ব্যাপারে সোমপ্রকাশ প্রভূত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আবার সেইসঙ্গে একথাও বলেছে—“যিনি যতই কেন চেষ্টা করুন না, খাটি হিন্দুধর্ম আর চলিত হইতে পারিবে না। সেদিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। আমাদেরও ইচ্ছা নয় যে আবার সমস্ত হিন্দুধর্মীতী সমাজে অবিকল প্রচলিত হউক। তাহা প্রচলিত হইলে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই।... উদাহরণস্বরূপ আমরা কুমারীবিবাহ, বিধবার ত্রত এবং একাদশীর উল্লেখ করিতেছি।... রঘুনন্দন নামক হিন্দুদের লাইকারগণ পণ্ডিতের শোণিতময় কালিতে লিখিত এই ব্যবস্থার ভিতরে যতই কেন গূঢ় তত্ত্ব থাকুক না, কিন্তু রূপণ বিধবা মাতা, ভগিনী প্রভৃতির নির্জলা একাদশীর উপবাস কষ্ট অধিক দিন হিন্দুরা সহ্য করিতে পারিবেন না।” সোমপ্রকাশ দৃঢ়তার সঙ্গে একথাও বলেছে যে সকল দেশেই রাজনৈয়ম, সামাজিক নিয়ম ও ধর্মনিবদ্ধ বহুকালাগত হলেও, যুগে যুগে মহত্ত্ব-সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব নিয়মেরও অবস্থান্তর ঘটে বাচ্ছে। এমন ক্ষমতা কোনো ধর্মগুরুই নেই যে, একই নিয়ম চিরকালই প্রচলিত রাখবেন। সমাজের অবস্থা ও মানুষের প্রবৃত্তি অহুদারে যখন যে নিয়মচারণ আবশ্যক ও কাম্য বলে বোধ হবে, সে সময় তাই প্রচলিত হতে বাধ্য।

অতএব—“সমাজের বর্তমান অবস্থা বৃষ্টিয়া ব্যবস্থা না করিলে ফল হয় না।” সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে যে বর্তমান সমাজ ও প্রবৃত্তির অবস্থা ইংরেজের সহস্রাব্দে কাজকর্ম করায় ইচ্ছুক ও অহুদুল। বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্য বিস্তারের জ্ঞান হিন্দুসমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ ক্রমেই দেশেবিশেষে ছড়িয়ে পড়ছেন। ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক জাতি ও ধর্মগোষ্ঠীর সঙ্গে নানা কাজকর্মে তাঁদের একত্র চলেতে হচ্ছে। এইসব নতুন ব্যবস্থা হিন্দুদের পক্ষে উপযোগী ও হিতসাধক

হচ্ছে সন্দেহ নেই। তাই সোমপ্রকাশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে—“যে নিয়ম এই কয়েকটি উদ্দেশ্যসাধনের অহুদুল, এখন তাহাই থাকিবে। যে ব্যবস্থা উহাদের প্রতিকূল এখন তাহা লোপ পাইবে।” অত্যন্ত সময়েচিত্তি এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে সোমপ্রকাশ হিন্দুসমাজ ও তার ধর্মসংস্কার সম্পর্কে এই আলোচনা করেছেন। বর্তমানের প্রয়োজন ও অবস্থার অহুদামী করে ধর্ম-সংস্কারগুলিকে রূপান্তরিত করতে না পারলে তার আচরণ লোকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে—এই বিচারের রয়েছে স্বচ্ছতা ও বাস্তবানুগামিতা। শুধু ধর্মচারণের ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক রীতিনীতির অবস্থান্তরের ক্ষেত্রেও সোমপ্রকাশ অহুত উপার মতামতের পরিচয় দিয়েছেন।

৥ ৮ ৥ সেকালের বাংলাদেশের গ্রাম ও নগরের সমাজ ও জীবনব্যবহার ধরনসারণের তথ্যনিষ্ঠ ও বাস্তব চিত্র সোমপ্রকাশে মেলে। শিক্ষার বহুল প্রসার ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, সেকালের গ্রাম্যসমাজেও বিবিধ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ১৮৬৭-৬৮ নাগাদ প্রকাশিত একটি রচনার বলা হয়েছে যে সেই প্রবন্ধ রচনার সময় থেকে ধর্মের কিস্কিদ্ধিক দশবৎসর আগেকার বাংলাদেশের পল্লীগামগুলির অবস্থার সঙ্গে, দশ বছর পরের পল্লীগামগুলির পার্থক্য আকাশ পাতাল। আগে যে-কোনো পল্লীগামে প্রবেশ করলে মনে হত, গ্রামবাংলার মানুষের ঘেন আমোদে, আলোদে, আলস্বে দিনযাপন করা ছাড়া জীবনের অহুত উদ্দেশ্য বা কর্ম নেই। শিশু থেকে বৃদ্ধ গ্রামের সব মানুষই যেন ভাসপাশা খেলে সময় কাটাতে অভ্যস্ত ছিল। শিশু ও বালকদের মধ্যে বিভাগশিক্ষার আগ্রহ বা চেষ্টা তিলমাত্রও ছিল না। যুবকেরা ছিল বিষয়বুদ্ধিহীন, অপরিণামদর্শী, বুদ্ধের অকর্মণ্য ও অলস। তাঁদের কাজ বলতে ঘোঁটা পাকানো, দলাদলি, লোকনিন্দা। অবসর যাপন বলতে বৃথা গল্পগুজব ও ক্রীড়াশক্তি। কিন্তু ক্রমশ চিত্তের পরিবর্তন ঘটছে। শিশু ও বালকেরা পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হয়েছে। যুবক ও প্রৌঢ়েরা বিষয়কর্মে অভিনিবিষ্ট। সব-কিছু দেখে শুনে বুদ্ধেরাও আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তিত হতে চেষ্টা করছেন। আগে আলস ও ভ্রমবিমুখতা থেকে গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ ভাঙনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছিল। স্বভাবেই কর্মবিমুখ গ্রাম্যসমাজের আর্থিক সচ্ছলতা বিন্দুমাত্রও ছিল না। এখন গ্রামের অবস্থা আর সেরকম নেই। গ্রামীণ অর্থনীতির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে। অধিক কৃষক মজুর কেউই আর অমের জন্ম হাফাকার করে বেড়াচ্ছে না। ছ-চারজন জাতাভিমামী

শ্রমবিমুক্ত মানুষ ব্যতীত—“সাধারণ্যে বলিতে গেলে এই কথা বলিতে হয় পল্লীগ্রামগুলি পুঁজিপৈশ্য বহুগুণে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে।” এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ সোমপ্রকাশের মতে—“বিজ্ঞান কার্যের প্রাচুর্য, বাণিজ্যের উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই তিনটিই পল্লীগ্রামের অবস্থা পরিবর্তনের প্রধান কারণ।”

গ্রামের উপর নগরের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সোমপ্রকাশ সভাতার দৃষ্টি নতুন অবদান সম্পর্কে স্রষ্টা মন্তব্য করেছে। সভাতার এ দুই অবদানের একটি হল আদালত, অপরটির নাম কলকাতা শহর। “বাহার নিকটে বাস করিলে ভদ্রহতা নাই এবং যতদূরে বাস করা যায় ততই শান্তি লাভ করা যায়।” ইংরাজের বিচারব্যবস্থা ও আদালত গ্রাম্যসমাজে পরিচিত হওয়াতে বহু উপদ্রবের সৃষ্টি হয়েছে। আগেকার ব্যবস্থায় ছোট-খাটো বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তির জ্ঞাত গ্রামস্থ ভদ্র পঞ্চজনের মিলিত সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিল। ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত আদালতের কল্যাণে সামান্য আধ-হাতে জমি নিয়ে মালিকানার লড়াইও বহুদূর গড়াতে পারে। আদালতের রূপায় প্রত্যেক গ্রামেই নতুন এক স্ববিধাবাদী শ্রেণীর দেখা মিলেছে। এদের একমাত্র কাজই হল লোকের কলহবিবাদে ইচ্ছন জোগানো এবং সেই স্বযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থোপার্জন। আদালতের ধারেকাছে এরা ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। গ্রাম্য মানুষ খুঁজে বার করতে পারলেই মাংসাশ্রয় করার পরামর্শ জোগায়। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, জাল মোকদ্দমা সাজানো, দরকারমত উকিল-মোক্তারের ব্যবস্থা করা—সব ব্যবস্থাই এদের নখদর্পণে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হীন অভিল্লাষ থেকে, গ্রামে গ্রামে এই শ্রেণীর মানুষগুলি প্রতিদিনই অশান্তির আগুন জালিয়ে রাখে। এই অর্পলোলুপ দালাল শ্রেণীর মানুষদের জ্ঞাত গ্রামজীবনে আর স্বস্তি স্বাভাবিক পরিবেশ নেই। মানুষের মানুষের পারস্পরিক স্নানিতর বন্ধন সত্যতাই ছিন্ন হতে চলেছে।

ইংরাজ আমলে কলকাতা শহরের বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত হারে। ঠিক ততোধিক দ্রুত হারে অবনতি হয়েছে কলকাতার নিকটস্থ গ্রামগুলির। অর্থ থাকলেও গ্রামে এখন আর উত্তম খাদ্য মেলেনা। উপর খাদ্যসামগ্রীর একটা বিরাট অংশ প্রত্যন্ত সূর্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শহরের বাজারে চলে যায়। উদ্ভবত যে খাদ্যসম্পদ গ্রামের মানুষের জ্ঞাত অবশিষ্ট থাকে তার খাদ্যদ্রব্য একান্তই নগণ্য এবং চাহিদার তুলনায় যোগান সঙ্কটবশত,

এ নিকটে মানের খাদ্যদ্রব্যের জ্ঞাত গ্রামবাসীদের সূচ্য দিতে হয় পরিমাণে অনেক বেশি। এইভাবে কলকাতার মতো মহানগরী আশপাশের গ্রামগুলিকে নিঃশেষে শোষণ করছে এবং রক্তশূন্য করে ফেলেছে।

এ ছাড়াও সোমপ্রকাশের মতে শহর নগরের নৈকট্যেবু বহু গ্রামে নিঃশেষে বহু সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে চলেছে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খলার ঐতিহ্য বিনষ্ট হতে বসেছে। আগে গ্রাম্যসমাজে বিস্তারিত ও সম্ভ্রান্ত মানুষেরা দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে আগ্রহী ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এই ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাশালীদের গ্রামের আপার জনসাধারণ শ্রম ও সম্মান করতেন এবং এঁদের শাসন মেনে চলতেন। এখন গ্রামের মানুষ স্বকর্তৃত্বনির্ভর ও স্বাধীন। কেননা জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সমাজস্থ অনেক মানুষই প্রচলিত রীতিনিয়মে অনাখ্যাপায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল। ধর্ম ও শাস্ত্রনির্দেশের বেড়া ইংরাজ শিক্ষার অভিঘাতে কেবই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে; তদুপরি শহরের আবহাওয়া মানুষের মনে এমন বিশৃঙ্খলাবোধের জন্ম দিয়েছে যে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও সমাজ-বিরুদ্ধ কোনো কাজই এখন আর অন্যায়ের বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে না। সমাজ অবিরত বেজ্ঞাচারের পাশে পরিপূর্ণ। এই কলুষিত আবহাওয়া পরিবর্তনের ও নিবারণের উপযুক্ত ক্ষমতা এখন কারোয় নেই। সোমপ্রকাশে বলা হয়েছে—“সহরে বাঁহারা থাকেন সহরের দোষভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরের গুণ-ভাগের অংশী হইয়া থাকেন। দোষানের শিক্ষা ও আত্মোত্তির উৎকৃষ্ট উপায়-সকলও তাঁহারা লাভ করেন, কিন্তু আমাদিগের জ্ঞাত সহরের নিকটে বাঁহাদের বাস তাঁহারা সহরের গুণভাগ না পাইয়া দোষভাগই অধিক ভোগ করিয়া থাকেন।” আধুনিক কালেও আমরা দেখে থাকি, শহরতলি বা কোনো কোনো মধ্যস্থলের সমাজে শহরের গুণগুলি যত না অল্পকৃত হয়, দোষগুলি অল্পকৃত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। এ তথ্যের সত্যতা সমাজবিজ্ঞান ও স্বীকার করবে। শহর ও শহরতলির সামাজিক পরিবেশের পার্থক্যের এই ইঙ্গিত যথেষ্ট যুক্তিসংগত এবং তা সমাজবিজ্ঞানের স্বজ ধরেই এসেছে।

শহর ও গ্রামের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সোমপ্রকাশের বিবিধ মতামতের মধ্যে অপর একটি মন্তব্যও বিশেষ লক্ষণীয়। সোমপ্রকাশের মতে, শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলির জীবনযাত্রা ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার ধরন-ধারণে যত দ্রুত অবনতি হচ্ছিল হয়, শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে সেরকম কিছু

হয় না। শহরের কাছাকাছি যে-সব গ্রাম, তার বেশিরভাগ মাহুঘই জীবিকা-নির্বাহের কারণে শহরে বাস করে থাকেন। গ্রাম তাঁদের সম্ভাসনিক বিরামকৃত্ত বই আর কিছু নয়। কাজে কাজেই গ্রামের উন্নতির জন্ত সেরকম কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। অথচ যে-সব গ্রামের দূরত্ব তুলনামূলকভাবে শহর থেকে অনেক বেশি, সে-সব গ্রামের শিক্ষিত মাহুঘ নিজ নিজ গ্রামের প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। কার্যোপলক্ষে শহরে থাকলেও গ্রামে ঘোরার স্বযোগ তাঁদের কম। সে স্বযোগ মেলে ন-মাসে, ছ-মাসে। এর ফলে গ্রামের জন্ত তাঁদের মনে মমতা থাকে, গ্রামের উন্নতির জন্ত সন্ধিচ্ছাবশত তাঁরা আন্তরিক চেষ্টাও করে থাকেন। এ ছাড়াও শহর-জীবনের নিত্য-নূতন ভোগবিলাস, সদাপরিবর্তমান জীবনযাত্রার ধারা শহরের নিকটস্থ গ্রামের উপর যতদূর প্রভাব বিস্তার করে, দূরস্থিত গ্রামের উপর তা পারে না। নাগরিক চালচলনের বিলাসবৈভব, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহারবিহারের চাকচিক্য ও চমৎকারিত্ব গ্রামের মাহুঘকে সহজেই প্রলুব্ধ করে এবং শহরে বিলাসের অন্ধরণ করতে গিয়ে গ্রামের মাহুঘের আর্থিক সামর্থ্যে ক্রমেই টান ধরে। সোমপ্রকাশ বলেছে এই ব্যাপক সর্বনাশ থেকে শহরের কাছাকাছি গ্রামের কোনোদিনই মুক্তি সম্ভব নয়।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল ব্রাহ্মধর্মোদ্বোধন। ব্রাহ্মধর্মের উত্থান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, সেকালের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট ঘটনা। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় আলাচিত সমাজবিষয়ক প্রসঙ্গের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে— ব্রাহ্মধর্ম, তার বিভিন্ন দিক, ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা।

সোমপ্রকাশের জনৈক পত্রলেখক একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—“যে সকল ব্রাহ্ম হিন্দুদিগের সহিত সংশ্রব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কপটতা করা হয়, তাঁহাদিগের ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়াও নিতান্ত অকর্কষ্য।” এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে যে সব যুক্তি সোমপ্রকাশ উদ্বৃত্ত করেছে তা একদিকে যেমন গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে, অপরদিকে তেমনি যুক্তি ও উদার প্রগতিবাদী চিন্তাকে প্রকাশ করছে। ধর্মনির্দেশ পালনের ও ধর্মাচারের মধ্যে যে বিশেষ একধরনের অবগতিশয্য থাকে সোমপ্রকাশ সেই আবেগের উচ্ছ্বাসকে বর্ণন করেছে এবং নির্ণূত আবেগহীন যুক্তির অবতারণা

যটিয়েছে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মদের সংশ্রব রাখা উচিত কি অসুচিত সে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে সোমপ্রকাশ প্রথমেই বলেছে ব্রাহ্ম এবং হিন্দু উভয়ের আদিধর্ম কিন্তু এক ও অভিন্ন। “হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি বৈরূপ স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সেরূপ নহে। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম। হিন্দুদিগেরও এই আদিধর্ম।... ফলতঃ ব্রাহ্ম ও হিন্দুতে বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ে এক জাতীয় ও এক ধর্মাবলম্বী, কেবল কিঞ্চিৎ প্রস্থান-ভেদ এই মাত্র। যদি এরূপ হইল তবে পরস্পর সংশ্রব পরিত্যাগ চেষ্টা কেন? সে চেষ্টা কি উপহাসাত্মক ও অসঙ্গত নয়?”

সোমপ্রকাশ আরও বলেছে হিন্দুধর্মের বর্তমান অবস্থা শুক হয়েছে প্রকৃত-পক্ষে পুরাণাদির প্রচলনের পরে। এদেশের প্রধান ধর্ম আসলে অদ্বৈতবাদ। সেই ধর্ম নানা কারণে বিকৃত হতে হতে ইদানীং কালের হিন্দুধর্ম হয়ে উঠেছে। এখন প্রয়োজন উপযুক্ত সংস্কার। সংস্কার ব্যতীত এ ধর্মের পক্ষে পূর্বের অবস্থায় ফেরা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা এই সংস্কারে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কুসংস্কারবশত তাঁরা যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হয়ে, সামান্য কারণে অথবা অকারণে হিন্দুসংসর্গ পরিত্যাগ করেন তবে এ সংস্কার সম্ভব নয়। হিন্দু এবং ব্রাহ্মের সম্মিলিত চেষ্টাই সনাতন অদ্বৈতবাদকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সর্বোপরি “হিন্দুরা কুসংস্কারাবিষ্ট, বিশুদ্ধ যুক্তির অহরণ করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু ব্রাহ্মেরা বিশুদ্ধ যুক্তির মর্ষজ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোনক্রমেই উচিত নয় যে, তাঁহারা কুসংস্কারাবিষ্টের ভ্রায় সামান্য কারণে অথবা অকারণে হিন্দুসংসর্গ পরিত্যাগ করেন।”

এ পত্রপ্রেসের লিখেছেন হিন্দু-সংশ্রবে থাকলে ব্রাহ্মের আপনধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি কপটতা করা হয়। সোমপ্রকাশ তাঁকে এতপ্রশ্ন করেছেন—“আমি যদি আমার আত্মার কিঞ্চিৎ অপকর্ষ করিয়া অস্ত্র সহস্র সহস্র আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, তাহা আমার কর্তব্য কি না? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহা পাপ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না?”

অপর একজন পত্রপ্রেসের লিখেছেন যে, ঈশ্বরপ্রীতিই ব্রাহ্মগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাতে সংসারে যে ফলোৎপত্তিই হোক-না কেন, এই তাঁদের একমাত্র ধর্ম। সোমপ্রকাশের প্রশ্ন—প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতির স্বরূপ কি? সংসারনিবন্ধ মাহুঘের পক্ষে বনবাসী সাধুস্বতের মতো কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে ঘুরে বেড়ালেই

কি ঈশ্বরশ্রীতির প্রকাশ ঘটে, না ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সম্পাদনাই ঈশ্বরশ্রীতি প্রকাশিত হয়? “যিনি যে সমাজে বাস করিতেছেন, সর্বপ্রথমে ও সর্বান্তঃকরণে তাহার উন্নতিসাধন চেষ্টা কি ঈশ্বরের প্রধানতম প্রিয় কার্য্য নহে?” উনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সাধনা হল মানবতাবোধের উদ্দেশ্যের সাধনা। সেই মানবমুখিতা থেকেই সোমপ্রকাশের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে যে, মাহুষের উন্নতিসাধনের চেষ্টার নামই ঈশ্বরাত্মসন্ধান। জীবসাধারণের মঙ্গল করার নামই ঈশ্বর সেবা।

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মালোচনার প্রতি সোমপ্রকাশের বিরাগ তো ছিলই না, উপরন্তু ছিল একটি সহায় ও যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন। সোমপ্রকাশের মতে ব্রাহ্মধর্মই একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম। কালে এই ধর্ম শুধু ভারতবর্ষেরই নয় জগতেরই একমাত্র ধর্ম বলে পরিগণিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সোমপ্রকাশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ধারকানাথের ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন। কিছুকাল তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন।

ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে, সেই সূত্রে সোমপ্রকাশ কলকাতার ব্রাহ্মসমাজকে কিছু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়েছে। সেসময় কলকাতার বহুস্থলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আচার্য উপাচার্য ও অধ্যক্ষদের যেমন তাগপারায়ণ, সচ্চরিত্র, উদার ও পরহিতভ্রাতৃ হওয়া প্রয়োজন, অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা তা হতে পারেন নি। সোমপ্রকাশ বলেছে, এর একমাত্র কারণ হল বিশ্বাসী লোকের আচার্য পদের ভ্রাত্যরহণ। সোমপ্রকাশ ব্রাহ্ম সমাজকে পরামর্শ দিয়েছে—প্রথমত আচার্য, উপাচার্য ইত্যাদিকে বিশ্বাসী মাহুষের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। আচার্য উপাচার্য ও সম্পাদক এই তিন পদাধিকারীকে সেই সেই ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক বেতনদানের ব্যবস্থা করতে হবে, যে যে সমাজের বা সভার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত আছেন। এই বেতনধরূপ দেয় অর্থ সংগৃহীত হবে সেই সেই স্থানের ব্রাহ্মধর্মাহরণীদের কাছ থেকে টাদা নিয়ে। সংগৃহীত অর্থ যদি ঐ সভার তিনপ্রধানের বেতনের পক্ষে অপ্রতুল হয়, সে ঘাটতি পূরণ করবেন মূল ব্রাহ্মসভা। এই তিনপ্রধান অল্প কোনো কাজ করবেন না। যাতে লোকের ব্রাহ্মধর্মে অহরহ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয় তাঁরা সর্বতোভাবে সেই চেষ্টাই করে যাবেন। সে চেষ্টা করতে গেলে তাঁদের অনেকগুলি মহৎ ও সাংবিষয়ের অহুতান করতে হবে। অপরক্ট ঈশ্বরাত্মসন্ধান,

চরিত্রদোষ সংশোধন, ত্যাগ, ক্ষমা, স্বদেশের হিতচিন্তা ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশসাধন তাঁদের একান্ত কর্তব্য। এই জাতীয় আচার্যকে দর্শন করলে কোনো ব্যক্তির চিন্ত আপনা হতেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আদালতের আমলা ও ডিক্রিজারীর মুহুরির পরিবর্তে, ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে এই জাতীয় উন্নতচরিত্রের মাহুষ অধিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি আপনিই হবে।

এ সব আলোচনা ছাড়াও ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম বিতর্কিত পৃথক কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়েও এ পত্রিকায় বাদ্যহৃদয় তর্কাতর্কি ও বহু চিত্রিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কেশবচন্দ্রকে নিয়ে সোমপ্রকাশে সম্পাদকীয়ও লিখিত হয়েছে। কেশবচন্দ্রের অহরহাঙ্গী একদল ব্রাহ্মের ধারণা হয় যে কেশবচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। এ ধারণার বিরোধিতা করে জীবজন্মরক্ষণ গোষাময়ী, শ্রীমতুনাপ চক্রবর্তী ও শ্রীনীলকমল দেব প্রমুখ সোমপ্রকাশের পাতায় এক পত্র প্রকাশ করেন। এই বাদ্যহৃদয় অনেকদিন চলছিল। সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয়ে বলা হয়েছে—“কেশববাবু ও তাঁহার অহুতরণ বালকবৎ ব্যবহার করিতেছেন। ...মাহুষের চরণেবুলেহন এটি কি কৃতবিজ্ঞের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নহে?” স্পষ্টতই সোমপ্রকাশ মাহুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে, ব্যক্তিপূজার তীক্ষ্ণ বিরোধিতা করেছে।

॥ ১০ ॥ সোমপ্রকাশে চিত্রিত তদানীন্তন বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজের চিত্রের আংশিক সমীক্ষা করা গেল। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হল সমাজ-সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের বলিষ্ঠ ও উদার মনোভঙ্গি। সমকালীন বাংলা পত্র-পত্রিকার এ ব্যাপারটি একান্তই দুর্বল ছিল। বিভাসাগর মহাশয় ছিলেন এ পত্রিকার আদি পরিকল্পনাকারদের প্রধান। তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তাধারার ঐতিহ্য, এ পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী পরবর্তীকালেও সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখেছিলেন একথা বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশ যে নির্মল শুভ সংযম ও পরমতসাহিফ্যুতার পরিচয় দেয়, সেকালের বাংলাদেশে সে উদাহরণ এক এবং অদ্বিতীয়। সোমপ্রকাশের ১২৮১ বঙ্গাব্দের ৫ শ্রাবণ সংখ্যায় ‘বাদ্যনা সংবাদপত্রের উপর লোকের এত অশ্রদ্ধা কেন?’ এই শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। তাতে তৎকালীন বাংলা পত্র-পত্রিকার একটি বিশেষ দুর্বলতা

ও রুচিহীনতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছে। সে যুগের বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলিতে সাধারণভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা শুরু হলে, পত্রিকাগুলি প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করত, আবার ব্যক্তিবিশেষের কোনো কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণকে সেখানে এনে ফেলত। সোমপ্রকাশের মতে—“এ প্রকার দোষ বৃদ্ধিমান লোকমাজেরই পক্ষে দৃষ্টিগত, বিশেষতঃ সম্পাদকদিগের এই প্রকার দোষ অতিশয় ঘূর্ণাই। বলিতে কি এই দোষেই অধিকাংশ বাঙালী সংবাদপত্র ঘৃণিত হইয়াছে।” সোমপ্রকাশ আরও বলেছে, ভ্রাতোচিত উপায়ে, বিরুদ্ধ যুক্তিসম্মার মাধ্যমে বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করাই ভদ্র মাহুষের কাজ, কিন্তু বিপক্ষের যুক্তির দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে তাঁর চরিত্রের ক্রটি নির্দেশ কিংবা চরিত্রে কলঙ্কলেপন করে লোকচক্ষে বিপক্ষকে অপদৃশ করার চেষ্টা করা অমাহুষের কাজ। সেই-সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা বহু অপ্রয়োজনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়কে সাধারণের গোচর করার জন্য বাস্তব হয়ে নিজেকে “সদয়স্থিত গরল বমন করিয়া আপন আপন পত্র ভর্তুকির অস্পৃশ্য করিয়া ফেলেন।” এই গরল বমন করার চেষ্টা সেকালের সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান প্রবণতা ছিল। এই প্রবণতা রুচিশীল পাঠকের তৃপ্তির পরিপন্থী ছিল। সোমপ্রকাশকে তার সম্পাদকগোষ্ঠী সম্বন্ধে ভদ্র পাঠকের রুচি অহুযায়ী সংঘত ও শোভন করে তুলেছিলেন।

সোমপ্রকাশের পাতায় অঙ্কিত সেকালের বাংলাদেশের আকর্ষণীয় সমাজ-চিত্র সম্পর্কে আলোচনা অসমাপ্ত রয়ে যায়, যদি না এ পত্রিকার ভাষাশিল্প ও রচনারীতি নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়। সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। সংবাদ পরিবেশনের ভাষাকে সকলের আগে হতে হবে প্রাঞ্জল এবং সুবোধ। সে ভাষায় থাকা চাই স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা এবং প্রসাদগুণ। সকল শ্রেণীর পাঠক যাতে পঠিবিশিষ্ট সংবাদের সবটুকু গ্রহণ করতে পারেন সেবিধেই সংবাদপত্রের ভাষার মনোযোগ থাকবে অধিক। এ উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের ভাষাকে হতে হবে যতদূর সম্ভব নিরলংকার, আবেগবর্জিত এবং অনাড়ম্বর। ছোটো ছোটো বাক্য, সহজ ও সর্বজনবোধ্য শব্দ প্রয়োগে সে ভাষাকে হতে হবে সদাসচল। সোমপ্রকাশ এ লক্ষ্যপূরণে পরিপূর্ণ মাত্রায় সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সমালোচনা ও সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ভাষাকে হতে হবে ব্যক্তিগত আবেগ ও অহুত্বের তীব্রতাবর্জিত। উপরন্তু

সে ভাষা যেন যুক্তিপূর্ণতার উপযুক্ত বাহন হয়। সোমপ্রকাশের বহু সম্পাদকীয় এবং বহু প্রবন্ধে আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাই।

তৃতীয়ত, সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজনে সাময়িকপত্রের ভাষাকে যেমন নানানচারী হতে হয়, তেমনই আবার স্থানবিশেষে বক্তব্যকে স্তরসাল করে প্রকাশ করার দায়িত্বও সংবাদপত্রকে বহন করতে হয়। সোমপ্রকাশের পাতায় বহু স্থলেই পাঠক অন্ন, মধুর, তিক্ত, কটু, কষায় রসের স্বাদ পান। সময়বিশেষে এ পত্রিকার মন্তব্যে ঈষৎ কড়া ও অম্লান্ত বাহ্যের ঝাঁকটুকু খুঁজে পাওয়া যায়, কখনো সমাজের কোনো করুণ অধ্যায়ের বিবরণ দিতে গিয়ে সে ভাষার অবয়বে সঞ্চারিত হয় অহুত্বের বেদনা, কখনো আচারবিমূঢ় সামাজিকের অন্ধতার প্রতি সে ভাষায় স্লেসে ওঠে ধরশান তরবারির তেজ! নিচে সোমপ্রকাশের ভাষার উদাহরণ রাখি—

“পূর্বে হিন্দুসমাজে কেহ স্ত্রীপাপন করিতে পারিতেন না। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহ স্ত্রীপাপনে আসক্ত হইল সমাজহু কোন ব্যক্তিই তাঁহার অঙ্গগ্রহণ অথবা তাঁহার সহিত যৌনসম্বন্ধ করিতেন না।... স্ত্রীর প্রতি হিন্দু-সমাজের এমনি ঘৃণ ছিল যে, কেহ গোপনেও ইহার সেবনে সাহসী হইতেন না।... আজিকালি যেরূপ ইয়া উঠিয়াছে পঙ্কতি ভোজনেও স্ত্রী চলিত হয়, আর বড় বিলম্ব নাই। এখন আর প্রায় কেহ সঙ্কোচ করেন না। পঙ্কতি ভোজনে স্ত্রী চলিলে বড় কৌতুকের হইবে। নিম্নরসিতা ও নিম্নরসিত উভয়ে মস্তপানে মস্ত হইয়া যখন মাছের মুড়া ও পিটার মাখি হাতে লইয়া পঙ্কতির মধ্যে নৃত্য করিতে থাকিবেন কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তাহা দেখিয়া মন মোহিত না হইবে?” প্রবন্ধটির নাম ‘দলাদলি ও স্ত্রীপাপন’। প্রকাশকাল ২৬ বৈশাখ ১২৭৮। এ ভাষা যে আদর্শ সাংবাদিকতার ভাষা তা বললে বোধ করি তেমন কিছু অতুক্তি হবে না।

সোমপ্রকাশ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীর সমাজ-জীবনের বহু গুণানামা, পতন-অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী; শুধু সাক্ষী নয় দোষারও। এই পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে, সেকালের বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রার বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তথ্য— ইতিহাসের বিরাট দলিল। ভবিষ্যতে পাঠক তা থেকে অনাবিস্তর এমন অনেক বিবরণ খুঁজে পাবেন যে আবিষ্কার কোনো মহাদেশ খুঁজে পাবার মতোই উত্তেজক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

॥ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ॥

১. সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড)—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২. রামতল্লাহ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
৩. আত্মচরিত — ঐ
৪. বিজ্ঞানাগর-জীবনী সমূহ—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শত্ৰুঘ্ন বিহারী
বিহারীলাল সরকার
৫. করুণাসাগর বিজ্ঞানাগর—ইন্দ্র মিত্র
৬. আত্মজীবনী —বিপিনচন্দ্র পাল
৭. পুরাতন প্রসঙ্গ —বিপিনবিহারী গুপ্ত
৮. রচনাবলী —ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর
৯. সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল
১১. বাংলার নবজাগরণের পথে— ঐ
১২. মুক্তির সন্ধানে ভারত — ঐ
১৩. জাগৃতি ও জাতীয়তা — ঐ
১৪. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ
১৫. History of Bengal—রমেশচন্দ্র মজুমদার
১৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—স্বর্কুমার সেন
১৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ভূদেব চৌধুরী
১৯. বাংলার জ্ঞানশিক্ষা—যোগেশচন্দ্র বাগল
২০. Bengal Renaissance—Atul Chandra Gupta Ed.
২১. Nation in Making—S. N. Banerjee

ব্যক্তিগত চিন্তা

কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা

গুণানন্দ ঠাকুর

কিছু ব্যক্তির ধারণা গুণানন্দ ক্ষৌত হইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। কলিকাতা নগরীর যানবাহন বাঁচাইয়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেবদূতগণের অগ্নিকন্ডক হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসক নামধের কিছু ব্যক্তির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বাঁচিয়া থাকা এক দুঃস্থ ব্যাপার। কোনো অলৌকিক মন্ত্রবলে গুণানন্দ এ সমস্ত আপদ সম্মুখে দেহরক্ষা করে নাই। কিন্তু লেখনী সংবরণ করিয়াছিল। বুদ্ধের বহু দোষ। সর্ববৃহৎ দোষ অতিকথন। সত্য বলিতে দূরভাষে আত্মপরতা তরুণী কিংবা নির্বাচনপ্রার্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অপেক্ষাও সে বেশি প্রগল্ভ। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে স্তম্ভ করিবার ক্ষমতা একমাত্র তদীয় ব্রাহ্মণীর। ব্রাহ্মণী না থাকিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে কে? গুণানন্দ ভাবিয়াছিল অনেক হইয়াছে এইবার সে নীরব হইবে কিন্তু প্রলোভন তখনই দমন করিতে অস্বীকার হয় না যখন কোনো প্রলোভন থাকে না। প্রলোভন গুণানন্দের সর্বনাশ করিল। স্বেচ্ছাস্পদ সম্পাদক সময়ে একটি মরালস্ত্র লিখিবার কাগজের গুচ্ছ আনিয়া কহিল, “আপনার যাঁহা ইচ্ছা এই কাগজে লিখিয়া রাখুন।” জল দেখিলে ভেকের যেরূপ আনন্দ, তত্শক শকটে জনতার আধিক্য দেখিলে গ্রন্থিচ্ছেদকের যেরূপ আনন্দ, নির্বাচন আসিলে জ্যোতিষের যেরূপ আনন্দ, ওই মরালস্ত্র লিখিবার কাগজ দেখিয়া গুণানন্দের প্রাণে সেইরূপ আনন্দ উপস্থিত হইল। গুণানন্দ লেখনী এবং মসী লইয়া নাসাগ্রে পরকলা লাগাইয়া পিলস্‌জের নীচে বসিয়া গেল। পাঠক, আমি তোমার দ্ববে দুঃখী। লোভী ব্রাহ্মণের লোভই তোমার দুঃখের কারণ। কিঞ্চিৎ পরিমাণে সম্পাদকও।

কী লিখিব? লিখিবার বিষয়ের তো অভাব নাই। আনন্দমার্গী হত্যা, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, বর্গালী দস্তের নৃশংস হত্যা, জলপাইগুড়ির রহস্যময়

রোগ, বিধ্বংস প্রভৃতি— লিখিবার বিষয়ের অভাব কি? কিন্তু লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে একজন অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের কথা। তিনি এখনো লিখিতেছেন। তাঁহার দুইটি লেখা সম্প্রতি গুণানন্দ পড়িয়াছে এবং সে সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইল।

বুদ্ধের নাম প্রমথনাথ বিষ্ণী। বুদ্ধকে বহুদর স্বামীজন সাধারণত এড়াইয়া চলে। তিনি যাঁহা লিখিয়াছেন তাহা বাংলার ছাত্রেরা পড়িলেও পড়িতে পারেন কিন্তু অল্প কেহ পড়ে না কারণ তাহা প্রগতিবাদী সাহিত্য নয়। তাহাতে প্রগতিবাদীরা আপমার্তা ছাপ দেয় নাই। বহু লেখক প্রগতিবাদীদের আপনজন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ববিদিত। কিন্তু রায় সত্যই কহিয়াছেন কি বিচিত্র এই দেশ। প্রমথবাবুর শিক্ষা শাস্তিনিকেতন এবং কলিকাতায়। তাঁর শিক্ষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশ্রমশুলকে প্রমথনাথ গুরু বলিতেন, কিন্তু তাহাতে গুরুর নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনা কদাচ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুত স্বল্প দৃষ্ট প্রমথনাথের একটি বিশেষ আদরণীয় গুণ। তিনি স্পষ্টতই বস্তুমতের গুণগ্রাহী এবং তাঁহার সাহিত্যসাধনায় বস্তুমতের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার মতে মধুসূদনের কবিপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের তুল্য। তাঁহার মতে বঙ্গসাহিত্যের পঞ্চদিকপাল রামমোহন, বিজ্ঞানগণ, বস্তুমত, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ। প্রমথনাথের অসংখ্য লেখায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রহিয়াছে। গুণানন্দ সম্প্রতি যে পুস্তকটি পড়িয়াছে তাহার নাম 'বঙ্গভঙ্গ'। মনের অগোচরে পাপ নাই। পুস্তকটি পড়িবার আগে গুণানন্দের সন্দেহ ছিল এই বুদ্ধবয়সের রচনাটি ভালো লাগিবে কি না। কিন্তু পুস্তকটির শুরু হইতেই কোনো সংশয় রহিল না। বঙ্গভঙ্গের কিছু অংশে কাহিনীর শুরু এবং শেষ বঙ্গভঙ্গের কিছু পরে। ঘটনাস্থল কলিকাতা এবং উত্তরবঙ্গের কোনো এক শহর। উপস্থাসে কাল্পনিক এবং ঐতিহাসিক দুই প্রকার ব্যক্তিই স্থান পাইয়াছে। আছেন সরেন্দ্রনাথ, আছেন আশুতোষ আর আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ ভাবে প্রতিভাত। প্রমথনাথের লেখনীর সুন্দরায় তাঁহাদের বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শ আমরা বৃত্তিতে পারি। অল্পদিকে আছে সেইযুগের মধ্যবিত্ত মাছ, নিম্নবিত্ত মাছ, সাধারণ মাছ এবং অতি নিম্ন হস্তে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি নারীচরিত্র। সর্বোপরি পাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমরকার উদ্দীপনার একটি চিত্র। গুণানন্দকে প্রগতিবাদীর শত্রু বলুন গুণানন্দের আঁসে যায় না। গুণানন্দ নির্লজ্জভাবে জাতীয়তাবাদী। তাহার

মনে আত্মজ্ঞাতিকের স্বর কোনোভাবে দাগ কাটে না কিন্তু বন্দেমাতরম গান তাহাকে উদ্বিগ্ন করে। স্মরণ্য যে যুগে এই গান মাছের মুক্তিময় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল সে যুগের বর্ণনা তাহাকে উদ্দীপিত করে। এমন একদিন বঙ্গদেশে ছিল যেদিন সমাজের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন একজন বিজ্ঞানীয় শিক্ষক, তাঁহার চরিত্র মাছকে সাহস দিত, চরিত্রগঠন করিত, গুণানন্দর সে কথা মনে পড়িয়া গেল, এই পুস্তকের একটি চরিত্র অবিনাশকে দেখিয়া। অসাধারণ সাহসী ছোটখাটো এই মাছটির কার্যে কোনো উল্লেখ নাই। আছে শুধু অসাধারণ মানসিক জোর এবং অদম্য উৎসাহ। গুণানন্দর অসাধারণিক দৌড়াণ্য তাহার জীবনে এইরূপ কিছু ব্যক্তিকে ঘটকে দেখিয়াছে। অবিনাশ চরিত্র পড়িতে পড়িতে গুণানন্দর মন দুঃখে ভরিয়া গিয়াছিল। বঙ্গদীন তাহাদের দেখি নাই। সেইরূপ ব্যক্তি এই কালে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

'বঙ্গভঙ্গ' একটি কালের ইতিহাস। হয়তো সেই কালটি গুণানন্দের অতি প্রিয় তাই সে মুগ্ধ হইয়াছে। হয়তো পুস্তকটি পড়িয়া গুণানন্দ যতটা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে অতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশের যোগ্য নয়। পাঠক, তুমি পুস্তকটি সংগ্রহ করিয়া পড়িও এবং মতে না মিলিলে গুণানন্দকে জানাইও।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে ইতিহাস পাঠ সম্বন্ধে জনৈক বামপন্থী অধ্যাপক কিছু সূচিস্থিত মত দিয়াছেন। গুণানন্দ তাহা পড়িয়া হতশ হইয়াছে। অধ্যাপক মার্কসবাদ শিক্ষাদান যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন ভারতের ইতিহাস শিক্ষায় সে উৎসাহ গুণানন্দ লক্ষ্য করে নাই। অপিচ গুণানন্দ দেখিয়াছে যে প্রগতিবাদীরা ইংলও-আমেরিকায় শিক্ষাদান করে। ইংরাজ সরকার যতদিন আছিল ততদিন এইসব প্রগতিবাদীরা ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরি লইতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। পরে ইহার নিরস্তর এই দেশ হইতে ভারতীয় ভাবধারা উচ্ছ্বল করিয়া দেশে বিদেশী ভাব প্রতিষ্ঠার অতীব অগ্রণী। গুণানন্দ দেখিয়াছে ইহার অতি সংঘবদ্ধ। সংঘবদ্ধভাবে ইহার কুংসা রটনা করে। বস্তুত কুংসা রটনায় ইহাদের পারদর্শিতা বিশ্বাকর। তজ্জন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতেও ইহাদের জুড়ি মিলা ভার। গুণানন্দ শুনিয়াছে সত্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করিতে কোনো কোনো দেশে পুরাতন সংবাদপত্রের নূতন সংস্করণ বাহির হয়। ইহা সত্য না মিথ্যা প্রচার বলিতে পারি না। একপক্ষে দেখিতে পাই প্রত্যাচার অধিকরণ— নির্লজ্জ এবং অসংসারমুগ্ধ কিছু যুবক-যুবতীরা মাছে বইবার উদ্রগ বাসনা, অপরদিকে রাজনৈতিক আক্রমণ। জুই দল কখনো

যুগ্মমান কখনো সহযোগী। ইহারা ভারতের কোনো গুণ দেখে না। ভারতীয় বলিতে ইহারা লজ্জা বোধ করে। সর্বদাই বিদেশকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। শ্বেতচর্ম বিদেশীদের প্রতি বহুবাসী তথা ভারতবাসীর বড় স্নেহ। তাই তাহাদের অহংকরণ করা তাহারা পবিত্র কর্ম মনে করে।

গুণানন্দ তাহার স্বদেশকে ভালোবাসে। তাহার সমস্ত দোষ লইয়া ভালোবাসে। কোথায় কোনো দেশ ছিল বা আছে যাহার কোনো দোষ নাই? হুতরাং গুণানন্দ ভারতপ্রেমে মাতোয়ারা। যে দেশে ভারতীয় ভাবধারার স্বপক্ষে কোনো বাক্যই ফাপিস্ত বলিয়া অভিহিত করা ই নিয়ম সেখানে সমস্ত রকম বিপদ অগ্রাহ করিয়াও ভারতীয় ভাবধারা তুলিয়া ধরিতেই হইবে। বিদেশী ভাবধারার অহংবর্তী ইহারা বিদেশী অজ্ঞানে পুষ্ট হওয়া অপেক্ষা স্বদেশের জয়গান করিতে করিতে রেশ বরণ করাও অধিকতর কাম্য।

গুণানন্দ এই পৃথক্ লিখিয়াছে যখন তখন তাহার দুইজন প্রীতিভাজন ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। দুইজনকেই গুণানন্দ বিশেষ ভালোবাসে। তাহারা 'বিভাব' কাগজের প্রশংসা করিল। তাহার পর গুণানন্দের লেখা পড়িয়া বলিল 'গুণানন্দের কপালে কারাগার নাচিতেছে।' তাহার পর দেশে কেন বামমার্গ আসিয়াছে সে সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। গুণানন্দ বান্ধবপ্রিয় হুতরাং বক্তৃতা দুইটি মনোযোগ সহকারে শুনিল। কিন্তু তাহার বক্তব্য বদলাইবার প্রয়োজন দেখিল না।

ভারতবর্ষের শতকরা ষাট ভাগ ব্যক্তি অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে শতকরা একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগত আয়করের আওতায় পড়ে। ইহা সত্যই দুঃখের। ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণ তাহাদের দুর্দশা হইতে মুক্তি পাইতে পারে এমন কোনো সুনিশ্চিত পথ থাকিলে বৃড়া গুণানন্দের তাহা লইতে বিন্দুবাঞ্ছা নাই। বাম মার্গ, দক্ষিণ মার্গ, হিন্দু মার্গ, মুসলমান মার্গ, সাই মার্গ, আনন্দ মার্গ, অববৃথ মার্গ, যে-কেহ দারিদ্র্য দূর করিতে পারিলে তাহাকেই গুণানন্দ সাদরে গ্রহণ করিলে। কিন্তু কে বলিতেছে সে পারিলে? কে চেষ্টা করিয়াছে। বুদ্ধদেব যে চারিজন লোককে দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন দরিদ্র জরাগ্রস্ত অস্থূল ব্যক্তি ছিল। তাহার পর দুই হাজার পাঁচশতের বেশি বৎসর অতিক্রান্ত, আজও দরিদ্র এবং দারিদ্র্য বিরাজমান। আজি অবশু কেহ তাহার কারণে সংসার ত্যাগ করে না।

পৃথিবীর বহু দেশ হইতে দারিদ্র্য অপগত হইয়াছে। সেইরূপ দুই-একটি দেশ গুণানন্দ তাহার বিস্তৃত জীবনে পর্যবেক্ষণ করিয়াছে। গুণানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস কোনো মার্গই মাহংকে অভীষ্ট লাভ করিতে সাহায্য করে না যদি না সে দেশের জনসাধারণ সচেতন হয়। আমাদের দেশের কিছু বিশেষ বুদ্ধিবাদীর ধারণা কোনোরকমে একটি পরিবর্তন আনিলেই জাহ্নবীতে সমস্ত সমস্ত সমাধান হইয়া যাইবে। গুণানন্দের মনে পড়িতেছে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে মাহংয়ের ধারণা ছিল ইংরাজকে তাড়াইতে পারিলেই দেশে দৃঢ়-যুতের বস্তা বহিবে, অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া খাইবার কোনো বাধা থাকিবে না।

বুড়ার অনেক দোষ। প্রথমতঃ হইতে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি। প্রকৃত কথা হইল দেশপ্রেম বড় চিন্তাশুদ্ধকারী। দেশকে উন্নত করার চেষ্টা বড় হৃদয়গ্রাহী। অন্ধ পশ্চিমী ভক্তি এবং অন্ধ বাম বা দক্ষিণ মার্গের প্রতি ভক্তি আজ দেশবাসীর শিক্ষিত অংশকে দেশবিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। গুণানন্দ প্রহর গুণিতেছে কেবল আবার স্বদেশপ্রেমের প্রাবল্য আসিবে। সেই প্রাবল্যে খড়্গ-কুটার-স্ত্রায় এইসব পদলেহীর দল ভাসিয়া যাইবে। সেদিন যে অগ্নি জলিবে তাহাতে আমরা শুদ্ধ হইব, পবিত্র হইব। সেদিনের মাহং অবাক বিশ্বাসে ভাবিবে কি করিয়া আমরা স্বদেশকে তুলিয়া ছিলাম। গুণানন্দ হির নিশ্চিত সেদিন আসিতেছে।

বাহুদেব দেবের কবিতা

সন্তোষ চক্রবর্তী

একটি গুলির শব্দে / রৌদ্রের ভিতরে চিঠি / রাঙা সখী ভালো থাকো / তোমার ঘুঙুর। না, কোনো কবিতার কয়েকটি চরণ নয়; বাহুদেব দেবের এ পর্যন্ত প্রকাশিত চারখানি কাব্যগ্রন্থের নাম। গুলির শব্দ থেকে ঘুঙুর—হাতের মুদ্রা থেকে পায়ের আশ্রয়। নত হচ্ছে কবিতা। আর নতি মানেই তো গভীরতা; বলা যায়, কেন্দ্রাহুতা। কোনো কবি যতক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রে না যেতে পারেন, এককভাবে এবং সামগ্রিকভাবে, ততক্ষণ তাঁর না থাকে শান্তি, না সার্থকতা। কেননা, আদিতে এবং অন্তে, কবি হলেন জীবনের রূপকার, ভাষ্যকার। আর জীবন যদি আশিকড় বিহীন না হয়, কবিতা, বা জীবনের আধারভিত্তিক এবং বহুমুখী জীবনভিত্তিক, গুণ্ডা ও আংশিকতা-আশ্রিত দুই গ্রন্থের শিকার হয়ে পড়বেই। জীবন অর্থাৎ অস্তিত্বের নানা অহুত্ব, অভিঘাত, উচ্চাচতা এবং উত্তরণ।

বাহুদেবকে 'বাতিনেতা ঘর কার জলভরা চোখ / নিরতির মত শুধু ডেকে নেয়।' কখনো তাঁর 'অঞ্জলি দেওয়া সাদা ফুল অবহেলায় ভেসে যাচ্ছে।' কখনো তাঁর 'সিঁড়ির কাছে অজস্র চিঠি জমে ওঠে/কিন্তু পথ রেখা নয়।' বাহুদেব দুঃখে মুখর হয়েছেন, আবার প্রার্থনায়-ও। স্বতি, আতি, পিপাসা, ক্লোশ, আশা—সবই তাঁর কবিতার বিষয় আশ্রয়। জীবনের আতপ্ত পথে, বিরোগাঙ্ক দুঃখমালার পটে ব্যক্তিগত আশক্তি জড়ো করে ছর্ব্বার ছড়িয়ে যেতে চেয়েছেন একাধিক কবিতায়। 'বান্ধির ভিতর থেকে জলের হৃৎস্পন্দন শুনবার জ্ঞান মরিয়া' হয়ে উঠেছেন বাহুদেব। জীবনের ভিতরে থেকে নির্বাসনের কতোটা তিনি বারবার প্রত্যাহ্বান করতে আগ্রহী। দুঃখে ভেঙেছেন, কিন্তু প্রসঙ্গহীনতার দিকে যাত্রা তাঁর থামে নি। এর নাম রোমাটিকতা। যা

জীবনচেতনায় উন্মুখর, বা পারিপার্শ্বিকতার ভেলায় উঠে পরাজয়ের চেউগুলো গুঁড়িয়ে তীব্র, সমর্পিত প্রয়াস।

পরবর্তী পর্যায়ে বড়ো ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে বাহুদেবের প্রেমের রক্তাভার। 'রাঙা সখী' সেই রেশহীন বিসৃষ্ট প্রেম যার উপহার হলো 'বহুশাভরা রাত/স্পর্শ-হীন দুঃখের উৎসব।' নিটোল ভালোবাসার মধ্য উচ্চারণে বাহুদেবের লেখনী যে কত উজ্জল, কত গহন হতে পারে তার প্রমাণ এই বইটির ছত্রে ছত্রে শব্দিত বিধৃত হয়ে আছে। যাবতীয় শাহরিক তথা জাগতিক অস্তিত্বের মধ্যে নারীর ভালোবাসার খাদ কত নিপুণ সহজ ব্যক্তিত্বকে অতীন্দ্রিয় উর্ধ্বলোকে ডানা মেলতে সাহায্য করে, বাহুদেব যেন তাঁর সমস্ত চেতনা-গভা-দৃষ্টি দিয়ে তা একান্তভাবে বুকে নিয়েছেন। তারপর সেই সার্বিক ক্ষটিক নিংড়ে ছোটো ছোটো কবিতার নদী এঁকেছেন। লৌকিকতা অলৌকিকতার বাহুদেব লেখেন, 'সেই বিবে প্রিয়সখী বেঁচে থাকি উত্তরচলিশে।' বিচ্ছেদভাবনা কবিকে নিঃসন্দ্ব করেচ্ছে শূন্য নয়, বেঁচে থাকার অস্ত্র নতুনতর এক তাৎপর্য দিয়েছে। বাহুদেবের শীলিত মননে 'কয়েকটি উড়ে যাওয়া দিন' এমনভাবে ধরা পড়েছে যার ফলে কিছুই ওড়ে নি যেন, কবিতার বিঁধে আছে চোরকাটার মতো।

বাহুদেবের কবিসত্তাকে স্বভাবতই আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের কিছুটা পরিচয় যদি পাওয়া যায়। যেটুকু দেখেছি, বাহুদেবের আছে এমন দেখা ও বুদ্ধি যা প্রচারপক্ষী নয়, অথচ সচেতন, সমালোচনাশীল। আর আছে নতুন ছুরির মতো উজ্জল হৃদয়, স্বচ্ছ বিবেক ও পরিশুদ্ধ চিন্তা যা ব্যতিরেকে কবিমানস কখনো গতিশীল, সৃষ্টিশীল হয় না। বাহুদেবের কথোপকথনে প্রচেষ্টার ছাপ নেই, আছে আন্তরিকতার। তিনি আত্মবিশ্বাসে নাছোড়, কিন্তু নাটকীয় নয়। মেজাজটি শান্ত, স্বয়ং অশান্ত। তাঁর কবিতায় এসবের অনিবার্য প্রতিকলন দেখা যায় দুটি ছত্রের ভিতরে ভিতরে।

কিছুই যেমন থেমে থাকে না, না নদী না মেঘ, বাহুদেবও কোথাও থামকে যান নি তাঁর সৃষ্টিতে। তিনি এগিয়ে গেছেন আত্মগত বিলাসপরায়ণতা থেকে পরিবেশমনন আত্মলুপ্তায়। ব্যক্তি থেকে নির্বাক্তি, বিষাদ থেকে অস্থিরতা, আবেগ থেকে মনন। কবির নিজস্ব ভ্রমণপথ এই মানচিত্রে রেখায়িত। আসলে কবি নিজেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন নিদারুণভাবে। হয়তো বা কিছুটা রানিবিবর্জিত নিষ্ঠুরতা নিয়ে। এবং সার্থক হয়েছেন ফসলে,

উপহারে। সবসময়ে না হলেও, বাহুদেবের এখনকার অধিকাংশ কবিতা একরাশ মেঘের মতো ঘনিয়ে আসে আর তার প্রচ্ছায়ায় সময়, সত্তা, স্বদেশ, স্বকালকে কিরকম স্থির বিভায় অমলিন দেখতে পাওয়া যায়। দৈনন্দিনতা তাকে এক বিরুদ্ধ মেজাজে গড়ে, সৈনিকের নিবন্ধ চোখে অক্লান্তি যেতে চাওয়া বস্তুর আত্মায় তাকে চিত্তাক্রান্ত করে। বাহুদেবের লেখায় জ্বলের চেতনা বারবার ফিরে আসে; তিনি সত্যের খোঁজে নিজের প্রতি নির্দেশ পাওয়ার জ্ঞান কখনো সত্যের কখনো দাপটে প্রয়াসী হন। বয়সের আঁকবুকি স্মরণে রেখে তাঁর কবিতা উদ্বেগহীন নাগরিকতার বেড়া ভিত্তি রেখে যেতে চায়, যায়। শতাব্দীর স্কলকালি, গ্রীষ্মের সন্তাপ ছিঁড়ে ফেলার সময় ঘোষণা করেন স্পষ্টভাবে এবং সেইসঙ্গে ঘুমোনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা। নতুন নিমিত্ত নয়, আগুনের কোনো ঘুম নেই। বাহুদেবের কবিতায় এই বিনিমিত্ত বিশ্বাস ও বলিষ্ঠতা আমাদের প্রাণিত করে। দৃষ্টকে, বস্তুকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে তুলামূল্য বিচারে উদ্দীপনা খোঁয়ায়।

নিচে প্রকাশিত ছটি কবিতায় বাহুদেব আরো বুদ্ধিগ্রাহ্য সম্মুখে তৃতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা এবং প্রতীতি-অল্পভূতি বাণীবদ্ধ করেছেন। প্রেম থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন এক ভাসমান পাহাড়ে যেখান থেকে আয় ও আচারের খোলাস ভেঙে সত্যসত্যের বিশ্লেষণ সম্ভব। তাঁর লেখায় বয়সের ছাপ পড়ছে অর্থাৎ প্রজ্ঞামিশ্রিত কালিতে জীবনায়নের, ক্রান্ত দর্শনের প্রকাশ ঘটছে। তাঁর কবিতায় এক ধরনের তীব্র সং আসক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যার ত্রিসীমানায় চতুরতা নেই, মৃদতা নেই, নেই ব্যক্তিসাপেক্ষ আশা-আশঙ্কার রোমন্থন। সামান্য, অনেকটা ঘরোয়া ভাষায় অসামান্য চিত্রকল্পের কাঁধা তৈরি করেন তিনি অনায়াসে, শুচিবাহুহীন, সংশয়হীন, নিষ্ঠূর। বাহুদেবের কাব্যচর্চা এই স্বকীয়তায় এক নিঃশব্দ অভিযান।

বাহুদেব দেবের ছয়টি কবিতা

জানশোনা

পাপোশটি মুছে নিল ধুলো, চেয়ারও নিঃশব্দে নিল
শরীর ভঙ্গিমা
ছপুর পিপাসাটুকু দেখে দেখে গেলোশের জল

আলমারি গিলে খায় শরীর পদবী, চেটে খায় নির্জন সাবান
জলন্ত তামাক তার ভিতরে ঢুকেছে

কিছুটা ভিতরে ডাকে ঘরবাড়ি, নারী
থাকে থাকে সাজানো রয়েছে তার মরণশীলতা
পথ তাকে নিয়ে হাঁটে

পোষমানা শিকিত কুকুর
তারপরও কোনো কোনো দিন
ছাইদান-প্রত্যাহ্বাত দেশলাই কাঠি
গোটা ছই পড়ে থাকে বিছানার সমান্তরাল
তারো কিছু বেশি জেনেছিল?

বাধানো দাঁত

একদিন তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম খুব
তোমার চুল ঠোট চোখ স্তনসন্ধি... সব
এখন তোমাকে আর চেনা যায় না, সব দাঁত পড়ে গেছে
তোমার কি অস্থখ আমি জানি না, কিন্তু তোমার অস্থখকেও
আমি ভালোবেসেছিলাম একদিন

তোমার দাঁত নেই, দাঁতের ফাঁকে স্থপূরির টুকরো
রাতের গল্প কিছু নেই, ছিল একদিন এখানে
চশমার পেছনে আমার অন্ধুরান পিকনিক ঝিকমিক বেলো

বাঁশপাতার মতো হালকা এখন ইচ্ছে টিচ্ছে উড়ে যাচ্ছে
দমকা হাওয়ার, অক্ষর-হারা সাদা কাগজ, অকেজো ছেঁড়া চটি
সিঁড়ির কোণে থম্ব অন্ধকারে ইঁদুরের ঘোরাকেরা
টেলিফোনের ওঙ্কারে এখন তোমাকে ডাকি

স্বপ্নমহীন ভালোবাসার জ্ঞান কাটা হচ্ছে বিছানার চাদর
আজ তোমার মধ্যে আমার এক টুকরো, 'আমার মধ্যে তোমার
বাধানো দাঁতের মতো খুলে নেবো, একটু লাগবে না

চাকা

গাড়ির চাকায় ব্রহ্ম পাছের পাতায় স্থির
 তুমি ব্রহ্ম সর্বস্ব আমার, তুমি পথ তুমি পথ হাঁটা
 কম্পাশের কাঁটা বৃকে নিয়ে মন্দির ও স্তম্ভিখানা
 মধ্য বয়সের সব বাধ্যতাহীন ছুঁথের সিদ্ধক
 চুম্বন মতন তুমি অহুচ্ছিত, লিঙ্গহীন পক্ষপাতহারা
 জব্ব্বু ইন্ডিয়ট, বাসস্টপে অনন্ত প্রতীক্ষা প্রতিদিন
 ব্রহ্মের মাজিতে কোনো দাঁত নেই, ব্যথা নেই অথবা দংশন
 ছায়াপথে মাঝে মাঝে কাশফুল মেঘের চামর

ভুলের ভিতর থেকে জেগে উঠে
 বালকের রাঙা ঘুড়ি যে রকম আকাশকে জানে
 ওমলেটে মরিচে হুনে, ধাতুতে রবারে, সে রকম হলো খেলাধুলা
 কাটাকুটি চোঁচির পিপাসা কষ্ট তীব্র অপমান
 তুমি ব্রহ্ম সর্বস্ব আমার, মধ্যরাতে বরচিত গান
 তোমাকে দিয়েছি সব চালকুমড়া, খেলার টিকিট
 অসংলগ্ন আমি তবে কার ?

ইপি

আকাশের উঁচু ডালে লটকে আছে
 তালপাতার এক টুপি
 নিচে ডাস্টবিনে বুক খোলা লাল বল
 অদ্বিত বন্ধুদের মধ্যে ডাঁই হয়ে উঠেছে চৌদিক
 পোয়াতি পেটের মতো, প্লাস্টিক টিনের টুকরো
 ছেঁড়া ত্যানা কংক্রিটের চোপা অভিমানে

হাওগা উঠছে এর মধ্যে, ফিরে যাচ্ছে গাড়ি ও মাহুস
 অথচ শেকড় নেই বলে উড়ে যায় বেরাদপ টুপি
 তারও ওপরে গুঁড়ে আলুখালু মেঘের কুমাল
 বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হতে পারে

গোড়ালিতে কাদা, ভিজে মাটি শুঁকে শুঁকে
 চলে যাচ্ছে শহরতলীর পথ, ঐ পথে একদিন
 উদ্ভুদ্ধ অকেজো টুপি খুব মজা করেছিল মেলায় মিছিলে
 মাথার ওপর আজ আলুখালু মেঘ
 বাড়ি ফেরার টান
 হাওগা উঠছে
 বৃষ্টি হবে একুনি

পুড়ে যচ্ছে

গর্জন চিংকার নেই মুঠো হাত সশব্দ ভাঙচুর
 কিছু নেই

তীব্র অপমানে নীল পুড়ে যাচ্ছে শঙ্খিনী পৃথিবী
 খণ্ডা চটি ঘাম জামা দেশলাই কিছু টুকিটাকি
 পুড়ে থাকে, সাপের খোলস যেন
 ফেলে গেছে সব

ট্রাফিক মথিত পথ বিজ্ঞাপন স্তম্ভিখানা
 গম্ভীর লাইব্রেরি

ঐ পড়ে আছে

শেষ টুকরো সিগারেট আগুনের মূর্খ সন্তাষণ
 আধ টুকরো বাসের টিকেট

ভুলভাল

সব অগোছালো পাণ্ডুলিপির মাঝখানটিতে
 সেজেগুজে বসে আছে আমার প্রথম প্রিয় ভুল
 ঐ পেয়লা পিরিচ হুনদানি, ভেলের গন্ধমাখা বালিশ
 সব-কিছুর সঙ্গে বড়ো আদরে জড়িয়ে আছে
 আমার প্রথম প্রিয় ভুল

আজ খুব সতর্ক সিঁড়িওলো তোমাকে এগিয়ে দেবার জন্ত
নেমে যাচ্ছে মাঝরাতে

এলোমেলো উড়ছে বিরল আরশোলা, কাগজের টুকরোর অসমাপ্ত ঠিকানা
পড়ে আছে বোকা প্রৌঢ় চশমার খাপ

ওরা তোমাকে খুঁজছে ঐ যুগ্ম লাগানো বকলশ,

উসখুস দেশলাই কাঠি, কেরোসিন

আর শুকনো শিরিঙ্গে ডালের মতো আমার এই অবিশ্বাসী আঙুল

প্রবন্ধ

কার্মাইকেলের চোখে রামকৃষ্ণ মিশন

লাডলি মোহন রায়চৌধুরী

রামকৃষ্ণ মিশন একটি ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-
রক্ষার কয়েক বছর পরেই ১৮২৭ সালের ১লা মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত
বলরাম বহুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক পরিকল্পনাটি
গ্রহণ করা হয়। ১৯০৬ সালে মিশনের জন্ম একটি আলাদা শাসনবিধি বা
কনস্টিটিউশন রচনা করার প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং এই কাজ সম্পূর্ণ হলে ১৯০৯
সালের ৪ঠা মে তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনকে আইনানুগ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করা
হয়। মিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে এটিকে রাজনীতির সঙ্গে সকল রকমের
সম্পর্ক বা ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। বলরাম বহুর বাড়িতে
মিশন প্রতিষ্ঠা করার জন্ম যে ছয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার সর্বশেষ ধারায়
এ কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয় যে, যেহেতু ধর্ম এবং মানব-হিতৈষী
মিশনের মূল আদর্শ, সেই কারণে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির কোনো
সম্পর্ক একেবারেই রাখা হবে না— “The Aims and Ideals of the
Mission being purely spiritual and humanitarian, it would have
no connection with politics.”^১ পরবর্তীকালে এই ধারাটির উপর বিশেষ
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বঙ্গভঙ্গজনিত সরকারি আদেশ জারি হওয়ার পর,
বাংলাদেশে যখন ইংরাজ-বিরোধী রাজনীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেই
সময় মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো ব্যক্তিকেও রাজনৈতিক কারণে
গনদেহের চোখে দেখা হয়েছিল। এর ফলে মিশন-কর্তৃপক্ষ কিছুটা শঙ্কিত
হয়ে উঠেছিলেন এবং এ ব্যাপারে যথাবিহিত সাবধানতা অবলম্বনের জন্ত,
ঊঁরা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে
ভবিষ্যতে মিশনের সদস্য হিসাবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। পরিস্থিতি
সিদ্ধান্ত অস্থায়ী মিশনের সদস্যপদপ্রার্থী সকল ব্যক্তিকেই অতঃপর এই মর্মে

ঘোষণা করতে হত যে, কোনো রাজনৈতিক বা অল্প কোনো গোপন সংগঠনের সঙ্গে তার কোনোরকম যোগাযোগ নেই। ঘোষণাপত্রের ইংরাজী বয়ানটা ছিল এইরকম: "I also declare that I have no connection whatever with any political or secret body." ১৯১১ সাল থেকে মিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল লোকের কাছ থেকে এই রকম স্বীকৃতিপত্র গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, সদস্যভুক্তির ব্যাপারে এই নতুন নিয়মটি মিশনের গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে লিখিতভাবে কোনো সময়েই সংযোজন করা হয়নি। ১৯১৩ সালের প্রথম মিশন রিপোর্ট বা তৎপরবর্তী সময়ের অল্প কোনো প্রতিবেদনেও উপরোক্ত নিয়মটি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ চোখে পড়ে না।

কিন্তু রাজনীতিকে এড়িয়ে চলার এইরকম প্রকাশ্য চেষ্টা সত্ত্বেও, মিশন রাজনীতির দায় এড়াতে পারেনি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বারে বারেই মিশনকে ইংরাজ-বিরোধী রাজনীতির দায়ে অভিযুক্ত করে নানারকম গোপন রিপোর্ট সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পেশ করেছিল। এইসব রিপোর্টগুলির মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল স্ফারিনটেক্ট অর চার্লস টেগার্টের লেখা ১৯১৪ সালের ২২ এপ্রিল তারিখের রিপোর্টটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।^{১০} মিশনের তরফেও এই সকল অভিযোগগুলি খণ্ডন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ১৯১৪ সালে ৮ এপ্রিল তারিখে কলকাতার 'দি ইংলিশমান' নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে মিশনের তৎকালীন সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেন। সরকারি কর্তৃপক্ষের অহরোধেই এই বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়ে এবং এই বিবৃতির মাধ্যমে স্বামী সারদানন্দ, মিশনের নাম ভাঙিয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে রাজনীতির কাজে লিপ্ত না হতে পারে সেই মর্মে সকল শ্রেণীর নাগরিককে সাবধান করে দেন। সারদানন্দের উল্লিখিত বিবৃতিটি সরকারের মনোপূত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কিন্তু কখনোই মিশনের উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। মিশনের মফস্লে আশ্রমগুলির উপর গোয়েন্দা বিভাগ বরাবরই সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলত এবং এইসকল আশ্রমগুলিকে সম্ভাব্যদী প্রচারকর্মী চালাবার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হত বলে তারা সন্দেহ করত। বঙ্গতপক্ষে মিশনের সম্মানসিগণ যে নানাভাবে ইংরাজ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ সন্দেহ ১৯০৫ সাল থেকেই পুলিশের মনে ঊক দিতে থাকে। ১৯১১ সালের ৬ই অগাস্ট তারিখে গোয়েন্দা বিভাগের তৎকালীন পড়ো কর্তা এফ. সি. ড্যালি

বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট সরকারের উচ্চ মহলে পেশ করেন। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বয়স্কট আন্দোলনের উদ্ভোক্তারা ১৯০৫ সাল থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন ও আর্থ সমাজের সম্মানসিগণের সহায়তায় দেশের সাধারণ মানুষকে বিলাতি পণ্য বর্জন করার জন্য আহ্বান জানান। মিশনের ফেলুড মঠটি যে বিপ্লবীদের গোপন সমাবেশের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হত এ কথাও ড্যালির অজানা ছিল না। রিপোর্টের এক জায়গায় ড্যালি স্পষ্টতই অভিযোগ করেন যে, মিশনের বড়ো বড়ো সম্মানসিগণ, মিশনকে প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে না চাইলেও তাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটিকে বরাবরই রাজনীতির কাজে অল্প-বিস্তর ব্যবহার করা হয়ে এসেছিল।^{১১} অর্থাৎ সরকারি কর্তৃপক্ষ মিশনের জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন এবং এই অস্বাভাবিক ও অভিযোগের ধারা পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কিন্তু মিশনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের যত অভিযোগই থাকুক-না কেন, তাঁরা এ সব নিয়ে কখনোই প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন নি। অভিযোগগুলি প্রধানত পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগের গোপন ফাইলেই নথিভুক্ত করে রাখা হত। মিশনের ধর্মীয় চরিত্র এবং জনপ্রিয়তার কথা মনে করিয়ে হয়তো কর্তৃপক্ষ এটিকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করতে সাহস পান নি। কিন্তু এই মনোভাব বেশিদিন ছিল না। ১৯১৬ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার রাজভবনে আয়োজিত দরবার বক্তৃতায় সর্বপ্রথম মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনা হয়। বক্তৃতা করেন বাংলার লর্ড লর্ড কার্ণাহিলেক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য যে ভারতরক্ষা আইন পাস করা হয়েছিল (১৮ মার্চ ১৯১৫) তার সূচক যুক্তি বিস্তার করাই ছিল দরবার বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য এবং সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বড় লর্ড মিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি কতকগুলি অভিযোগ দায়ের করেন। এইসব অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মিশন-কর্তৃপক্ষও লিখিতভাবে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। এইভাবে অভিযোগ এবং প্রত্যাভিযোগের মহড়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই রীতিমতো উদ্বেজনা বোধ করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে দরবার বক্তৃতার এই অংশটুকু সম্পর্কে আহুপূর্বিক আলোচনা করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

কার্ণাহিলেকের বক্তৃতায় ভারতরক্ষা আইনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল তা জানতে হলে সে

গণের ক্রিয়াকলাপগুলিকে নিষ্কণ্ট ধরনের অপরোধ বা ক্রাইম হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, যদিও এই সকল ক্রাইমের কাজে যারা লিপ্ত আছে তাদের অনেক খবরই পুলিশের জানা তবুও রাষ্ট্র ও জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে এদের সম্পর্কে সকল কথা আদালতে মামলা চলার সময় পুলিশ খোলাখুলি প্রকাশ করতে পারে না। ফলে অনেক সময় আইনের নানা ফাঁকে এরা আদালতে রেহাই পেয়ে যায় এবং এইভাবে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার জন্ত অপরোধমূলক কাজে এরা উত্তরোত্তর উৎসাহ বোধ করতে থাকে। এদেরই দমন করবার জন্ত ভারতরক্ষা আইন বলবৎ করা হয়েছে।

সদ্বাসবাদীগণের কর্মপ্রণালী এবং সাংগঠনিক ধারা সম্পর্কেও কার্মাইকেল একটি বিস্তৃত বিবরণী পেশ করেন। তিনি বলেন যে, এই সব রাজনৈতিক অপরোধসমূহের কাজে সাধারণত দুই ধরনের লোক লিপ্ত থাকে। এক দল এই সব গোপন সংগঠনগুলির মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ তারা নিজেরা সশরীরে কোনো হুঁকির কাজ না করে, দলের অত্যাচারের দিয়ে সেই সব বিপজ্জনক কাজগুলি করাবার জন্ত পরিকল্পনা রচনা করে দেয়। আর একদল লোকেরা নেতাদের পরিকল্পনা মতো নিজেরাই এই সব বিপদসংকুল কাজ উদ্ধার করার জন্ত কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত ভাবপ্রবণ, অল্পবয়স্ক তরুণ, স্থূল কলেজের ছেলেরাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এই সব কাজে এগিয়ে আসে। এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়াও আরও এক দল অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের এবং স্থির মস্তিষ্কের লোক আছেন যারা বিপ্লবী দলে সদস্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। সমাজের সাধারণ মাত্রার চেয়ে এই সব লোকেরা কিছুটা আস্থা এবং শ্রদ্ধা অর্জন করে থাকেন। স্থূল কলেজের শিক্ষক হিসেবে বা অল্প নানা রকমের জনহিতরত্নর কাজে যুক্ত থাকার দরুন এঁরা অপরিণত বয়স্ক বালক এবং তরুণদের মনে সব চেয়ে কার্যকর ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বযোগ নিয়ে এরা ছেলদের মধ্যে সহজেই মিশে যেতে পারেন। তারপর ছেলদের দেশপ্রেম, পরার্থপরতা এবং মহত্তর মানসিক বৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে এরা তাদের এমন সব হীন এবং জঘন্য কাজে জড়িয়ে ফেলে যে সেই পাপচক্র থেকে তারা আর কোনমাদিনই মুক্তি পায় না। দলের কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই চক্রান্তকারী ব্যক্তির দেশের বৃহত্তরভিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল পথে টেনে নিয়ে যায় এবং এর পরিণাম ভূগতে হয় সেই সব সরলমতি অবাধ বালকদের কিংবা তাদের অসহায়

অভিভাবকদের, যারা কিভাবে তাঁদের সন্তানদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ভাবেই সাবধান হওয়ার স্বযোগ পান না।

কার্মাইকেল এই সব সদস্য-সংগ্রহকারী দলীয় নেতাদের বিক্ষুব্ধ ভীত ভাষায় বিবোদ্যার করেন। তিনি বলেন এই সব প্রাপ্তবয়স্ক নেতারা ই দেশের আসল শত্রু এবং এদের সম্পর্কে দেশের সরলপ্রাণ অধিকাংশ নাগরিককে তিনি সতর্ক করে দেন। দেশবাসীর প্রতি এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করার স্বজ্জৈ কার্মাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। দেশপ্রেমের ছল করে দেশের এই সব শত্রুরা কিভাবে কাজ করে তার বর্ণনা দিয়ে কার্মাইকেল একটি দীর্ঘ সম্ভবা পেশ করেন :

In attaining their end they use terrorism as well as persuasion, and I feel certain, I am sorry to say, that they often seize the opportunity which membership in a charitable society like the Ramkrishna Mission or participation in the relief of distress gives them to meet and to influence boys who have noble ideas, but who have not enough experience to judge where a particular course must lead.

অর্থাৎ, দল বাড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত “এই সব লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্ত অহরন এবং ভয় দেখানো— এই উভয়বিধ পন্থাই অবলম্বন করে থাকেন এবং আমি চুঃখিত চিন্তে বলছি যে আমি নিশ্চয় করে জানি যে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো একটি দাতব্য সংস্থার সদস্য হিসাবে বা জাগর্য্য পরিচালনার অঙ্গীকার হিসাবে তাঁরা যে সব অবকাশ পান তার পূর্ণ স্বযোগ তাঁরা বালকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, এমন সব বালক যাদের কাছে উচ্চ আদর্শ, কিন্তু যাদের এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই যাতে করে তারা বিচার করে বুঝতে পারে যে কোনো একটি বিশেষ পন্থা তাদের ঠিক কোন দিকে টেনে নিয়ে যাবে।”

মিশনের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিযোগদায়ের করার পর কার্মাইকেল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়টি বাখ্যা করতে উজত হন। তিনি বলেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো ধর্মীয় এবং দাতব্য সংস্থাগুলি স্বাভাবিক কারণেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মম আকর্ষণ করে থাকে, তাই বাপমায়েরা

সাধারণত নিজেদের সন্তানদের এই রকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে আগ্রহী করেন না। কিন্তু তারা যুগ্মকরেও টের পান না যে এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অবকাশে তাঁদের ছেলেরাও সকলের অলক্ষ্যে কীরকম ভুল পথে পরিচালিত হয়। এমন-কি ছেলেগুলি অনেক সময় নিজেরাও বুঝতে পারেনা যে তারা কী করতে চলেছে। কোনো কোনো সময় তাদের সামাজ্য সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগানো হয় এবং সেইমতো কাজ করতে গিয়ে তারা ক্রমে ক্রমে যখন দলের অনেক গোপন কথা জেনে ফেলে তখনই অকস্মাৎ কোন্ একদিন তারা উপলব্ধি করে যে কী সর্বনাশা কাজের জালে তারা জড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব জানতে পেরে তখন অনেকেই দল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অস্বীকৃত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন তাদের নানা ভাবে ভয় দেখানো আরম্ভ হয়ে যায় আর ভয়বিহীন সেই সব অবস্থায় বালক-গুলির তখন আর পিছনে ফেরার কোনো উপায় থাকে না। এইভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের দিয়ে নানা রকম অবস্থিত কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। সরল বিশ্বাস এবং ভক্তির আবেগে এই সব সরলমতি বালক যাদের বিশ্বাস করেছিল তারা এই শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে যায়। কার্মাইকেল এই সব ভক্তব্রশী শত্রুদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, “আপনারা যথার্থই দেশের প্রভুত উপকার সাধন করবেন যদি আপনারা সেই সব লোকদের বাধা দিতে পারেন যারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অপরিণামী ক্ষতি সাধন করার জন্যই বাবদার করে থাকে।” বক্তৃতার শেষে কার্মাইকেল প্রকারান্তরে এই ইচ্ছিত দেন যে ভারতরক্ষা বিধি প্রভৃতি আইনগুলি আসলে দেশের এই সমস্ত হীন স্বয়ংস্বকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্যই বলং করা হয়েছে। দেশের সরলপ্রাণ অল্প সাধারণ মানুষকে চক্রান্তকারী গুটিকার প্রাণি হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকার কখনোই অস্বীকার করতে পারে না এবং সেই কারণে প্রয়োজনমতো কঠোরতা অবলম্বন করাও একান্ত আবশ্যক।

কার্মাইকেলের দীর্ঘ বক্তৃতায় মিশন সম্পর্কে সারা সময় নানারকম তির্যক মন্তব্য করা হলেও, মিশনের নাম উল্লেখ করে মাত্র একটিকেই সরাসরি অভিযোগ পেশ করা হয়। আসলে মিশনের মতো একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সরকার পূর্ণ মাত্রায় অবহিত ছিলেন। তাছাড়া আরও অস্থিবিধে ছিল। অতীতে মিশনের বিভিন্ন ত্রাণকার্য সম্পর্কে পদস্থ সরকারি অফিসারগণ নিজেরাই নানা

রকম প্রশংসাত্মক মন্তব্য করে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের উর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ এমন কিছু মন্তব্য করতে পারেন না যার ফলে মিশন সম্পর্কে সরকারের পূর্বতন দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত ছিল বলে প্রমাণিত হয়। কার্মাইকেল তাই যথোচিত সাবধানতা নিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। মিশনের নামোল্লেখ করে একবার মাত্র অভিযোগ করার পরক্ষণেই তিনি অপেক্ষাকৃত মোলায়েম স্বরে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে মিশন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আশ্রয় অন্ত নেই, মিশনের নানা কল্যাণকর্ম দেশের যেকোনো লোকেরই সমর্থনলাভের যোগ্য। তবে তিনি নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে এ কথাও সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, হীন এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের কিছু মানুষও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের ঠেকাতে না পারলে যারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে উত্তোষী হতে পারত সেই যুব-সমাজের চিত্ত অচিরেই কলুষিত হয়ে উঠবে :

“I have the highest respect for the Ramkrishna Mission and for societies like it. I know of nothing more worthy of encouragement than the social service which these societies exist to promote, and there is nothing in India which I deplore more deeply, or of which it has been harder to convince me than the fact that mean and cruel men do join these societies in order to corrupt the minds of youngmen who would, if only they were not interfered with, be benefactors to their fellow countrymen.”

কার্মাইকেলের উপরোক্ত বক্তৃতা এবং মিশন সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা উল্লিখিত মহলে প্রতিবাদের তৃকান বইয়ে দিয়েছিল। কার্মাইকেলের বক্তৃতার তারিখ, ১১ ডিসেম্বর ১৯১৬। আর তার অনধিক দেড় মাস পরেই মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ এবং অগ্রান্ত বহু লোকের স্বাক্ষর সংবলিত একটি দীর্ঘ আবেদনপত্র ১৯১৭ সালের ১২ জুলাই তারিখে গভর্নরের অফিসে জমা পড়ে এবং এই আবেদনপত্রে উল্লিখিত অভিযোগসমূহের প্রতিটি পর্যায়ে এক এক করে যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হয়। এর পর ঐ একই মাসে মিশনের ইংরাজী মুখপত্র *Prabuddha Bharat* or *Awakened India*-র দ্বাবিশ খণ্ড, ২৪৬নং সংখ্যা (পৃ. ১৩২০) ‘On the Conning Tower’ শীর্ষক একটি

দীর্ঘ প্রবন্ধ কলকাতার দরবার বক্তৃতায় উল্লিখিত অভিযোগগুলির সারবস্তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। সরকারের তরফেও মিশনের জবাবদিহি সমূহের অসারতা প্রমাণ করে নানা রকমের গোপন অফিসিয়াল নোট রচনা করা হয়। প্রথম নোটটি সেক্রেটারি স্ট্রিফেনসন ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ তারিখে রচনা করে সেই দিনই মাননীয় সদস্য পি. সি. লায়ন-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। শেখোক্ত জন স্ট্রিফেনসনের বক্তব্য সমর্থন করে খোদা গভর্নরের কাছেই তাঁর নিজের মন্তব্যসহ আর-একটি নোট ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাঠিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ ১২ মার্চ তারিখে আরও একটি চিঠি গভর্নরের জ্ঞাতার্থে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি গোর্গেল-র কাছে জমা দিয়ে আসেন। এই সব চিঠি এবং স্মারকপত্রের জবাবে কার্মাইকেল শেষ পর্যন্ত সরকারি অফিসারগণ কর্তৃক প্রস্তুত বিভিন্ন নোটের ভিত্তিতে ২৬ মার্চ তারিখে মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দকে একটি জবাবী চিঠি পাঠান। চিঠি চালাচালির পূর্ব সেইখানেই শেষ হয়। এর পর অভিযোক্তা বা অভিযুক্ত কোনো পক্ষই ব্যাপারটি প্রকাশে আর গড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজী হন নি। কিন্তু প্রকাশ আলোচনার অবসান হলেও মিশনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পুলিশ গোপনে গোপনে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজে উত্তোষী হয়েছিল। এই সব গোপন তদন্ত স্বত্বে প্রাপ্ত যাবতীয় সংবাদ একত্র সংবলিত করে বাংলা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি সি. টিওল, ১৯১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজ্যের মুখ্য সচিব স্ট্রিফেনসনের কাছে জমা দেন। এই রিপোর্টে মিশনের বিরুদ্ধে আনীত কার্মাইকেলের মূল অভিযোগগুলিকে সমর্থন করার জ্ঞাত নানা রকমের হুস্পষ্ট প্রমাণ দাখিল করা হয়েছিল। রাজনীতির দায়ে অভিযুক্ত রামকৃষ্ণ মিশনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজে সরকারের এই গোপন ফাইলটি বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। আপাতত আমরা এই সব আলোচনা মূলত্ববি রেখে কার্মাইকেলের অভিযোগগুলির জবাবে মিশনের বক্তব্যগুলি অগ্রদান করার চেষ্টা করব।

কার্মাইকেলের অভিযোগের উত্তরে মিশনের তরফে প্রথম জবাবদিহি 'প্রবন্ধ ভারত' পত্রিকার জাহুয়ারি ১৯১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এতে সরকারি অভিযোগের জবাবে ছুঁতাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করা হয়। প্রবন্ধের প্রথম অংশে লেখক Political Nationalism এবং

Spiritual Nationalism-এর মধ্যে একটি ভেদবোধ টানার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অগ্রপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশন চিরকালই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে যে ভারতবর্ষের মতো একটি বৈচিত্র্য-ভরা দেশে একমাত্র ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমী ভাবধারায় লালিত একদল উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী এবং তাঁদের নেতৃত্বদ মিশনের উল্লিখিত আদর্শে অবিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন ইউরোপের মতো এ দেশেও, সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া আদায় করে নেওয়ার মাধ্যমেই জাতীয় সংহতি অর্জন করতে হবে। এই শেখোক্ত দল অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যকে যারা একান্তভাবেই রাজনীতিমূর্খ বলে মনে করেন, তাঁরাই দেশের নেতা এবং সরকারও দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে জ্ঞান করে একমাত্র তাঁদের সন্মুখেই যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেন। এই সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বদ দেশের রাজনৈতিক অশীতি সিদ্ধের জ্ঞাত রাজনীতিসিদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। অর্থাৎ সরকার-বিরোধী সংগ্রাম যদি সাংবিধানিক রীতি অথবা পরীচালিত হয় তবে তা এই সব রাজনীতিকদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে এবং এই আন্দোলন যখন সাংবিধানিক রীতির সীমা লঙ্ঘন করে নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খল (political anarchism) আকার ধারণ করে, কেবল-মাত্র তখনই নেতারা তার বিরোধিতা করতে উত্তম হন। কিন্তু রাজনৈতিক উচ্চাশা যদি একবার উস্কে দেওয়া হয় তখন তা চরিতার্থ করবার জ্ঞাত যে আন্দোলন এবং সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায় তার কড়টুকু সাংবিধানিক আর কড়টুকু সাংবিধানিক সীমার অতিরিক্ত তা যাচাই করা একান্তই কঠিন। তাছাড়া এই সব আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের পক্ষেও সাময়িক উত্তেজনা এবং আপোষ পরিহার করে সকল সময়ে বিশেষসম্মত সীমার মধ্যে থেকে, আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আজ যখন সরকার সত্ত্বাসবাদ এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের হিসেব দেখে বিজ্ঞত হয়ে উঠছেন তখন একটি কথাই তাঁদের প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা হল এই, দেশের এই উদবেগজনক পরিস্থিতি যখন ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করছিল তখন সরকারের তরফে তার কারণ বা প্রতিকারগুলি স্থির করার উদ্দেশ্যে দেশের সাধারণ মানুষের অভিমত যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সরকারের জানা উচিত ছিল যে,

কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতারাষ্ট্র আমাদের দেশের সকল জ্ঞেয় মাহুয়ের একমাত্র প্রতিনিধি নন। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সমাজের যে কতদূর ক্ষতিসাধন করতে পারে সে সম্পর্কে এই সব নেতাদের কোনো ধারণাই নেই। একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনই এই বিষয়ে সবচেয়ে স্বস্থ চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়ে এসেছে। মিশন বরাবরই বলে এসেছে যে, দেশের এই সংকট-জনক পরিস্থিতির অবশানকরে সরকার এবং রাজনৈতিক নেতা উভয় গোষ্ঠীকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যে অপার বৈষম্য দেশের সর্বশ্রেণীর মাহুয়ের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে চলেছে তা দূর করার জন্ত সর্বপ্রথম সরকারকে অগ্রণী হতে হবে, আর সেইসঙ্গে দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্বদেশের জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলবার জন্ত যুগপৎ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা এবং মিশনের বিভিন্ন মুখপত্রে অতীতে এ কথা বারবার বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের সকল দুঃখ ও লাঞ্ছনার মূল কারণ হল সংগঠন শক্তির অভাব। একমাত্র আধ্যাত্মিকভিত্তিক জাতীয়তার (Spiritual Nationalism) পথেই এই সাংগঠনিক শক্তি বিকাশলাভ করতে পারে এবং বিপরীতভাবে রাজনীতিভিত্তিক জাতীয়তা (Political Nationalism) এই শক্তি সঙ্কয়ের পরিপন্থী। মিশনের এই সম্প্রদায় মতাদর্শ, যার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ইতিপূর্বে বহু স্থানেই প্রকাশ্যে মুদ্রিত ও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কোনো পক্ষই এই সমস্ত যুক্তি অহুমান করার চেষ্টা করেন নি। আর সবচেয়ে আকস্মিকের কথা হল এই, যে ব্যাধির প্রকৃত কারণ অহুমান না করে সরকার পশ্চিমী রীতি অনুযায়ী শুধু অত্যাচার, নিপীড়ন এবং অজ্ঞান নেতিবাচক পদ্ধতির সাহায্যেই এ দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে স্বাভাবিক রাখতে চাইছেন। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অবস্থা অনেকটা দুই বজ্রমুণ্ডি অন্ধ যোদ্ধার লড়াইতে পর্যবসিত হতে চলেছে :

"And the deepest cause for anxiety is that the Government taking a superficial view of the political disease, unenlightened as to the real radical methods of combating it and relying solely on experience in Western history, has committed itself to a superficial and negative course of stringent political repression. It is like the blind coming to slashing blows nailed grips with the blind."

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার উদ্বিগ্ন প্রবন্ধের প্রথম অংশটিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কেবলমাত্র সাধারণভাবে একটি আলোচনা করা হয়। মিশন সম্পর্কে কার্যাইকলের অভিযোগের যথাযথ উত্তর প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেওয়া হয় নি। প্রবন্ধের দ্বিতীয় বা শেষ অংশটিতেই এ বিষয়ে মিশনের সম্প্রদায় অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রবন্ধ-লেখক দুভাবে যুক্তিবিস্তার করেন। তিনি বলেন যে সরকারি মহল তাদের নিজস্ব সংবাদ-সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু এই সব তথ্যগুলি সম্পর্কে মিশনকে কখনোই বিস্তারিতভাবে কিছু জানানো হয় নি, এগুলি জানা থাকলে মিশন-কর্তৃপক্ষ এ সব বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে অহুমান করতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়া যেত। কিন্তু সরকার মিশনকে এই ধরনের সুযোগ লাভে বঞ্চিত রেখেছেন, অথচ তা সত্ত্বেও একতরফা সংবাদের উপর ভিত্তি করে তাঁরা, দেশের সর্বশাসন সাধনে তৎপর একদল হীন ও নিষ্ঠুর লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত মিশনে অহুপ্রবেশ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন। এমতাবস্থায় মিশনের গঠনতন্ত্র এবং সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে করে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে মিশন সকল অবস্থাতেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী।

রামকৃষ্ণ মিশন একটি স্বশৃঙ্খল ধর্মীয় ও সেবা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ছুটি অঙ্গ। একটি হল মিশনের সন্ন্যাসী সমাজ যার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সন্ন্যাসীর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি দিক মিশন-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যার ফলে মিশন যাদের সর্বতোভাবে আত্মগোপন করে নিয়েছে। স্বসংযত, নিয়ন্ত্রিত এবং কেন্দ্রীভূত সন্ন্যাসী সমাজ মিশনের সংঘবদ্ধ জীবনের নীতি এবং কর্মসূচী নির্ধারণ করে থাকে। সংঘবদ্ধ জীবনের এই কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মালুপতি ব্যক্তিগতভাবে কোনো সন্ন্যাসীর পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং তা যদি কেউ করেন তাহলে তিনি সহজেই চোখে পড়ে যাবেন এবং সেক্ষেত্রে মিশন থেকে তাঁর বিভাজন অবশ্যস্বাবী। মিশনের সন্ন্যাসীদের তাই মিশনের অজ্ঞাতসারে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় এবং বাইরে থেকে উদ্বেগ-প্রণোদিত ভাবে কারও মিশনের মধ্যে ঢুকে পড়ারও সম্ভাবনা নেই। আর সে রকম অঘটন কিছু ঘটে গেলেও সেই বহিরাগত ব্যক্তিটির পক্ষে মিশনের কোনো

সন্ন্যাসীকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় সরকার যে অভিযোগ করেছেন যে, বাইরে থেকে কিছু লোক এসে মিশনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন, সে কথা মিশনের এই সন্ন্যাসী সমাজ বা monastic order সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না।

কিন্তু এঁরা ছাড়াও রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং মিশনের প্রতি অহরন্তর এমন কিছু লোক আছেন যারা মিশনের নানা কল্যাণকর্মে সাহায্য অংশগ্রহণ করে থাকেন। এরা মিশনের বাইরে থেকে মিশনের সেবাজ্ঞতাকে সফল করে তুলবার জগ্না চেষ্টা করেন এবং মিশন-কর্তৃপক্ষও এঁদের সহযোগিতা ভিন্ন তাঁদের কর্মসূচীকে সফল করতে পারবেন না। মিশন-অধ্যাপক এই সব বহিরাগত কর্মীদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ সরকারের অভিযোগমতো প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মী থেকে যেতে পারেন। এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু মিশন এদের সনাক্ত করবে কি ভাবে? কাজের ব্যাপারে এদের সহযোগিতা গ্রহণ করলেও মিশন এদের হাতে কখনোই নেতৃত্বের দায়িত্ব বা পরিকল্পনা রচনা করার অর্পণ করে না, এরা শুধু মিশনের পরিচালনায় কাজ করার দায়িত্বটুকুই লাভ করে। মিশনের তরফে এতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব যদি কোনো বহিরাগত কর্মী প্রচ্ছন্নভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে মিশন সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বাধা দেবে কি ভাবে? বস্তুত রামকৃষ্ণ মিশনের মতো জনপ্রিয় যে-কোনো সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই এই ধরনের একটা বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এই রকমের একটি অনিবার্ণ সম্ভাবনার দ্বারা মিশনকে সরাসরি অভিযুক্ত করা সংগত নয়। বাস্তবিক সরকার যদি মিশনের কোনো স্বীকৃত সদস্যের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ দায়ের করতেন তাহলে মিশনও সেই অবস্থার প্রতিকার করতে আগ্রহী হত। তা না হলে মিশনের বহিরাগত কর্মীদের সম্পর্কে কেবল অস্পষ্ট কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে মিশন কোনো বাস্তব গ্রহণ করতে পারেনা।

প্রবন্ধ-লেখক এইভাবে সরকার-কর্তৃক আনীত অভিযোগসমূহের যুক্তি খণ্ডন করার পর প্রবন্ধের শেষ অংশেই প্রকারান্তরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মিশন-পরিচালিত সংগঠনগুলির মধ্যে থেকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের খুঁজে বের করার কাজে মিশনও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু এই জোঁজাখুর অবসরে সরকারকেও

একটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। তা হল এই যে, রাজনৈতিক কর্মীদের অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে শুধু উৎসাদন করলেই সকল কাজ সিদ্ধ হবে না। রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে যে সব ব্যর্থ উৎসাহী এবং দৃঢ়চেতা মানুষ রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে সেবাজ্ঞতীর জীবনে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা এখনো রয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সমাজের আদর্শ এবং জীবনধারণার তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করে তাঁদের জীবনের স্রষ্টা সম্ভাবনাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। মহত্বচিন্তের সমস্ত হীন প্ররস্তিগুলিকে সংহার করার জগ্না সেগুলিকে অবদমন না করে তাদের আতিক্রম করে যেতে হবে যাতে এগুলির উর্ধ্বে উঠে যে-কোনো মানুষ রামকৃষ্ণ মিশন নির্দেশিত সেবার্থ এবং বাহ্যিকতার পরিমণ্ডলে আশ্রয়লাভের উপযুক্ত হয়:

“But we should remember at the same time that if there is any scope any where in the country for real, radical reclamation of political suspects and enthusiasts who have still the promise in them of a truer life of service, then that scope can be looked for only in that discipline of thought and life which the monastic order of the Ramkrishna Mission undertakes to impose through its spiritual ideals of service and patriotism, for it is only a higher enthusiasm that can truly supersede in the human mind a lower one, for we can only kill it by transcending but never by repressing.”

অতএব প্রবন্ধ-লেখক প্রকারান্তরে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। অর্থাৎ মিশন যদি কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে আশ্রয় দিয়েও থাকে তাহলেও সেটা সমর্থনযোগ্য, কেননা এই আশ্রয়দানের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কর্মে ইন্ধন যোগানো নয়, রাজনীতির সং কর্মীদের স্রষ্টা এবং মহত্তর জীবনে পুনর্বাগিত করা। বস্তুত এই পুনর্বাগনের যুক্তি দেখিয়েই রামকৃষ্ণ মিশন এককালের বহু বিপ্লবী কর্মীকে প্রকাশেই মিশনে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কাহ্ননগো এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমতটি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছিলেন। রাজনীতির পতন-অস্থায়ের পথের সংঘর্ষে অনেকেই শেষ জীবনে ক্রান্ত ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হেমচন্দ্রের মতে, এই হতাশার মুহুর্তে রাজনীতির পথ থেকে সম্মানজনকভাবে অব্যাহতি পাবার জগ্না অনেকেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জীবনে

আশ্রয় গ্রহণ করেন। এককালের বহু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় রাজনীতিক এইভাবে মিশনের সম্মাস ত্রুত অবলম্বন করেছিলেন।^{১২}

সরকারি অভিযোগের জবাবে দ্বিতীয় প্রতিবাদটি একটি স্মারক পত্রের আকারে রচিত হয়েছিল। এই স্মারক পত্রটি মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ সহ আরও অনেকের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চিঠিটি 'হিজ এক্সেলেন্সি দি রাইট অনারেবল টমাস ডেভিড বারন কার্শাইকেল অফ সলিং, জি. সি. আই ই., কে. সি. এম. জি., গভর্নর অফ বেঙ্গল ইন কাউন্সিল'-এর নামে বেলুড় মঠ থেকে ২২ জাহুয়ারি ১৯১৭ তারিখে প্রেরিত হয়। বারোটি নাস্তিদির্ঘ অল্পক্ষেদে সাজানো এই দীর্ঘ স্মারক পত্রটি সেকালের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী একটু জটিল ভাবেই রচিত হয়েছিল। এর ভাষা এবং বাক্যবিশ্লেষণ ছিল অনাবশ্যক রকমের দুরূহ, কিন্তু যুক্তিগুলি ছিল অত্যন্ত প্রাথমিক। স্মারক পত্রের প্রথম চুটি অল্পক্ষেদে গভর্নর তাঁর দরবার বক্তৃতায় সেবা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশনের নাম উল্লেখ করেছিলেন বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হলেও, তাঁর বক্তৃতার প্রতিবাদ জানাতে কেন এই স্মারক পত্র রচনা করতে হল তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পত্রের একাদশ এবং দ্বাদশ অল্পক্ষেদেও এই কারণগুলি ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে রাজনীতির কাজে মিশনের জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয় তার ফলে মিশনকে অর্থ-সাহায্য করেন এমন অনেক মানুষ মিজেরে গুলিয়ে নিচ্ছেন। এই সব মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন মিশনের নানা ধরনের দাতব্য এবং কল্যাণ-কর্ম পরিচালনা করা অসম্ভব। স্তব্ধতা নিছক অস্তিত্বের স্বার্থেই মিশনকে গভর্নর-কর্তৃক আনুষ্ঠানিক অভিযোগসমূহের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

অভিযোগগুলি খণ্ডন করতে গিয়ে পত্রের চতুর্থ অল্পক্ষেদে একথা স্বীকার করা হয় যে, মিশনে আশ্রয়প্রাপ্ত কোনো কোনো ব্যক্তির চরিত্র হারাতে এককালে দৃষ্টিগত বলে বিবেচিত হয়েছিল ("...whose past life may have been blameworthy"), কিন্তু মিশন সব জেনে শুনেও তাদের আশ্রয় দিয়েছে যাতে তারা পুরনো পথ থেকে ফিরে এসে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার জীবনে পুনর্নিসিদ্ধ হয় ("...the acceptance of novices would be for the purpose of weaning such men from their former courses...")। পত্রের স্বাক্ষরকারীরা দাবি করেন যে, যে পৃষ্ঠপোষক অপরাধের যে-কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠানেই এইরকম ভাবে বিপদগ্রামীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।

তাই রামকৃষ্ণ মিশনও যদি এইভাবে কাউকে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়ার জন্য মিজেরদের সংযজীবনে আশ্রয় দিয়ে থাকে তবে সেই কারণে তাকে অভিযুক্ত করা সাজে না।

স্মারক পত্রের অত্যাশ্চর্য অল্পক্ষেদগুলিতে মিশন-কর্তৃপক্ষ তিন প্রকারের যুক্তির সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। প্রথমে বলা হয় যে, মিশনের অন্তর্ভুক্ত মোট ২০১ জন সদস্যের (৭৮ জন সদ্যঙ্গী, ১২১ জন গৃহী সদস্য ও ২ জন সহযোগী সদস্য) অতীত এবং বর্তমান জীবন খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে থেকেই কোনো সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাছাড়া মিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনো রাজনীতিকেরা লোককে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত মিশনের সদস্যত্বগুলির জন্য এসব বিভিন্ন প্রকারের বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে, এর সদস্য সংখ্যা অল্প যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় উল্লেখযোগ্য রকমের কম। মিশন ইচ্ছা করেই সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার পদ্ধপাতী, কেননা তা না হলে এই প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও গুরুত্ব অচিরেই হ্রাস পাবে। অতএব এইরকম কঠোর বাধানিষেধের প্রহরা এড়িয়ে কোনো রাজনীতিকেরা লোক উদ্বেগপ্রণোদিতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ঠাঁই করে নিতে পারবেন না। কাজেই কতিপয় নিষ্ঠুর এবং হীন চরিত্রের লোক মিশনের মধ্যে ঢুক পড়েছেন বলে গভর্নর যে অভিযোগ এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তা একান্তই অমূলক।

দ্বিতীয়ত, স্মারক পত্রে একথা জানানো হয় যে রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে যুক্ত হতেও দেখা যায়, তবে তার দায়িত্ব নির্বিচারে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। আসলে রামকৃষ্ণের মতো একজন মহান সাধকের নাম নিয়ে যে-কেউই একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করতে পারেন, কিন্তু সেই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিশনের কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ বউবাজারের 'রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে। আর লরেন্স জেঙ্কিন্স, সি. এফ. পাইন এবং পি. সি. লারন-এর মতো পদস্থ সরকারি কর্মীগণ এই প্রতিষ্ঠানের নানা অহুঠানে বহুবার যোগদান করেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এ-হেন একটি ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো যোগসম্পর্ক নেই। অতএব মিশনের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মীদের অগ্রপ্রবেশ ঘটেছে, এ রকম

একটা অভিযোগ আনার আগে অভিযোগকারীকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে যে তথ্যবিশিষ্ট ঐ সকল রাজনৈতিক কর্মী রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত অস্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কি না, কেননা এই সব ক্ষেত্রে অনেক সময়েই মিশনকে অস্ত্র সম্বন্ধী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। বস্তুত মিশনের পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে যে মিশন সব সময়েই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী। এমন-কি মিশন-পরিচালিত নানা ধরনের সেবাকাজে যারা অর্থ এবং শ্রম দিয়ে সাহায্য করে থাকে তারাও যাতে রাজনীতির লোক না হয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্ত এই সকল আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে মিশনের কাছে যোগ দেওয়ার অহুমতি দানের পূর্বে তাদের অরাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।^১ এত সব সাবধানতা অবলম্বনের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য— তা হল মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রটি অক্ষুর রাখা।

আত্মপক্ষ সমর্থনে মিশনের সবচেয়ে জোরালো যুক্তিগুলি স্মারক পত্রের নয় এবং দশ নম্বর অহুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছিল। মিশনের পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা যে কত অসম্ভব তার কারণ এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়। প্রথমেই বলা হয় যে মিশনের পরিচালকমণ্ডলীর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ছোয়াচ বাঁচানোর জন্ত মিশনের সেক্রেটারি সারদানন্দ পুলিশের পদস্থ অফিসার টেগার্ট-এর পরামর্শ অহুয়ারী ইতিপূর্বে কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে জনসাধারণকে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম এড়িয়ে যারা রাজনীতি করে তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দেন। 'A warning to the Public' শীর্ষক এই প্রবন্ধটি ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের নাম-করা সকল দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, মিশন যে যথার্থই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে আগ্রহী সে বিষয়ে তার আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্ত মিশন-কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে বছবার পুলিশ অফিসারদের নানা অহুসন্ধান কাজে সহায়তা করে এসেছেন। জি. সি. ডেনহাম (ইনি ছিলেন পুলিশের জি. আই. জি.) এবং সি. এ. টেগার্ট (গোয়েন্দা বিভাগের পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট)-এর মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসারগণ তাঁদের অহুসন্ধান কাজে ইতিপূর্বে অনেক-বারই বেলেড় মঠে শরীরে হাজির হয়েছিলেন এবং সেই সময় মঠের

পরিচালকবৃন্দ তাঁদের যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার জন্ত তাঁরা নানাভাবে সন্তোষ প্রকাশ করে যান। তাছাড়া খোদ গভর্নরের পত্নী লেডি মিটো-ও একবার বেলেড় মঠে পদার্পণ করেছিলেন। মঠে এইসকল অভিজাত রাজপুরুষদের উপস্থিতি মিশনের অরাজনৈতিক চরিত্রের পরিচয় দেয়। বস্তুত একটি মামলার রায়দান প্রসঙ্গে হাওড়ার তৎকালীন জেলাশাসক স্তার উইলিয়াম ডিউক ১৮৯৯ সালের ৩ আগস্ট রামকৃষ্ণ মিশনকে একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সাব্যস্ত করেছিলেন।

মিশনের নির্দোষীতা প্রমাণ করার জন্ত স্মারক পত্রে মিশনের সহযোগী-প্রতিষ্ঠান; বেবারসের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কথা উল্লেখ করা হয়। উপরোক্ত সেবাশ্রম-কর্তৃক প্রকাশিত ১৯১৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টের অংশ-বিশেষও এই প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হয়। এগুলি পাঠ করে জানা যায় যে, সেবাশ্রমের নানা কল্যাণ-কর্মে স্থানীয় সরকার সেবাশ্রম-কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। এমন-কি সেবাশ্রমের জন্ত প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করার জন্ত উত্তর প্রদেশ সরকার সে সময় নিজেরাই উল্লেখ্য হয়ে লাও আত্মহুঁজিশন প্রাণী অহুয়ারী নানা রকম বাধা গ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করে স্মারক পত্রে প্রকাশ্যে এই কথাটিই বলা হয়েছিল যে, সরকারের তরফে মিশনের প্রতি অতীতের এই মূল্যবান সহযোগিতা বিনা কারণে অর্জিত হয় নি। মিশন যদি সরকার-বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকত, তাহলে সরকার কখনোই তাকে এইভাবে সাহায্য করবার জন্ত এগিয়ে আসত না। এই সাহায্য এবং সহযোগিতা মিশনকে অর্জন করতে হয়েছে রাজভক্তি এবং সরকারি নীতির প্রতি আহুগতা প্রদর্শনের বিনিময়ে।

প্রতিপক্ষের সকল অভিযোগ এইভাবে খণ্ডন করার পর স্মারক পত্রের শেষ দ্রুতি অহুচ্ছেদে গভর্নর-সকাশে একটি বিনীত আবেদন পেশ করা হয়। পত্র-লেখকগণ বলেন যে, মিশন সম্পর্কে গভর্নরের তির্যক মন্তব্য মিশনের পৃষ্ঠ-পোষকগণকে নিঃসাহাযী করে ফেলেছে এবং তার ফলে মিশনের অর্থভাণ্ডারে প্রত্যাশিত ছাঁদ আর আদায় করা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় কনফল, বুদাভন এলাহাবাদ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মিশন-পরিচালিত সেবাকাজ-গুলির ব্যয় নির্বাহ করার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে এবং এই অহুবিধার জন্ত হয়তো সেগুলি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। এই

সংকট এড়ানোর উপায় হিসেবে গভর্নর যদি মিশন সম্পর্কে তাঁর আপেকারি অভিমোদন প্রত্যাশার করে নেন কিংবা তাঁর দরবার বক্তৃতার সংশ্লিষ্ট অংশগুলি এমনভাবে সংশোধন করেন যে মিশন সম্পর্কে জনসাধারণের পূর্বকার আস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলেই একমাত্র সকল দিক রক্ষা হতে পারে :

With this humble memorial and explanations which your Excellency's memorialists are prepared to support in detail, they trust and pray that your Excellency before leaving India, will do the Mission the very great and helpful service— one fully in keeping not only with the spirit of your Excellency's address, but with the fairness and openness which have animated the whole of your Excellency's rule— of in some way correcting the disastrous impression of the Mission which has unfortunately arisen since the Durbar speech.

স্বাক্ষর পত্রে উল্লিখিত প্রার্থনার জের টেনে প্রায় দেড় মাস বাদে মিশনের সেক্রেটারি সরকারের কাছে আরও একটি আবেদন পত্র জমা দেন। এই চিঠিটি বাগদাজারের ১নং মুখার্জী লেন থেকে ১৯১৭ সালের ১২ মার্চ তারিখে গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি গোর্গেলের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। এর আগে গভর্নরের দপ্তর থেকে মিশনের কাছে পত্র মাঝে মাঝে জানতে চাওয়া হয় যে গভর্নরের দরবার বক্তৃতার সংশোধন করে, কী ধরনের বিবৃতি তাঁরা সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন সে সম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে তাঁদের মতামত যেন অবিলম্বে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই চিঠির জবাবে সারদানন্দ চারটি নান্দীদীর্ঘ অঙ্কচ্ছেদে মিশনের বক্তব্য জ্ঞাপন করে গোর্গেলের কাছে পত্র লেখেন। চিঠির প্রথম অঙ্কচ্ছেদে সবিনয় নিবেদন করা হয় যে গভর্নর যে ভাবেই হোক না কেন এমন কিছু যেন বলেন যার ফলে লোকের ধারণা হয় যে মিশন যথার্থই একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং যার সঙ্গে কোনো ভাবেই রাজনীতির কোনো সংশ্লেশ নেই। তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, এই দকমের একটি বিবৃতি দিতে গেলে গভর্নরের যদি আঙ্গাঙ্গদান স্মরণ হয় তাহলে যেন তাঁকে এই বিষয়ে আর বিব্রত না করা হয়।

চিঠিটির দ্বিতীয় অঙ্কচ্ছেদে বলা হয় যে, আসলে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এখনও সরকারের সহানুভূতি এবং আস্থা রয়েছে এই তথ্যটুকু জানিয়ে গভর্নর

যে বিবৃতিই দিন, তাই মিশনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে গভর্নর যদি পছন্দ করেন তাহলে ব্যাপারটা এইভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁর দরবার বক্তৃতা, মিশনের সেবাকাজের প্রতি সরকারের যে সহানুভূতি রয়েছে সেই মনোভাব ব্যক্ত করার জন্যই গভর্নর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। আসলে গভর্নর জানান যে সং অসং নির্দিষ্টে মিশনকে সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই কাজ করতে হয় এবং বলতে বাধ্য নেই যে শেখোক্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্যই মিশন বেশি মাত্রায় চিহ্নিত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মিশন এই সব বিপণ্যসামগ্রী লোকদের স্নান ও ধর্মের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে আগ্রহী। এই সব সং লোকদের জন্য কাজ করতে গিয়ে মিশনের মূল কর্মসূচীটিই ব্যাহত হতে পারে। বস্তুত এই ব্যাপারেই মিশনকে প্রকারান্তরে একটু সাবধান করে দেওয়ার জন্য গভর্নর দরবার বক্তৃতার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের কথা টেনে আনেন। কিন্তু লোকের যদি তাঁর সেই বক্তৃতার ভুল অর্থ করে মিশনের প্রতি তাঁদের সকল সহযোগিতা এবং আত্মকৃত্য প্রদর্শন বন্ধ রাখে, তাহলে গভর্নর ব্যক্তিগতভাবে সেই পরিস্থিতিতে বড়োই দুঃখ বোধ করবেন।

এইভাবে প্রত্যাশিত বিবৃতির বয়ানটি রচনা করে দিয়ে সারদানন্দ তাঁর চিঠির শেষ অঙ্কচ্ছেদে জানান যে, গভর্নর ইচ্ছা করলে বয়ান অস্থায়ী বিবৃতি না দিয়ে অল্প যে-কোনো ভাবেও তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে মিশনও যে-কোনো বিবৃতি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু মিশনের পক্ষে সব চেয়ে ভালো হয় যদি গভর্নর উপরোক্ত বয়ান অস্থায়ী বিবৃতি দিতে সক্ষম হন, কেননা “প্রিয় গোর্গেল, মিশনের সামনে যে সংকট উপস্থিত হয়েছে তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কোনো পথ আমাদের জানা নেই।”

কিন্তু প্রার্থনা অস্থায়ী গভর্নরের বিবৃতি কি শেষ পর্যন্ত সত্যিই প্রকাশ করা হয়েছিল? প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো মিশন সম্পর্কে জনসাধারণের তথাকথিত ভ্রান্ত ধারণার অবসানকল্পে মিশনের তরফে সম্ভবত এই সময়েই খোদ গভর্নরকে বেলেড় মঠ ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও সরকার কি মিশনের ২২ জাহায্যরি তারিখের স্মারক পত্রটির প্রস্তাবমতো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন? সকলেই জানান সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গভর্নর ব্যক্তিগত দায়িত্ব কোনো কিছু লেখেন না, তাঁর হয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট আফিসাররাই সব-কিছুর বয়ান রচনা করে দেন। তাই প্রস্তাবিত বিবৃতিটি দেওয়া উচিত কি না সে সম্পর্কে বাংলা সরকারের চিফ

সেক্রেটারি সব অগ্রাহ্য পদস্থ অফিসারদের কাছ থেকে যথাসময়ে অভিমত সংগ্রহ করা হল। এই সব অভিমতের ভিত্তিতেই কার্যাইকেল মিশনকে ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের ছাফিখ তারিখে একটি চিঠি দেন এবং সেই চিঠি পাঠানোর পর তখনকার মতো এই বিতর্কের অবসান হয়। এই চিঠিখানি প্রধানত চিফ সেক্রেটারি টিফেনসন এবং হোম সেক্রেটারি লায়ন-এর একান্ত গোপন ছুটি নোটের ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছিল। এগুলি পাঠ করলে মিশনের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিগুলি সরকারি মহলে কি রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা স্পষ্ট করে জানা যাবে।

উল্লিখিত প্রথম নোটটির রচয়িতা টিফেনসন, প্রাপক : সি. সি. লায়ন এবং তারিখ ২ মার্চ ১৯১৭। এই দীর্ঘ নোটে মিশনের স্মারক পত্রের যুক্তিগুলি নজর করে দিয়ে বলা হয়েছে যে মিশনের উল্লিখিত ২০১ জন সদস্যের মধ্যে যে কেউ রাজনৈতিক কর্মী নেই এ কথা বলা আবাস্তর। আসলে গভর্নরও এ কথা কোথাও বলেন নি যে মিশন প্রকৃত্তেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। মিশনের সঙ্গে সংযোগ আছে বলেই যে, কেউ বিপ্লবী হয়েছেন এমন অভিযোগও কখনও করা হয় নি। বস্তুত কার্যাইকেল এর বিপ্লবীত কথাই বলতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ এমন অনেক লোক আছেন যারা বিপ্লবী বলেই মিশনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছিলেন (It is not for a moment suggested that these men are revolutionaries because of their connection with the Ramkrishna Mission, but I think there is reason to suppose that in many cases they belonged to the Mission because they were revolutionaries.)

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশের স্পেশাল সুপার টেগাট ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে যে গোপন প্রতিবেদনটি পেশ করেন (এবং যে রিপোর্টের লাল রঙের মলাট থাকার জন্ত যাকে সে সময় 'রেড বুক' বলা হত) তার পৃষ্ঠা ১০-১৩ এবং ২৫ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয় যে, মিশনের সঙ্গে একদল প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মী বরাবরই সংযুক্ত ছিল। বাংলা সরকারের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি সি. টিঙ্গেল-এর গোপন রিপোর্টেও এই অভিযোগ সমর্থিত হয়েছে। তাছাড়া বিপ্লবকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে তাদের সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে এ কথা কবুল করেছে যে মিশনের নাম নিয়েই একদল লোক তাদের এই চক্র টেনে এনেছে এবং

All letters & so on to be addressed to the President R. K. Mission.



Ramkrishna Mission,
Distr P. O. Rowra's Dist.

Dated, 11/11/16

No. R.

১০

The Hon'ble Mr. P. C. Dey C.S.I.
Calcutta

Dear Sir,

I crave leave to remind you of your very kind promise to me to have the police guards put on two young members of the Balas Math taken off for their police duties. We earnestly hope you will kindly leave the matter absolutely decided from the fact that

Kind Secy
I would be much obliged if you would kindly issue a letter to the Balas Math to have the two young members of the Balas Math taken off for their police duties. We earnestly hope you will kindly leave the matter absolutely decided from the fact that

7/1/17

সর্বশাশের আগের মুহূর্ত পর্যন্তও তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, যা কিছু তারা করছে তা সব মিশনেরই কাজ। ষ্টিফেনসন বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারাও সাক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে বিবেকানন্দের মতাদর্শ ব্যক্তিগত বিকৃত করে অস্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নৈতিকতার সর্বকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক জিয়াকাণ্ডে উত্থান দিয়ে এসেছেন। অল্প কিছু দিন আগেও কয়েকজন ফোরার রাজনৈতিক কর্মী মিশনে এসে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিল। এই সংবাদ বর্তমানে জানা গিয়েছে। এমতাবস্থায় মিশন-কর্তৃপক্ষ কাগজে ছ-একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয় তাঁদের আরও তৎপর হতে হবে, কবেই তাঁরা রাজনীতি ব্যাপারে তাঁদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে পারবেন।

নোটের শেষে ষ্টিফেনসন বলেন যে মিশন-কর্তৃক প্রদত্ত স্মারক পত্রের জবাবে গভর্নর মিশনের প্রতি সরকারের সহায়কত্বের কথা জানিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের অর্থ সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি দিতে পারেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি যেন একথাও জানিয়ে দেন যে মিশনকে রাজনৈতিক কাজের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার যে আশঙ্কা রয়ে গিয়েছে সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ যেন উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন। প্রসঙ্গত ষ্টিফেনসন জানান যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে অহুমোদন-জাপক কোনো মন্তব্য গভর্নরের না করাটাই শ্রেয়। গভর্নর যদি এখন বেলুড মঠ পরিদর্শনে যান তাহলে প্রকারান্তরে এই রকম অহুমোদন জানানো হয়ে যাবে। তাই তাঁর পক্ষে এখন বেলুডে যাওয়া উচিত হবে না।

ষ্টিফেনসনের উপরোক্ত নোটটি পাঠ করে ষ্টিক দু দিন পরে অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ তারিখে পি. সি. লায়ন কার্মাইকেলের অবগতির জ্ঞাত তাঁর নিজস্ব নোটটি গাড়িয়ে দেন। এই নোটেও গভর্নর যাতে বেলুড মঠে না যান তার জ্ঞাত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মত প্রকাশ করা হয়। মূল বিষয়সমূহে লায়নও ষ্টিফেনসনের সঙ্গে একমত হন। তবে মিশন-প্রদত্ত স্মারক পত্রের জবাবে তিনি আরও বৈধিক (formal) উদ্ভব জ্ঞেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি জানান যে গভর্নর এই মর্মে লিপন যে, দরবার বক্তৃতার সকল অংশ সতর্কভাবে পাঠ করার পর তাঁর মনে হয়েছে যে এগুলি সংশোধন করার কোনো যুক্তি নেই এবং সঠিক তথ্যের দ্বারা সমর্থিত সংবাদের ভিত্তিতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে সাবধান

বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তিনি আশা করেন তা মিশনের মঙ্গল সাধন করবে এবং এর ফলে সাধারণের মনে যদি সাময়িক কালের জ্ঞাত কোনো ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট হয় তবে সেগুলি অচিরেই কেটে যাবে :

"... H. E. has carefully considered again the words of his speech in the light of the representation now made and finds nothing that he can alter or qualify ; he believes that the warning he conveyed to the public was in the best interests of the Mission itself, and he knows it to have been justified by facts ; and he has no doubt that the members of the Mission will have little difficulty in controverting any mis-interpretation of his words that may have gained temporary currency."

আমাদের আলোচনা শেষ। অভিজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশনের সুখরক্ষার জ্ঞাত কার্মাইকেল শেষপর্যন্ত মিশনকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন (তারিখ : ৬.৩.১৯.৭)। কিন্তু সে চিঠিতে বাস্তবিক কতটুকু সুখরক্ষা হয়েছিল সেটিই ভেবে দেখার মতো। বস্তুত কার্মাইকেল ষ্টিফেনসন এবং লায়নের পরামর্শমতোই তাঁর চিঠির বয়ান প্রস্তুত করেছিলেন। সে চিঠিতে মিশনের প্রার্থনা পূরণ হয় নি। কার্মাইকেল জানান, মিশনকে অভিমুখ করার জ্ঞাত তিনি দরবার বক্তৃতায় মিশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি। বস্তুত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের দাতব্য এবং সেবাকর্মে তাঁর চিরকালই আস্থা রয়েছে। কিন্তু এটাও ষ্টিক যে মিশনের সেবাকর্মী হিসেবে ভেদ ধরে অনেকেই স্বাণ্য উদ্দেশ্য সাধনের জ্ঞাত মিশনের নাম নিয়ে সদস্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত। মিশনের কাজে ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রদ্বাশীল বলেই মিশনকে তিনি এই বিপদ সম্পর্কে দরবার বক্তৃতায় অবকাশে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

অর্থাৎ গভর্নরের তরফে সৌজ্ঞাত প্রকাশে কোনো ক্রটি ঘটে নি। কিন্তু অবস্থা যা ছিল তাই রয়ে গেল। মিশনের বিরুদ্ধে রাজনীতি করা নিয়ে যে অভিযোগ এবং তির্যক মন্তব্য করা হয়েছিল তার কোনো প্রতিকার বিধান সম্ভব হল না।

১. Rolland, Romain, *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel*, Calcutta, 1979, p. 121.

২. *The Ramkrishna Mission. Confidential Police Report* by C. A. Tegart, Special Supdt of Police, I. B., dated 22 April 1914. (Printed). p. 25.

৩. 'প্রমা' ১৯৮২ জাহারি সংখ্যায় এ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

৪. Ghose, Sankar, *First Rebels*, Calcutta, 1981, p. 21.

৫. Majumder, R. C., *History of the Freedom Movement in India*, Vol. II., Calcutta, 1975, p. 459.

৬. কাহনগো, হেমচন্দ্র, 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা', কলকাতা, ১৯২৮, পৃ. ১৪।

৭. অঙ্গীকার পত্রের বয়ান ছিল এই রকম :

"I do hereby solemnly declare that I am in no way connected with any society or body of men—individual or individuals, whom I know to cherish any unlawful political purpose on act in any unlawful way against the Government established by law in this country, nor do I cherish such a purpose on act in such manner myself."

এই ঘোষণাপত্রের প্রোকার্ফটি কলকাতার গৌরান্দ্র প্রেস থেকে ১৫.১.১৯১৭ তারিখে ছাপিয়ে আনা হয়। আর সাহসিকতার আলোচ্য স্মারক পত্রটির তারিখ ২২.১.১৯১৭। স্বতরাং এ কথা ভাবা যেতে পারে যে, কার্গাইকেল-কর্জুক অভিযুক্ত হওয়ার পরেই উল্লিখিত ঘোষণাপত্র বিলি করার আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রবন্ধ

যুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ

নিভাপ্রিয় ঘোষ

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে 'কবিতা' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে (রচনা ১৩৪৮) তাঁর নিজের রচনার বিরূপ সমালোচনা স্মরণ করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অভ্যস্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে 'তরুণ' শব্দটা এইরকম কণা তুলে ধরেছিল।'

রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক রবীন্দ্রজীবনকালে কিছুকাল পরপরই উঠত। প্রথম উঠেছিল, সাহিত্যের অঙ্গীলতা আর অস্পষ্টতা নিয়ে। তুলেছিলেন বিজ্ঞানলাল রায়। তার পর উঠেছিল, সাহিত্যের বাস্তবতারোধ নিয়ে। তুলেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল আর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তারপর উঠেছিল, সাহিত্যের অভিজাত আর তরুণ্য নিয়ে। তুলেছিলেন কল্লোলপন্থীরা। তার পর উঠেছিল, সাহিত্যের বর্জ্যায়ত্ত্ব নিয়ে। তুলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিকেরা। এবং এই আধুনিকেরাই তুলেছিলেন সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই, যতই ব্যাতিমান হয়ে থাকুন তিনি, যতই বিষয়াস্তরে ব্যাপৃত হয়ে উঠুন, যতই তাঁর বয়স বেড়ে থাকুক-না-কেন, পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও যে তীব্রতা নিয়ে তিনি বিতর্কে নেমেছিলেন, আশি বছর বয়সে আরো তীব্রতা নিয়ে তিনি বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ সক্রিয় মনের পরিচয় দেয় এই বিতর্কগুলো।

বিতর্কের সময়গুলো লক্ষ্য করার মতো।

প্রথম বিতর্ক, কাব্যে অস্পষ্টতা এবং অঙ্গীলতা সম্পর্কে, চলে ১৯০৬ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত। শুরু করেন বিজ্ঞানলাল রায়। এই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং

তেমন তীব্রতার পরিচয় দেন নি, দরকার হয় নি। কেননা তাঁর সমর্থকরা যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিতর্কের প্রাণপন্নতা মনে রাখার মতো।

কাব্যের অভিব্যক্তি, হিজেন্সলাল রায়। কাতিক ১৩১৩, প্রবাসী।

সোনার তরী, যদুনাথ সরকার। অগ্রহায়ণ ১৩১৩, প্রবাসী।

কাব্যে উপভোগ, হিজেন্সলাল রায়। রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। মার্চ ১৩১৪, বঙ্গদর্শন।

কাব্যে নীতি, হিজেন্সলাল রায়। জৈষ্ঠ ১৩১৬, সাহিত্য।

কাব্যে সমালোচনা, স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রাবণ ১৩১৬, সাহিত্য।

কাব্যে নীতি, যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ভাদ্র ১৩১৬, মানসী।

চিত্রাঙ্গদা, প্রিয়নাথ সেন। কাতিক ১৩১৬, সাহিত্য।

চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক বাখ্যা। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্রহায়ণ ১৩১৬, সাহিত্য।

কাব্যে অপহরণ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অগ্রহায়ণ ১৩১৬, মানসী।

চিত্রাঙ্গদা, অমরেন্দ্রনাথ রায়। পৌষ ১৩১৬, অর্চনা।

দেবালয়ে উপদ্রব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী। বৈশাখ ১৩১৭, দেবালয়।

বিরহ কাব্য, হিজেন্সলাল রায় বাগচী। আষাঢ় ১৩১৭, মানসী।

রূটি কথা, বিপিনবিহারী গুপ্ত। শ্রাবণ ১৩১৭, মানসী।

সাহিত্যে স্বরুচি, বিপিনবিহারী গুপ্ত। শ্রাবণ ১৩১৭, প্রবাসী।

সাহিত্যে স্বরুচি, কণীন্দ্রনাথ রায়। ভাদ্র ১৩১৭, অর্চনা।

সাহিত্যে আবর্জনা, হিজেন্সলাল রায়। পৌষ ১৩১৭, নবভারত।

সাহিত্যে চাবুক, প্রমথ চৌধুরী। মার্চ ১৩১৯, সাহিত্য।

সাহিত্যে নৈতিক চাবুক, মেঘনাদ। ফাল্গুন ১৩১৯, সাহিত্য।

এই তালিকাটি সংগৃহীত হলো পায়ত্বী সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও হিজেন্সলাল' গ্রন্থ থেকে। বিতর্কে কাব্যে অস্পষ্টতা নিয়ে ততটা নয় যতটা অঙ্গীলতা নিয়ে। বিতর্কে হিজেন্সলালের পক্ষে তেমন কেউই ছিলেন না, অমরেন্দ্রনাথ রায় এবং 'মেঘনাদ' ছাড়া, যেটা লক্ষ্য করার বিষয়, অস্পষ্টতা এবং অঙ্গীলতা বিষয়ে আক্রান্ত যে রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথই পরবর্তী বিতর্কে অঙ্গদের আক্রমণ করবেন। সেই অস্পষ্টতা এবং অঙ্গীলতার অপবাদ দিয়ে। তখনই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কিশোরকান্ত বাগচীকে লেখা চিঠির আক্ষেপ : তোমার মতোই আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা নিয়ে জন্মেছিলুম কিন্তু লজ্জা এসে গেছে।

হিজেন্সলাল 'সোনার তরী'র অর্থ খুঁজে পান নি বলে বহু গল্পনা শুরু করেছিলেন। আধুনিক কবিতার অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ, আর সে কথা বলার জন্ত নাচনচল্ল অর্থাৎ কিশোরকান্তকে লিখছেন :

"আমার কথার মধ্যে সহজ অর্থ খুঁজে পেয়ে তোমার মনে যদি অত্যন্ত দ্বিষ্টার জন্মে তাহলে কথাগুলোকে উলটে পালটে দিয়া— তোমাদের কাজ চলবে। একটা নমুনা দেখাই—

কুলে পরজে। পগনে বদে আছি।

মেঘ একা, ভরসা নাহি

ঘন বরষা।

মনে হচ্ছে না কি, কিছু যেন বলা হোলো, কিন্তু কী যে তা বোঝবার দরকারই নেই।"

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দ্বিতীয় বিতর্ক, সাহিত্যে বাস্তবতাবোধ নিয়ে। সময়, ১৯১১-১৬। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে একটি তালিকা দিয়েছেন। সেটি পূর্ণাঙ্গ না হলেও তালিকাটি এই :

চরিত্রচিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল। চৈত্র ১৩১৮, বঙ্গদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্চা কি 'বস্তুতত্ত্বহীন'? অজিতকুমার চক্রবর্তী। আষাঢ় ১৩১৯, প্রবাসী।

বিশেষনা ও অবিশেষনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ ১৩২১, সবুজ পত্র।

লোকশিক্ষক বা জননায়ক, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। জৈষ্ঠ ১৩২১, প্রবাসী।

বাস্তব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রাবণ ১৩২১, সবুজ পত্র।

লোকহিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাদ্র ১৩২১, সবুজ পত্র।

আমার জগৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আশ্বিন ১৩২১, সবুজ পত্র।

সাহিত্যে বাস্তবতা, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। মার্চ ১৩২১, সবুজ পত্র।

বস্তুতত্ত্বতা বস্তু কি, প্রমথ চৌধুরী। মার্চ ১৩২১, সবুজ পত্র।

সাহিত্য ও বদেহ। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। বৈশাখ ১৩২২, সাহিত্য।

কবির কৈফিয়ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জৈষ্ঠ ১৩২২, সবুজ পত্র।

এই বিতর্কে ছোটো প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। নারায়ণ পত্রিকা, এবং বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ সাহিত্যিকেরা মনে করছিলেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ক্রমশই বিদেশি ভাবে রঞ্জিত হয়ে দেশের মূল থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে বায়বীয় হয়ে উঠছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাণ উৎসারিত হওয়া উচিত দেশেরই হাওয়াটি থেকে। রবীন্দ্রনাথ এঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন সনাতনী। বিবেচনা ও অবিবেচনা, বাস্তব ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি চর্চায় কোনো দোষ তে খুঁজে পানই নি, বরং মনে করছিলেন পাশ্চাত্য সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণতা দূর হবে। এই সনাতনী প্রবীণদের বিরুদ্ধে তাই তিনি লিখতে পারলেন :

‘তাহারা চতুর্দশশতাব্দীতে বাসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথেঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তারুণ্যের জর হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঙ্গল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ ধোলাসা হোক, তাহার অববিবেচনার উদ্ভববেগে অসাধাযাধন হইতে থাকুক।’

আবার লক্ষ্য করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের তারুণ্যের এই জয়ধ্বনি বুঝেরা হয়ে ফিরে আসবে দশ-বারো বছর পর রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তৃতীয় বিতর্কে। তখন এই তারুণ্যের স্পর্ধায় তিত্তিবিরক্ত রবীন্দ্রনাথ বলবেন (‘স্বনীতি-হুমার চটোপাধ্যায়কে চিঠি, ২৩ পৌষ ১৩০৪, মাঘ ১৩০৪, শনিবারের চিঠি’) :

‘কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ত্রিভাষারী নিজেদের ছুঁসছ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রাষ্ট্রাচারের খিঁচি লিখতে শুরু করেছে। তারা বলেছে, আমরা তরুণ-বয়স্ক বলেই সবাই আমাদের সমন্বয়ে বাহবা দাও,— আমরা যুদ্ধ করেচি বলে না, প্রাণ দিয়েচি বলে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তা-ই লিখিনি বলে।’

এই দ্বিতীয় বিতর্কে দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, সাহিত্য কি লোকহিতের জন্ত অথবা লোকরঞ্জনের জন্ত। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রশ্নটি তুলেছিলেন এবং সেই স্বল্প ধরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন লোকহিত এবং জ্ঞানাত্মক পদবর্তী প্রবন্ধ। বিদেশি সাহিত্যে জনসাধারণ সাহিত্যের নায়ক হয়ে উঠেছে অতএব আমাদের দেশেও লোকসাধারণকে সাহিত্যের প্রধান উপকরণ করে তুলতে হবে, রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই দেখেছিলেন এই নতুন ফ্যাশনের আমদানি। রবীন্দ্রনাথের কাছে এটা নিতান্তই ফ্যাশন। বিদেশে জনসাধারণ শিক্ষিত হয়ে উঠেছে, তারা আপন শিক্ষার জোরেই সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। আমাদের দেশে নিরক্ষর অশিক্ষিত জনসাধারণের সেই জোর নেই। তাদের জ্ঞান ধারা শুকালতি করছেন তাঁরা দয়া দেখাচ্ছেন, হিটলার করছেন, সত্যিকারের প্রীতি তাঁদের নেই। তাই জনসাধারণ নিয়ে এই মাথাব্যথা তাঁর

কাছে মনে হচ্ছে একটা ধারকরা ফ্যাশন। ‘সাহিত্য জীবনের বাস্তবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে।’ লোকসাহিত্য রচনা করবে লোকেরাই, দয়ালু বাবুরা নয়, ‘দার তাগিদে আমাদের কলজের কোনো ভগ্নিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুকুটধারী করা সাজিবে না।’ ‘যেখানেই হেতু আসিয়া মুকুট হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি ঘটিয়া হয়।’ লোকহিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের যে প্রান্ত নিয়েছিলেন, শেষ জীবন পর্যন্ত সেই প্রান্তে প্রায় অনড় ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার তিনি বুঝেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদ আসে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, নিজের সৃষ্টির আনন্দ থেকে, প্রয়োজনের তাগিদে, কলাপের তাগিদে নয়। শেষ জীবনে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, বুদ্ধদেব বসুকে কবিতা পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যা প্রসঙ্গে (আঘাট ১৩৪৮, যদিও বৈশাখে প্রকাশিত) :

‘তোমরা আজকাল এ সব আদর্শ মানতেই চাও না। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়বে। কিন্তু মাঘের দুঃখে মাঘের দারিদ্র্য সত্যি যদি তোমাদের মন টুলতো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিরে-বিনিরে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে। তোমাদের কাজ সাহিত্য,— হয় তোমরা ভালো করে সাহিত্য গড়ো, নয় তো এসব ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।’

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তৃতীয় বিতর্ক সাহিত্যের আভিজাত্য আর তরুণ্য নিয়ে। অমল হোস, শনিবারের চিঠি, সজনীকান্ত দাস ইত্যাদির রচনা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কে নেমেছিলেন। তাঁর চারটি প্রবন্ধ এই বিষয়ে :

সাহিত্যধর্ম, রচনা আঁবণ ১৩০৪

সাহিত্যে নবত্ব, রচনা ২৩ আগষ্ট ১৩১৭

সাহিত্যরূপ, ৪ চৈত্র ১৩০৪

সাহিত্যসমালোচনা, ৬ চৈত্র ১৩০৪

এই পর্ষদের বিতর্কে দুটি প্রশ্ন ছিল, একটি দারিদ্র্যনা, আর একটি অস্বাভাবিকতা। দ্বিতীয় প্রশ্নটি নগণ্য, লক্ষ্য করবার যা তা হলো, যৌবনে অস্বাভাবিক অভিমোগে অভিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়বে অন্ধকে আকর্ষণ করছেন অস্বাভাবিক জ্ঞান। এ বিষয়ে তাঁর মত, ‘কামনার উদ্ভব কিছু থাকে না। উদ্ভবটাই

মানবর্ধে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। প্রথম প্রসঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ (সাহিত্য সমালোচনা),

“তোমরা যদি সর্বদা বাস্পরূপে কঠে ‘দরিন্দ্রনারায়ণ’ ‘দরিন্দ্রনারায়ণ’ কর তাতে করে এমন একটা বায়বুদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিন্দ্রনারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব পরিব্রজ জগৎ কাঁদব। এরকম ভঙ্গিমা বিস্তারের প্রশংসা সাহিত্যে অপকার করে। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকার উচিত যে, আমি যা লিখছি ‘পরিবিয়ান’ বা ‘মৃগ’ প্রচারের জন্ত নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি।”

এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন, ‘দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছেন।’

এই বিতর্কে (১২২৭-২৮) রবীন্দ্রনাথ বংশোদ্ভিক চোখরাজানি, রাশিয়ান হেডমাস্টারি ইত্যাদির কথা বলেছেন, বর্জ্যীয়া ফিউডাল ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেন নি। কেননা তখনো বাংলা সাহিত্যে সমালোচনায় ওই সব শব্দের চল হয় নি। শব্দগুলো এল ১৯৩৭ সালের কাছাকাছি সময়। চতুর্থ বিতর্ক সাহিত্যে এই মার্কামারা নিয়ে। তার সঙ্গে যুক্ত হলো সাহিত্যের অস্পষ্টতা আর বিকৃতি। আধুনিক সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্ট আর বিকৃত সাহিত্যই বুঝতেন। রবীন্দ্রবিরুদ্ধের চরুটা পূর্ণ হলো, রবীন্দ্রনাথ এক মেক থেকে অল্প মেকতে চলে গেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে অস্পষ্টতার বিকৃতির অভিযোগ এনেছিলেন হিজেল্যান্ড; সেটা ‘হাসির সমালোচনা’ বলে আখ্যাত হয়েছিল। এবার রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করছেন, ‘আমার শব্দের মধ্যে অর্থ চুকে পড়েছে—ওটা বরষের দোষ।’ আর বিকৃতি নিয়ে বলছেন, ‘এই যুগের মধ্যে যে আবর্তন যে আবিলতা এসেছে আমি জীবন আরম্ভ করেছিলুম তার থেকে দূরের হাওয়ায়।’

বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক বাধ্য আলাচনা শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বহুকে গিবেছিলেন, ‘তাই তোমাদের ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমিও কোমর বেঁধে লাগব বাড়াবাড়ি করতে।’ এ চিঠি লেখা ২৪ মে ১৯৪১ তারিখে। ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আগে প্রকাশ পেয়েছিল অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা

১৭ মার্চ ১৯৩৯ তারিখের চিঠিতেও। এই দুই বছরের মধ্যে অল্প চিঠিতে, প্রবন্ধে এবং কথাবার্তায় রবীন্দ্রনাথ তীব্র আপত্তি জানাতেন সাহিত্যের ইতিহাসভিত্তিক ব্যাখ্যায়। ইতিহাস-ব্যাখ্যা তিনি নিতে পারেন নি কেন, সেটা দেখা উচিত।

বৌদ্ধকাহিনী সকলেই পড়েছেন, কিন্তু সকলেই তো সেই কাহিনী নিয়ে কবিতা লেখেন নি। পল্লীগ্ৰাম তো সকলেই দেখেছেন, কিন্তু পল্লীগ্ৰামের গল্প তো রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ লেখেন নি। স্থল থেকে বাড়ি কিরে এসে বা ভোরবেলা আচ্ছন্নের মতো শিশু রবীন্দ্রনাথ তাকিয়ে থাকত পাছপালার উপর আলোর স্পন্দন দেখার জন্ত, অল্প বালকেরা তো থাকত না। ‘সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা’ প্রবন্ধে পরিবর্তিত বুদ্ধদেব বহুকে লেখা ওই চিঠিতে তাই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত:

১. “চার দিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকত তা হলে সকালবেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেত, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সবারে এসে সমস্ত দৃষ্টটাকে অস্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে—সে এইখানেই।”

২. “একদিন স্থল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক আতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে বাচ্ছে ঘাস—এই গাধাগুলি বুটশ সাস্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয় নি আদিকাল থেকে—আর-একটি গাভী সম্বন্ধে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই-যে প্রাণের দিকে টান আমার চোখে পড়েছিল, আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চিত জানি, সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধ চোখে দেখেছিল। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ সেখানে ব্রিটিশ সবজেন্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গবর্নেন্টের রাষ্ট্রিক আদাননি নয়।”

৩. অকস্মাৎ ‘কথা ও কাহিনী’র গল্পদ্বারা উৎসের মত নানা শাখায়

উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল হুতরাং বলতে পারা যায় ‘কথা ও কাহিনী’ সেইকালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই ‘কথা ও কাহিনী’র রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল। ইতিহাস তার কারণ নয়।

রবীন্দ্রনাথের তাই সিদ্ধান্ত, “সেখানে আমি আর-কিছু নই— কেবলমাত্র কবি— সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত।” এবং আরো সিদ্ধান্ত, “ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা, মাহুষের সারথ্যে চলছে বিরাটের মধ্যে— ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আবার কেন্দ্রস্থলে।”

শিল্পের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যা অল্পযায়ী নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যাটাই যে ভ্রান্ত একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ব্যাখ্যাটা তিনি কি ঠিকভাবে নিয়েছিলেন? পাতার উপর আলোর খেলা দেখে সকল দর্শক একইভাবে উত্তেজিত হবে, এটা ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যা অবশ্যই নয়, তাহলে দ্বন্দ্ব শব্দটির উপস্থিতির প্রয়োজন হতো না। ইতিহাস এবং মাহুষ, দুয়ের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাতেই মাহুষের মন তৈরি হয়ে ওঠে, এটাই ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যা। হুতরাং বুদ্ধকাহিনী পড়ে সবাই ‘কথা ও কাহিনী’ লিখবেন, এটা হতেই পারে না, বুদ্ধকাহিনী একটি বিশেষ মনে যে ছায়া ফেলেছিল সেই মনেরই সৃষ্টি কথা ও কাহিনী। হুতরাং মাহুষের সারথ্যে ইতিহাস চলছে, এ কথা মেনে নিতে কোনো অস্বীকার নেই। কিন্তু তারই সঙ্গে মেনে নিতে হয় আর-একটি দিক, মাহুষও চলে ইতিহাসের সারথ্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের একটা চিন্তিতেই এর প্রমাণ মিলবে। আশ্বাচ ১০৮৭ ‘কবিতা’ পত্রিকায় বুদ্ধদের বহু ‘চোখের বালি’র সমাপ্তির প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন, “যে-সংসাহস নিয়ে তিনি বইটি লেখা আরম্ভ করেছিলেন, শেষ মুহুর্তে, কিংবা মধ্যপথেই, তাকে তা পরিত্যাগ করেছিল; হিন্দু বিধবার বিবাহ ঘটাতে সাহস পেলেন না, তার দ্বারা প্রসঙ্গ ঘটাতে গিয়েও পিছিয়ে গেলেন।” যে মহত্তর নীতিজ্ঞান শিল্পের কাণ্ডারী, তার বিচারে এই সমাপ্তি কিছুতেই স্বীকার নয়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিবাদ মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার ভাষা হলো (বুদ্ধদেবকে চিঠি, ২৪ জুন ১৯৪০), “চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে-মনে অস্বস্তি করে এসেছি। নির্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

মাসিক পত্র অনেক সময় লেখকদের অসতর্ক করে দেয়, লেখায় সত্য দানের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করবার দিকে ঝোঁক আসে। এই দুর্ভাগ্য করেছি, কিন্তু তাতে কল পাইনি, পাঠকরা যথেষ্ট চোখ রাঙিয়েছিল।”

মনোরঞ্জনী প্রলেপ লাগানোর পিছনে যে সংস্কার কাজ করেছিল সেই সংস্কারটি ইতিহাস থেকেই এসেছিল। বিধবা-বিবাহ দেবার সাহস রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই ইতিহাস-জ্ঞাত সংস্কার থেকেই, যদিও বিনোদিনীর তীব্র স্বতন্ত্র চরিত্র তৈরি করেছিলেন আবার সেই ইতিহাসের প্রেরণাতেই। ফিউডাল সমাজ এবং বর্জীয়া সমাজের মার্কামারি রাস্তার থাকার ফলেই হয়তো স্বাধীন নারীর চরিত্র ঝাঁকতে ঝাঁকতে রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারে আটকে গিয়েছিলেন। তখনই মনে হয়, ‘সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, “বাহিরের বস্তুর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জীববদ্ধ নই” সে-সময় রবীন্দ্রনাথ বাক্তি-থেকে-বৃহৎ ইতিহাসকে অদ্বৈতিকভাবেই অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিলেন।

শিল্পের ইতিহাসে সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক কথাগুলো তাই শুধুই মার্কামারা নয়, শিল্পের এবং শিল্পীর ব্যাপ্তি এবং সীমার ব্যাখ্যা হয়তো সমাজের বিশ্লেষণ থেকে অনেকটাই পাওয়া যায়। মার্কসীয় ব্যাখ্যার এখানেই সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যাপারটি তলিয়ে দেখতে চান নি। ‘আজকালকার সমালোচনার দেখি বড় নামকরণের উপর ঝোঁক— কে বর্জীয়া, কে ফিউডাল এই-সব কথা। এ-সব বাজে। আর্ট কখনো দাগা বুলিয়ে চলে না। সে আপনাতে আপনি প্রকাশিত।’ এ কথা সত্য আর্ট দাগা বুলিয়ে চলে না, কিন্তু আর্টের পিছনে যে শিল্পী, সেই শিল্পীর কল্পনা সমাজ, কিংবা আরো সংঘত করে বললে, শ্রেণীসত্তা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, “তুমি কি বলবে, আজ আমাদের জীবনে এত দুঃখ-দারিদ্র্য বলে আকাশে চাঁদ ওঠে না। মাহুষ ভালোবাসে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কি?” বুদ্ধদের কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কি না বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু এ কথাটা বলা যেত, সাহিত্য যখন মাহুষ ও সমাজের সম্পর্ক দিয়ে রচিত, তখন সামাজিক শক্তির ছাপ থাকবেই, কিন্তু যদি সাহিত্য রচিত হয় মাহুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে তখন সামাজিক শক্তি অনেকটাই দূরে থাকে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসত্তা-প্রাথমী ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি, এ কথা মার্কসবাদ দাবি করে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত মাহুষই

মাহুষের সব পরিচয় বহন করে না, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামী মাহুষেরও আর-একটি পরিচয় আছে। পাতার উপর আলোর স্পন্দন দেখে মুগ্ধ হতে পারে সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সাম্যবাদী সব মাহুষই, সেই সম্বন্ধস্থাপনে শ্রেণী-সংগ্রাম বড়ো কথা নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মাহুষের সম্পর্ক সেখানে শ্রেণীসংগ্রামে আচ্ছন্ন নয়। কিন্তু সামাজিক মাহুষের ছবি যখন আঁকতে যান শিল্পী, তখন এ কথা মানা মুশকিল, “সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিকে মানবজীবনের সেই স্বহৃৎধের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিকেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক স্বহৃৎধ নিয়ে—কখনো-বা মোগলরাজত্বে, কখনো-বা ইংরেজরাজত্বে তার অতি সরল মানবদ-প্রকাশ নিত্য চলেছে—সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল ‘গল্পগুচ্ছে’, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।” এই সরল মানবদ প্রকাশ কী? রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল নিশ্চয়, তাঁরই কথায় “একটি মেয়ে নৌকা করে শস্তর-বাড়ি চলে গেল। তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে-নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে। শস্তরবাড়ি গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা ফ্যাপাটে ছেলে।” কিন্তু সত্যসত্যি কি এই সরল মানবদেহের আড়ালে কোনো সামন্ততন্ত্র কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র কাজ করছে না? ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশের ব্যাখ্যা সামাজিক শক্তি যতটা সহজে করতে পারে ততটা অবশ্য করতে পারে না সাহিত্যের গঠনের ব্যাখ্যা। ‘কবিতা’ পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সেই চেষ্টা করেছিলেন কিছুটা, কিন্তু পেয়ে ওঠেন নি।

“রবীন্দ্রনাথ গল্পকবিতায় নিম্ন মধ্যবিত্তকে যে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন আমার মতে তার কারণ সমাজেও বুর্জোয়া চেয়েছিল নিম্ন মধ্যবিত্তকে নিজের দলে। অর্থাৎ ১৯১০-২২ এবং ১৯২২-৩৪ এর আন্দোলনে মধ্যবিত্তের সহায়তা ও ঠিক তার পরপরই কাব্যে মধ্যবিত্তকে গ্রহণ করা—এই ঘটনাগুলির একত্র সমাবেশ নিছক আকস্মিক নয়। তাছাড়া বিশেষ করে লক্ষ্য করার কথা লিপিকার সময় রবীন্দ্রনাথের কিছু দ্বিধা ছিল গল্পকবিতা সম্বন্ধে— ১৯১০-২২ এর আন্দোলন খুব দীর্ঘও হয় নি, গভীর হয় নি। তারপর অনেক বছর গতো তিনি কবিতা লেখেন নি—সমাজে মধ্যবিত্তদের করার কিছু ছিল না বলেই বোধ হয়। তার পর ‘পুনশ্চ’র সময় গল্পকবিতায় তাঁর আর দ্বিধা নেই, এবং এবার পরের

পর তিনি অনেক কাব্যগ্রন্থ লিখলেন গদ্যে—পুনশ্চ, পত্রপুট, শেষ সপ্তক, শ্রামলী। ১৯২৯-৩৪ এর আন্দোলন দীর্ঘ ও গভীর ছিল বলেই কি?”

এই ব্যাখ্যার হাশ্বকরতা এতই প্রকট, যে বিশদ করার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথের ছন্দভাবনার ইতিহাস দেবীপ্রসাদ মোটেই ব্যাখ্যার সমর্থ ভাবেন নি; নিজের স্ববিধেমতো বুর্জোয়াদের মধ্যবিত্ত-সাহায্য প্রয়োজন অপ্রয়োজন ভেবে নিগোছেন; পরিবদের জ্ঞাত লিখতে হলে গল্পকবিতা প্রয়োজন হবে কেন সে বিষয়ে তো ভাবেনই নি, হয়তো তাঁর ধারণা ছিল গল্পকবিতার ছন্দের বালাই নেই এবং ছন্দ ব্যাপারটা বড়োলোকদের টাকার মতো।

সাহিত্যের দুই ছবি—একটি বিষয়ের, একটি রূপের। ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যায় বিষয়ের বিশ্লেষণ আজ সম্ভাব্যজনকভাবেই পাওয়া সম্ভব, কিন্তু রূপের, সাহিত্যের গড়নের, প্রকরণের, আদিকের ব্যাখ্যা এখানে পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা (রূপশিল্প, ১৩৪৬ আঘাট) যেনে নিতে আমরা বাধ্য, “প্রকৃতির রাজ্য মায়ার খেলা। ইন্দ্রিয়বোধের দ্বার দিয়ে কল্পনাট্টির প্রাঙ্গণে তায় ইস্রজাল। সেই মায়াবিনী প্রকৃতির সঙ্গেই রসপিপাসাহ মাহুষের কারবার। উদ্ভিদবিজ্ঞানী পদ্মকে সওয়াল জবাব করে করে যে তত্ত্ব আদায় করেন সেটা মায়ার আবরণ ধসিয়ে দিয়ে, তাতে বুদ্ধি পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু পদ্মরূপেই যে পদ্মের চরম প্রকাশ, তাকে দেখেই রূপবিলাসী বলেন, বাস, আর কোনো অর্থ চাই নে—ও নিজেতেই নিজে সার্থক। কোন্ মায়ার গুণে পদ্ম মনকে টানে, চোথকে ভোলায়, পে তখুঁজে বের করবে এমন লাবণ্যেরটি নেই।”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন কর্মের স্থান আর শিল্পের স্থান স্বতন্ত্র, তখন তাঁর কথায় গুরুত্ব দেওয়া যায় না। বছর ছয়েক আগেই ১১ এপ্রিল ১৯৩৯, অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি তাঁর বিশ্বাসের কথা লিখছেন, ‘স্বধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা প্রসঙ্গে, “সাহিত্য-রচনায় কারো বা চিন্তাবৃত্তিতে কল্পনার কতটুকু কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তনা আছে তাকে বলা যেতে পারে লোক-হিতৈষ্য, তাতে প্রয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর প্রয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা।”

নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নন্দগোপালের ‘বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা’ বই সম্বন্ধে “ভয় করে আজকাল তোমাদের লেখা পড়তে। ঠিক বুঝেই পারি না কি তোমাদের বক্তব্য। সময়-মর্থে একটা কথা আ

এসেছে বুর্জোয়া— যা কিছু অনভিপ্রেত, যা-কিছু আপন অভিমতের প্রতিকূল, তাকেই তোমরা বলছ বুর্জোয়া। সভ্যতার ইতিহাসে বুর্জোয়াদের অভ্যাদর ত একটা স্তর, সে স্তরে যা শিল্প বা সাহিত্য হয়েছে, তা কি তোমরা বলবে কিছু নয় ?”

রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের কারণ ছিল না। ‘কবিতা’ পত্রিকার রবীন্দ্র-সংস্খাভেই, যে কবিতা পত্রিকার প্রসঙ্গে এই আলোচনা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন :

“প্রথমত রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলাটা অপবাদ দেওয়ার সামিল নয়, একটা ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখমাত্র। এবং এটা অনিবার্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্থাৎ ভারতবর্ষে বণিকসভ্যতা যে রকম অনিবার্ণ ছিল সেই রকম তাঁর পক্ষে বুর্জোয়া কবি হওয়াও অনিবার্ণ ছিল। তাছাড়া ব্রাহ্মণ সভ্যতা থেকে বৈষ্ণব সভ্যতা একটা প্রকাণ্ড সামাজিক অগ্রগতিই। বাংলা সাহিত্যে এ অগ্রগতির কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ কথটা এত বেশী স্পষ্ট যে লিখতে লজ্জা হয়।”

বুর্জোয়া শব্দটি বাংলা সাহিত্য আলোচনায় যিনি পথিকৃত সেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও এই কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে শব্দটি ব্যাজগতি বলেই মনে হয়েছিল। নন্দগোপালও সে-কথা বলতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “সেইটুকুই সাক্ষ্য, কিন্তু এটা প্রায়ই দেখি না আজকাল। রাজনীতির মতো সাহিত্যেও আজকাল কোমর বেঁধে regimentation প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে। এটা হয়েছিল রাশিয়ায়ও। দেখছি, চেকভকে একদিন অপরাধের করা হল, কিন্তু চললো কি তা ? রুশরা আজ লাখে লাখে আবার চেকভ পড়ছে, সেক্সপিয়র পড়ছে, গ্যায়টে পড়ছে।”

‘কাছের মাহুষ রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে উদ্ধৃত এই কথোপকথনের সময় ১৯৪১। ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন চেকভ অপাঙ্ক্লেস, ১৯৪১ সালে দেখেছেন চেকভ আবার সমাদৃত হচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে হয় রাশিয়ায় সাহিত্যক্ষেত্রে regimentation এই দশবছরে বন্ধ হয়েছে অথবা রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ভুল তথ্যের উপর তৈরি। আসলে চেকভ ১৯৩০ সালেও অপাঙ্ক্লেস ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ ভুল জেনেছিলেন।

রাশিয়া থেকে নিয়মিত পাঠানো বইপত্র রবীন্দ্রনাথ কি আগ্রহ নিয়ে পড়তেন ? এ বিষয়ে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন :

‘মার্ক্সবাদ ও কম্যুনিষ্ট ছুনিয়া সম্বন্ধে পড়াস্তা তাঁর একটু সীমাবদ্ধ ছিল।

লেনিন ও উটস্কির রচনা অল্পসল্প পড়তে দেখেছি। এছাড়া ল্যান্সি, শ’, আন্দ্রে জিঁদ, ইথেল মেনিন, ওয়েব দম্পতী বা ওয়েলস-এর লেখাও পড়েছিলেন কিছু কিছু। কডোয়েল ও র্যালপ ফক্স পৌছেছিলেন তাঁর হাতে, কিন্তু সম্যক অহুশীলনের সময় হয় নি বোধহয়। মনে হয়েছে, মার্ক্সীয় দর্শনের বস্তুমুখিতা, ধনসাম্যের ভিত্তিতে নূতন বিশ্ববিধান পড়ার জন্তে মার্ক্সপন্থীদের বৈপ্লবিক কর্মনীতি বা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক সমানাদিকারাদ্বক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে সুস্পষ্ট একটা নেতি ভাব ছিল। এই সব প্রশ্নের আলোচনায় এলে তাই তিনি সাধারণত একটু উত্তেজিত হতেন।”

যদিও অরণ্য তবু নির্বাসন নয়

নমিতা বসু মজুমদার

উনিশ শো বিরাশির ছয় মে হাতে একটি কবিতা-সংকলন এসে পৌঁছল। ছয় মে, মুখোমুখি পঁচিশে বৈশাখ। পঁচিশে বৈশাখের সঙ্গে কবিতার অষ্টাদশী সংস্করণ ভারনার অভ্যাস অনেকদিনের। যদিও অনেকসময়ই স্বধন্দ্যায়ী নয়, দাঁড়িপাল্লার মাপে চড়ালে আশা কোন শুল্ঠেই যে থাকত উঠে। কত ভেবেছি; রবীন্দ্রসংগীতের গান অংশ এত ভরা, এত ভারী। এমন মঞ্চভরানো। তার কবিতা অংশ যাকে মিলিয়েই শুধু নয়, যার ওপর ভর রেখে দাঁড়িয়েই রবীন্দ্রনাথের গান—রবীন্দ্রসংগীত সেই কাব্যবাণেশের উত্তরাধিকারের প্রতি কেন এত উদাসীন? বহির্ভেদে পঁচিশে বৈশাখের আয়োজনে আজ থেকে বারো / তেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথের গানের, নাচের, কবিতা-আবুত্তির সঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিয়েছিলাম ছোটো প্রবন্ধনীতে। প্রবন্ধ, নিবন্ধ না বলে তাকে চিন্তানাশ বলাই সংগত। চিন্তাচিন্তে ইচ্ছা করেই চিন্তার যে কারিগরী দিক্, নির্মাণের যা, আর্কিটেকচারাল, আডাল রেখেছিলাম। জটিল আঙ্গিকের জালবুজনির লোভনিতো বাই নি। আমার বেদনার উন্মোচনকেই ধরেছিলাম। লেখার নাম : পঁচিশে বৈশাখ, কবিতার কান্না। সেদিন আমরা প্রায় কান্না পাবার উপক্রম। ছুঁচোরজন ছাড়া সকলেই আলোচনা মুখর হলেন। গুণ্ডুনিয় শুধু হয়ে গম্ভীর করতে লাগল রবীন্দ্র-ভক্ত-শ্রোতৃমণ্ডলী।

এর অনেকদিন আগে এমন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সন, তারিখ মনে নেই, স্থান বোধকরি, ইডেন-উদ্যান। পাঠ : নামী, যদ্যনামী, অল্পনামী কবিতা। অ্যালেন গিন্সবার্গও ছিলেন। সাজানো মঞ্চ। মঞ্চের সমুখে মাঠে পরিপূর্ণ অড়িয়ে। মাইকে ধোয়ণা : কবি-সম্মেলন শুরু হচ্ছে। মুহূর্তের বেশি সময় লাগল না। দ্রুত পলায়নপর দংশিত অড়িয়ে। দেববার

মতো সেই দ্রুততা। কয়েক মুহূর্তেই পরিপূর্ণ স্থান শূন্য; শুধু কয়েকজন বসে। একজন প্রখ্যাত কবি মন্তব্য করলেন : এ যেন মাজির বাকীকে দ্রুত পড়ল।

টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট-এ A. Alvarez-এর একটি লেখা বার হয়েছিল (১৯৫৮তে)। মন্তব্য করেছিলেন :

কবিতা একযোগে least and most threatened by mass communications and mass culture. যদিও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সাপ্তাহিক ও সাময়িকপত্রেরা নিয়মিত কবিতা প্রকাশ করছেন তবু সাধারণ পাঠকসমাজের অল্লাংশই মনোযোগী। মাত্র তিনজাতীয় পাঠক কবিতায় মন দেন।

১. কবির সাক্ষ্য সম্পর্কিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়

২. হবু কবিদল।

৩. পেশান্তর্গত সমালোচক ও শিক্ষক।

তার মতে, সাধারণ পাঠকের কাছে আজ কবিতার পাঠযোগ্যতা হ্রাসিয়েছে। সপ্তদশ ও আঠারোতে ডিপ্লোম্যাটরা, আইনজীবী, ধর্মযাজক, রাজনীতিবিদ সকলেই ছিলেন, কিছু কিছু কবি। ফলও আয়োজন, দরাজ পরিবেশন ছিল। উনবিংশে মরলে কবিতার স্রণযোগ্য হতে পারত। বিশ শতকে সে সম্ভাবনা নেই। এখন কবিতার মৃত্যু ঘটলে, “there would be few mourners.”

আলভারেজের এই সমালোচনা-উক্তি পর বহু গেল বহু জলধারা। কবিতার জগতে জলরাশি ভেদ করে অনেক দীপ উঠল, পড়ল, ডুবে গেল, আবার থেকেও গেল অনেক মাথা উঠু। মাঝে মাঝে ভেবেছি, আধুনিক কবিতার সঙ্গে এমন বিচ্ছিন্নতা কেন ঘটল সহস্রাব্দ-বৃন্দ পাঠকদের? অথচ কবিতা ভালোবাসার প্রত্যাশী। ভয়ংকর ভাবেই প্রত্যাশী। শুধু লিখেই আনন্দ নয়। কবিতার প্রকাশ, তার পাঠক, তার শ্রোতা, কোনো কবির কাছেই মিথ্যা নয়; মস্ত বড়ো সত্য। এত সত্য জেনেও কেন ভেঙে গেল কবি-পাঠকের সেতুবন্ধ? জানি, একটি অভিমানী-হৃদয় বৃকের গভীরে লালন করেন কবিতা। ভালোবাসার প্রত্যাশী অথচ মুখর হয়ে উঠতে স্বভাবের মধ্যেই বাধা। সে তো আর ভিক্ষুক নয়। অতঃপর আমাকে যদি না চিনলে, “নাইবা চিনিলে” এই অভিমানী-ভাবনায় কবিকুলের অনেকেই সরে গেলে পাঠকদের কাছ থেকে দূরে। স্ব-বুধে, স্ব-চিন্তনের দূরগরিবেশিত জুর্গে অবস্থিত করালেন নিজেকে; সঙ্গে অল্প কয়েকজন পাঠ-মিত্র।

এই পর্বন্ত শুনে আমার স্বামী শ্রীবহু মন্তব্য করলেন :

—অভিমানী হৃদয় নিয়ে স্ব-চূর্ণ বন্দীটনীর তোমরা হও নি বাপু। কৌশল করতে গিয়েছিলে। এবং প্রবাদ বাক্যটি মিথ্যাই প্রবাদহ প্রাপ্ত হয় নি : কৌশল ঘারা কোনো মহৎ কার্যের সমাধা হয় না।

তারে ছুটি প্রশ্ন বিদ্ধ করে গেঁথে নিলাম :

—কবিতা রচনাকে মহৎ কর্মই বা বলবে কেন? এবং কবিদের স্ব-চেতনায় সং হওয়া কেন কৌশল?

শ্রীবহুর অভিমত :—সমস্ত শিল্প, সাহিত্য, কাব্য রচনার মূল কথাটা কী? মূল কথা, শিল্পী বা কবির মধ্যে এমন কিছু বিশেষ বাড়তি ঐশ্বর্য আছে যাকে সে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। এটা সেই অবস্থা, যে-অবস্থায় এক বলে : বহু হব। তার মধ্যে বহুরের ক্ষমতা। রসভারে পরিপূর্ণই অজস্র দান করে অনেকের মধ্যে। মহৎ কবি অভিমানী নন। বুদ্ধি এবং বোধে হিতধী। অন্তত, পাঠকসমাজের কাছে ভিক্ষুরের হাত পাতেন না। হাতেও না, মনেও নয়। নিজের ভালোলাগা, ভালোবাসাকে অন্তের ভালোলাগা, ভালোবাসাতেই ছড়িয়ে দেয়। দাতার হাত থেকে অস্তিত্ব-আলোড়নকারী কিছু পায় বলেই পাঠক সন্তুষ্ট রক্ষার আগ্রহী। না হলে তার দায় কি? কোনো একজনকে অথবা কবি, শিল্পী, তারকা করে তোলবার দায় সাধারণ মানুষের নেই।

—যেন মনে হচ্ছে মহৎ লেখকের নাম করে থাইস্টের বর্ণনা দিচ্ছ। দাতা-গ্রহীতার সত্যযুগের অবধান হয়েছে। দান-গ্রহণের চেয়েও সমান-হৃদয়ের দাবিই এ সময়ে বড়ো। সময় যাপ্ত-অসার করে এমন একটা জায়গায় এসেছে, ডেমোক্রিসের যুগে বহু হৃদয়-মন নিয়ে বহুজন কবি, শিল্পী হতে এসে স্ব-চেতনায় সং; হয়তো কিছু ভুল করেছিল স্ব-চূর্ণবন্দীরা, ঠিক কৌশল করেনি।

—কিন্তু অবজ্ঞা করেছিল সাধারণ মানুষকে। এমন স্পেশালাইজড, এতই ব্যক্তিক চিন্তা-ভাবনায় অগ্নিত শব্দসমূহ, চিত্রকল্পের ধূস্রজাল, সাধারণ মানুষ ভেদ করতে পারল না। তাদের কাছে আধুনিক কবিতা হয়ে দাঁড়ালো স্ট্যাটিস্টিক্সের মতো। আধুনিকবিজ্ঞানের জটিলতম শাখার মতোই ছুঁতে। সেই শব্দাবলী, চিন্তাবলী, প্রয়োগ-সমগ্র, আঙ্গিক বৃথতে গেলে অনেক দিনরাত অতিবাহিত করতে হবে। প্রায় অসম্ভবের দিকে তাকিয়ে সাধারণ পাঠক উপলব্ধি করল : লেখকের সত্যতায় পাঠকের জন্মে কোনো দায় নেই।

যে কবিতা-সংকলন নিয়ে শুরু, তার নাম : ‘হে অরণ্য হে নির্বাসন’। ছ’বছর আগেই বাস করা, আমার ব্যক্তিসত্তায় একবছরের সংলগ্নতায় সংলগ্ন একটি নগর দীপ্যমান হলো। শাল, শিরীষ, বট, অশ্বথ, মহানীমের অরণ্য-পর্বতের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো জবলপুর। স্থির নিশ্চল মাহাজ্ঞ, এত মাথা-উঁচু নীম, শিরীষ, ইউকালিপটাস্ খুব কমই দেখেছি। জবলপুরের অভিনাশ ফ্যাক্টরি, অবিবাসীদের সেক্টর, ক্যান্টনমেন্ট, হাইকোর্ট, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, নদী নর্মদা, নর্মদাতীরবর্তী জিপুরীগ্রাম, যার ছোটো পাহাড় টিলার চূড়ায় হয়েছিল জিপুরীকংগ্রেস-অধিবেশন; দূরে বৃহৎ পাথরখণ্ডে অবস্থিত গণ্ডারানার রানী দুর্গাবতীর ভগ্নদুর্গাবশেষ, যা-ই দেখতে যাও, একটু পাহাড়-আভাসলাগা টিলা, একখণ্ড ঘন সবুজ অরণ্যর সাক্ষাৎ মিলবেই। নদী নর্মদা : বিদ্যাপর্বতের অমরকটক যার উৎস, কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে স্বপ্নিল নাম : রেবা, জবলপুরের দক্ষিণে, তারো দক্ষিণে দাঁড়িয়ে সাতপুরা পর্বত। একটু সময় হাতে পেলেই চলে যেতে পারো সকলের সঙ্গে কিংবা একাকী জ্যোৎস্না-রাতে; বনে নয়, মার্বেল রক্‌সে। নর্মদার বৃকের মধ্য থেকে উঠে সোজা মাথা উঁচু ধব্ধব্ করছে সাদা পাথরের পাহাড়। জ্যোৎস্না-রাতে মায়াবী, অপার্থিব।

অরণ্য-পর্বতের এই স্তম্ভতার, স্থিরতার, মৌনতার মধ্য থেকে কয়েকটি মাহু বার হয়ে এলো। স্থির থেকে অস্থির। নিঃশব্দ মৌন হল মুখর। হেনা হালদার, অশ্ব রায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, হুমন মিশ্র, অমিত ভট্টাচার্য, স্থপন দত্ত।

হেনা হালদারের মধ্যে শুনতে পেয়েছিলাম উজ্জ্বলিত জলশব্দ। হাসির ধ্বনি ছিল শিশু জলপ্রপাত শব্দে। মনে হত না, এতখানি বয়সে পার হয়ে এলেন। গহন-অভাস্তরে রেখে দিয়েছিলেন চঞ্চলচরণ কিশোরীকে।

তাহলে কোনটা ভূমি? যে বসে স্থতির চরণ কাটে?

ভাল বেটে বড়ি দেয়, নক্সা থাকে নাতনীর কাঁধায়?

কণ্ঠবোর গম ভাঙে সময়ের নির্ঘম জাঁতায়?

নাকি যে খঞ্জন হয়ে নাচতে চায় ছুরন্ত পাখাটে?

(হেনা হালদার)

হেনা বলেছিলেন—আজ থেকে কুড়ি বছর আগে দেখা হলে নিশ্চয় আমার পরস্পরের নাম ধরেই ডাকতাম। ভূমি বলতাম। দোহাই আপনায়,

আর যাই করুন, আমাকে মিসেস হালদার বলবেন না। আমিও আপনাকে মিসেস বাস্তু বলব না।

—কী বলবেন নমিতা দেবী? আর আমি হেনা দেবী?

—উহু।

—রাষ্ট্রভাষার শরণাপন্ন হই তা হলে। হেনাজী, নমিতাজী।

—আমার মেয়ে ঈগুগির আসছে, কাশ্মীরে থাকে। আমাদের দেখা-দেখি সে আপনাকে আকিজী বলুক আর কী?

দুজনেই হেসে উঠেছিল। হাসি থামিয়ে বললেন:

—উনআশিতে এলেন, যাবেন শুধু আশিতেই। মাঝখানে একবছরের ক্ষণকাল। আমরা দুজনেই দুজনের ক্ষণিকা।

তারপর থেকেই ক্ষণিকা নামে ডাকাডাকি। আমি একটু রিজার্ভড, তত উজ্জল নই। কিন্তু, হেনা হালদার? বুকের ভেতর থেকে উজ্জল খুশির জোয়ার ঢেউ লাগিয়ে দোলা দিচ্ছেন শব্দটিকে। তার আগে আরো ছোটো শব্দ বসিয়ে ঘনতর। সবসময় ডাকতেন।

—ও ভাই, ক্ষণিকা।

অনেক সময় ভাবি, কেন এ নাম নির্বাচন। আমাদের বাড়িতে শেষ সাহিত্য-আসর বসল ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯। সেদিন বেশ কয়েকটি কবিতা পড়েছিলেন হেনা হালদার। আমরা চলে আসব আশির জাহ্নয়ারিতে। হেনাই চলে গেলেন। আশির জাহ্নয়ারিতেই গেলেন। একদিন বলেছিলেন: ক্ষণিকালের মধ্যে চিরকালকে ধরা যায় কিনা জানি না, কিন্তু আমার ক্ষণিকা যেন হল চিরন্তনী।

অশ্রু রায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনবন্ধ হতে পারে নি। আলাপচারি মাত্র। গুর-আমার মাঝখানের দেয়াল ভাঙে নি; ছিল বগসের অন্তরাল। তা ছাড়াও অশ্রুতে ঘিরে ছিল একটি আবরণ। তার অন্তর্গতের। রক্তে লোহিতকণিকার ক্রমাবলুপ্তি ঘটছিল। অশ্রু এর গুরুত্ব ভালো করেই জানতেন। রক্তের অহুভব মেখে গিয়েছিল কবিতায়:

রক্তকে লালই হ'তে হবে এমনই কি নিশ্চয় নিয়ম?

যদি হ'ত সাদা কিংবা সবুজ বরন,

ক্ষতি কিছু ছিল না তাতেও,

বরং বিপদ জাপক রঙ বাদ দিলে

মাছুষ কল্পনা পেতো হাতের মুঠোয়।

(শ্রীমতী অশ্রু রায়)

শ্রামল মুখোপাধ্যায় একসময় 'সাতপুরা' বার করতেন। মাসিক না ত্রৈমাসিক মনে নেই। আমার লেখা একটা বেরিয়েছিল, "নববর্ষের দর্পণে রিক্রিয়েশন"। তখন ইন্দোরে থাকতাম। জবলপুরে পরিচয় হলো, আড়ি ভাঙবারই স্বযোগ হলো না। ছ'বার দেখা। মনে হয় কলকাতা থেকে দূরে শ্রামলও কলকাতার ডাইনামিক ফোর্সের বিচ্ছাতি অহুভব করেছিলেন।

তাই ভয় হয়

এই পাথরে বসে

পাথরে বসে থেকে

পাথরে বসে থেকে থেকে

আমিও না একসময় পাথর হয়ে যাই। (শ্রামল মুখোপাধ্যায়)

বারবার পাথর এবং বসে থাকা এই দুই শব্দের আবর্তনে, পতিহীনতাকেই বোধহয় বোঝাতে চাইলেন শ্রামল।

হুমন মিশ্রকে মাত্র একবার দেখেছি ১৪ ডিসেম্বরের সাহিত্য-আসরে। অমিত ভট্টাচার্য, ডাক্তার। পোস্ট গ্রাজুয়েটশিপ করছে। দীর্ঘ গঠন, দীর্ঘতার সঙ্গে ভাল মিলিয়েই পেশীবহুল মেদ। অনেকটা সমরেন্দ্রের মতো। ধোলা, দরাজ, উচ্চকণ্ঠ। কবিতা লিখেছে: লাশকাটা ঘরে—একা।

হুপন দত্ত ছেলেটি বাধার পাহাড় ঠেলেছে। বালকবয়সেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে। অনাস্বাদীয়ে বড়ি। স্থূল ফাইনাল পেরুনা, কলেজ চুকতে-না-চুকতেই বহিবন্ধে। করনিকের চাকরি। মা-বাবা ছোটোবোনের দায়িত্ব সম্পাদন, সঙ্গেই এম. এ. পাস করা। জীবনে যেটুকু সহায়তা পেয়েছে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছে।

আমি বললাম: সামনে সমুদ্র।

একটি নিঃশব্দ বিমুচ্ততা তোমাদের স্পর্শ করে গেল।

অন্তঃপের—

কী ভীষণ নিপুণতায়

তোমরা আমার জন্ত ভেলাটা তৈরি করলো।

হে অরণ্য, হে নির্বাসন। নির্বাসন খীমতি অরণ্যসংযুক্ত বহুদিন। রামচন্দ্রের বনবাস পর্ব কেটেছে নগরকানোয়ার বিদ্যুত অরণ্যে। মেঘদূতের যজ্ঞটির বংশর-কাল বিরহ্যাপন স্থানটিও পাহাড়-অরণ্যেই ঘেরা। আষাঢ়ের প্রথম দিনে পাহাড়গাজেই মেঘের খেলা দেখেছিল। এবং এ পাহাড় রাজস্থানের বৃক্ষহীন অঞ্চল নয়। মধ্যপ্রদেশের শ্রামল পাহাড়।

“অষাঢ় প্রথমদিবসে মেঘমান্নিঃসাহং।” (মেঘদূত)

হাতের কাছে কালিদাসের মেঘদূত বা বাঙ্গালীক-রামায়ণ নেই, অতএব বলতে পারব না নির্বাসন শব্দটি ওই দুই সংস্কৃত কাব্যে উক্ত কি অহত।

পুরো নির্বাসন কোথাও কি কখনো ছিল, কিংবা আছে? যে মাটিতে জন্ম, যে ভাষায় প্রথম মুখের ভাষা প্রসূতি। প্রথম প্রাপ্ত সব প্রিয়জন, সেই আদি আত্মীয়-পরিবেষ্টিত দেশ ছেড়ে যেতে বৃক বেদনায় টনটন করে ওঠে। আবার নতুন দেশ, নতুন মাছ, নতুন ভাষার মধ্যেই মাছ মিলিয়ে দিতে চায় বিশ্ব-মিশ্রিত ভালোবাসা। প্রাণের ধর্মই তাই। অরণ্যবাসকালে রামচন্দ্র যত বন্ধু পেয়েছিলেন, অযোধ্যাতে পান নি। বিরহকাতরতাতোও যক্ষ দেখতে ভুল করে নি সৌন্দর্য। দেখেছিল পাহাড়গাজে মেঘের খেলা হাতির আনন্দ-ক্রীড়ার মতোই দর্শনীয়।

“বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ঃ দর্শনঃ।” (মেঘদূত)

দান্তে এমন-কি, নির্বাসনের ফলে লা দিভিনা কাম্মেদিয়ার কবি দান্তে আলিগিয়েরি সেই তেরো শতকেই ফ্লোরেনটায় নাগরিক থেকে বৃহত্তর নাগরিক হলেন— যতদূর ইতালীয়ান ভাষা উচ্চারিত। যদিও বৃক্কের গভীরে নিহিত অশ্রু-ভরা বেদনা। প্রশ্ন উঠে পড়ে বিশশতকের সাতের / আটের দশকে যখন দিকে দিকে মাছের প্রসারিত বিস্তার। পৃথিবীর কোনোখানেই কি আছে নির্বাসন? অথচ কোথায় ঘেন রয়ে যায় এই নামের কিঞ্চিৎ যৌক্তিকতাও। অস্তত, যে বা ধারা করেছেন এই নামকরণ, তাঁদের কাছে।

সাহিত্য আমার আনন্দ। কবিতা আমার ভালোবাসা। দেড়দশক প্রায় কলকাতা থেকে নির্বাসিত আমাকে সমরেন্দ্র যখন বললেন— এখন কবিতার জমাটি আসর, রবীন্দ্র-সদনে জায়গা দেওয়া যায় না। আমদে হৃদয় হৃদয়ের মতো নৃত্য করলেও প্রশ্ন ছিল: আবৃত্তিযোগ্য?— না, পাঠযোগ্য কবিতাই। এবং অস্তের কবিতা নয়, স্রষ্টচিত।

আবৃত্তিযোগ্য ও পাঠযোগ্যতার কথায় মনে পড়ছে, ইন্দোর মহারাজীর সাহিত্য-সভা একবার কবিসভার আয়োজন করেছিলেন ইন্দোরবাসী সর্ব-ভারতীয় কবি সম্মেলন। হিন্দী, উর্দু, সিন্ধী, মহারাজীর, গুজরাটী, ভোপরী, ছত্তিশগড়ী ও বাংলা। বাংলার প্রতিকৃতি আমি। আমরা ছিলাম চৌদ্দ-পনেরোজন, তিনজন মহিলা। মঞ্চে ছুটি মাইক। একটিতে বসেছেন একযোগে অধ্যাপক ও হিন্দীকবি সরোজকুমার। অল্প মাইকে আসছিলেন, বসছিলেন, পড়ছিলেন এবং উঠে যাচ্ছিলেন অল্প ভাষাভাষী কবিরা। সরোজকুমার প্রতিকবির সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ কবিতাটি পুরো হিন্দী অল্পবাদে শুনিতে অবহিত করছিলেন শ্রোতাদের। পরমুহুর্তে কবিকণ্ঠে বেজে উঠছিল স্ব-কবিতা। হল ভরে গিয়েছিল। হিন্দীভাষার সাধারণ ভঙ্গিমায় “খচাখচ-ভরা ধা”। আমি পড়েছিলাম ‘ঐন্দবী’ ও ‘কুন্তিবাদে’ প্রকাশিত দুটি কবিতা। যেহেতু আমার কবিতার আবর্তন হলো না, পুনরাবর্তনের আগে “বাহা বাহা” “বাহাং আচ্ছা”ও শুনেতে পেলাম না। কবিতার উচ্চারণে সংগীতধর্মিতা অপেক্ষা কাব্যধর্মিতা, কবিতার অন্তর্নিহিত চাপা সুর। চাপা গহনার মতো। একসময় অভিজ্ঞাত মহিলারা স্বকৃৎকে এক স্বাক্ষর সোনার চুড়ির ওপর বাধতেন মসলিন টুকরো। বেশি স্বকৃৎকে নয়; দেখা-না-দেখায় বেশ। পরে শুনেছি, শ্রোতাদের অনেকেই স্বাক্ষর করেছিলেন বাংলা কবিতার অগ্রগামিতা এ ক্ষেত্রেও।

আমার ভালোবাসা দূরপ্রযায়ী হচ্ছে জানলে ভালো লাগে। কবিতার প্রিয়জন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পাক। এ কথা যিনিই উচ্চারণ করবেন তাঁর মুখেই ফুল চন্দন পড়ুক। একসময় কবিতার ক্ষেত্রে “হাম দো, হামারা দো” পরিকল্পনা চালু হয়েছিল। আমি থাকি, আর থাকুক আমার সমানধর্মী ছাত্রজন। দেড়-দুই দশকের আবাদে “গ্রো মোর জুজ” আন্দোলনের মতোই “গ্রো মোর পোয়েট্জ” হয়েছে নিটল ম্যাগাজিনের সহায়তায়। এই-সব কবিতা মিলিত কলম-বিস্তারে বহু পাঠক, শ্রোতার মনন যদি স্পর্শ করে আন্দোলিত করতে পারেন যদি, তার চেয়ে স্বাংবাদ কবিতার জগতে অল্প কিছু নেই।

আজকের দিনে কবিতার জয়ী সম্মেলন। ব্যক্তিক, দেশজ, এবং বিশ্ব-নাগরিক। আমার অস্তিত্বের গভীরতম, জটিলতম, নিহিত সব আলো-আধারকে যেমন ভুলব না। ভুলব না ভাঙাবস্তির নয় ছেলেটাকেও, আবার

এও ফুলব না খেত, গীত, কৃষ্ণদেশের উষ্ণ আবেগিত আন্দোলনগুলি। কবিতা আজ আর শুধু আঙ্গিক নয়, ভঙ্গি নয়, নয় শুধুমাত্র বক্তব্য। কবিতা একটি জীবন। তার যেমন গাঢ় গভীরতা, গোখলি-উষার ধূসরতা, সমস্রাজর্জর দৈনিক দিনগুলি, তেমনই শুভ ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন। সংগ্রামহীন জীবন নপুংসকতার আধার, আবার স্বপ্নহীন জীবনও উদ্বেগহীন এলোমেলো। স্বপ্ন এবং সংগ্রামই আমাদের উত্তরণ ঘটাবে। আমরা যেখানেই যাব, ঋণী হব সেখানেই, নেব আর দেব। বুকের গভীরে বেঁধে নিহিত দীর্ঘশ্বাস, উচ্চারণ করব :

যদিও অরণ্য, তবু নির্বাসন নয়।

সিন্ধুভাষা

বাংলা সংস্কৃতির কানাগলি : আধুনিক গান

সুধীর চক্রবর্তী

সর্বাধুনিক মাল্য তার পোশাক-আশাক খাওয়া-দাওয়া আচার-আচরণ সবদিক থেকে নবীনতম হবার ইচ্ছা-বৌড়ে মেতেছে। এখনকার হুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের যে-কোনো স্বকন্ঠকে বাঙালি যুবক-যুবতীকে দেখলে বোকা যায় গত একদশকে আমাদের কত পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য প্রতিভার প্রকাশ খুঁজতে গেলে আমাদের পঞ্চাশোর্ধ্ব এমন-কি সত্তরোর্ধ্ব মাল্যদেরই এখনো খুঁজতে হয়, বিশেষত বাংলা সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এক কঁাক চকিত উদাহরণ : শান্তিদেব ঘোষ, সুবিনয় রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সূচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মারা দে, ভূপেন হাজারিকা, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, সলিল চৌধুরী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রবিশংকর, আলী আকবর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত নন্দী, প্রহ্লদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তালিকা থেকে বলবার কথা একটাই। এঁদেরও একদিন পচিশ বছর বয়স ছিল এবং (একমাত্র রামকুমার ছাড়া) এঁদের সবাই ছিলেন সেই বয়সেই বিখ্যাত জনপ্রিয় সম্ভাবনাপূর্ণ ও প্রশংশী। কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে, পচিশ বছর বয়সী এঁদের ক'জন শিল্পী বা সুরকারের নাম করা যাবে যাদের নামের আগে বিশেষণগুলি বসানো যায় ? আসলে গলদ অল্প জায়গায় এবং আধুনিক কালের বাংলা গান আটকে গেছে এক কানাগলিতে। নিষ্ক্রমণবিহীন সেই অবরুদ্ধতা থেকে আদৌ মুক্তি আছে কিনা সে মীমাংসার আগে বদ্ধতার সমস্যা ও কারণ অতুসন্ধান সবচেয়ে জরুরি।

এ বছর ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেবে এমন একজন যুবক জানায় : অপর্ণা সেনের 'থারিট পিন্ড' তাকে চমকে দিয়েছে, গৌতম ঘোষের

‘দখল’ দেখার জন্ত সে উৎসুক। আধুনিক কবিতা পড়ে ও লেখে। পঞ্চাশের বাংলা কবিতা তার মতে অগাঠা। আকাদেমিতে ছবির প্রদর্শনী দেখে মাঝে মাঝে, ভালো লাগে। গ্রুপ নাটকের সর্বাধুনিক প্রযোজনা সম্পর্কে উৎসুক। বার্ড থিয়েটার তার ভাবনার বিষয়। সবক’টি উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়ে দেখে। লিটল ম্যাগ থেকেই সত্যিকারের লেখক উঠে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। আর গান? দেবব্রতর গান ভালো লাগত। এখন শান্তিনদের স্ববিরণ কণিকা হুজিয়ার অল্পটন কখনো বাদ দেয় না। রামকুমারের পুরানো বাংলা গান দারুণ লাগে। ইযুথ কন্সার্টের গান মন্দ নয়।

আধুনিক বাংলা গান সম্পর্কে স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা থেকে জানা যায়: এক, আধুনিক গান তার ‘অখাত্ত’ লাগে, শোনে না। দুই, তবে স্বধীরতারের রেকর্ড কিংবা পুরানো হেমন্তের গান আর মালা দে-র প্রথম দিককার আধুনিক গান বেশ লাগে।

আধুনিক বাংলা গানের সমস্যা এই যুবককে দিয়ে শুরু করা যায়: অর্থাৎ প্রথম সমস্যা হলো, এখনকার গান এখনকার একজন আধুনিক যুবককে টানে না। আশ্চর্য যে যদিও শিক্ষিত যুবকটি সর্বাধুনিক বাংলা শিল্পকলার অজ্ঞাত সব মাধ্যম সম্পর্কে উৎসাহী তবু আধুনিক গান সম্পর্কে তার মোটেই উৎসাহ নেই। তা হলে এখনকার গান কাদের জন্ত তৈরি হচ্ছে? রেডিওর প্রচার-তরঙ্গে ও গ্রামোফোনের ডিস্কে যেন-তুন গানের সম্ভ্রাচার চলাছে তা কে শুনেছে? প্রতিপ্রশ্ন: যুবকটি কি গান সম্পর্কে অহুৎসাহী? উত্তরে জানা যাচ্ছে, গান সে ভালোবাসে। রবীন্দ্রসংগীত অতুলপ্রসাদ নজরুল এমন-কি নিধুবাবু দাশরথি রায়জাতীয় গানও তার ভালো লাগে। কেন লাগে? বিষয়ের দিক থেকে ব্রহ্মসংগীত বা প্রাচীন বাংলা গান তার তো ভালো লাগার কথা নয়। তার জীবন-ব্যাপনের ধরনধারণের সঙ্গে সে-সব গানের তো ভাবগত কোনো মিল নেই। শুধু স্বরের গভীরতা বা তালের মজা? গাইবার ধ্যানস্থ ভঙ্গি আর শিল্পীর সাবলীলতা? নাকি অন্ততর কোনো বড়ো ক্ষত তৈরি হয়েছে যার ফলে যে-জীবনে সে বাস করে যে-যুগে, তার কোনো বাগী সে গানে খোঁজে না? নেশাগ্রস্ত আক্ষিপথারের মতো সে পুরানো সময়ের রোমন্থন করে নিজেই স্বধী ভাবছে? সে ক্ষেত্রে তা হলে ফিল্ম-কবিতা নাটক-সাহিত্য বিষয়ে সে সর্বাধুনিক হতে চায় কেন:

এ-সব হলো শিক্ষিত রুচিশীল বাঙালি যৌবন ও আধুনিক গান সংক্রান্ত

প্রশ্ন। অশিক্ষিত ও বিন্দ্রান্ত বাঙালি ছেলেমেয়েদের গানের রুচি-অরুচির প্রশ্ন অনেক সহজ, কেননা তারা বিবিধ ভারতী কিংবা বিদেশী চীংকৃত ডিস্কো শোনে। আধুনিক বাংলাগানের উত্থানপতন আশঙ্কা বা ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়েই তাদের উৎসাহ নেই। তাদের জন্ত সর্বদা উজ্জত রং পেছে অনিশ্চেষ্ট ক্যাসেটের স্রোত।

একালের শিক্ষিত যৌবন যদি আধুনিক গান বিষয়ে উদাসীন তবে সেই গান কি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বাঙালিকে অবসর বিনোদন অথবা স্বহৃদারমতি বালক-বালিকার সেবা? এই পর্যন্ত শ্রোতাদের প্রসঙ্গ। অতঃপর বিবেচ্য যারা গান তৈরি করেন অর্থাৎ গীতকার স্বরকার ও শিল্পীদের কথা। তাঁদের কর্তব্য ও কৃতি বাংলা গান বিষয়ে কতখানি তৎপর।

এখনকার বাংলা গান মানে কোনো শেষ নির্মিতি নয়, একটা আরোজন। একজন লিখবেন, একজন স্বর করবেন ও একজন গাইবেন। তার ওপর আরেকজন থাকবেন আরোজন্য। এই চারজনের সম্পর্ক এক সমতলের ও সমমানের নয়। গীতকার যদি অবিখ্যাত হন তবে তাঁর ভরসা বিখ্যাত স্বরকারের ওপর। গীতকার প্রসিদ্ধ হলে স্বরকারকে চলতে হবে তাঁর মন জুগিয়ে। আর গায়ক যদি হন অতিবিখ্যাত তবে তৃতীয় শ্রেণীর লিরিকও চলে যাবে, স্বরকারের করা স্বর তিনি একটু-আধটু বদলে নেবেন। এর বাইরে আরোজন্যকে স্বাধীনতা দিলে তিনি প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানা যন্ত্রপাতি বাজিয়ে কান ঝালাপালার অনবচ্ছাব ব্যবস্থা করবেন। চারজনের এই ভয়ানক পাল্লাপালির মধ্যে থেকে একটি আধুনিক বাংলা গানের দুর্লভ জন্ম ঘটে। এই জন্ম এমনই চেষ্টাকৃত ও কৃত্রিম পদ্ধতির যে আজন্ম তার পন্থত ঘোচা মুশকিল। সমকালীন মাতৃশ্রের কণ্ঠে কণ্ঠে নতুন জন্ম নেবার ভাগ্য এ-সব গানের রূপালে প্রায়ই থাকে না। নামের জারের বা বিজ্ঞাপনের চাকবাঞ্চে কিছুদিন এরা আসার জমিয়ে নীরবে নিক্ষেপ হয়।

তাই প্রশ্ন উঠেছে কে গান লিখবেন আধুনিক কালের? তিনি আধুনিক কালের মানুষ হলেও আধুনিক মনের তো? চাঁদ, ফুল, পাখিয়া, বনদেবী, পাখি, সমাদি আর বার্ষিকপ্রেমের স্মৃতির বাইরেও তো একটা স্পন্দনময় রোমাঞ্চকর জগৎ আছে। আছে আমাদের এক সমৃদ্ধ গান রচনার ইতিহাস। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গীতকার তো বাংলারই। তাঁর হাজারের বেশি গান এখনো চলিত। এ ছাড়া বাংলার স্নানমথ্যাত সব গীতকারের গানের সংকলন

পাওয়া যায় মুদ্রিত আকারে। তার থেকে উদীপ্ত হওয়া যায় না? অহসরণ আর অহকরণ তো এক নয়। কেন আমাদের এখনকার গীতকাররা বিষয়-নির্বাচনে এত প্রাচীন? তাই আমাদের আধুনিক গান সবচেয়ে প্রাচীন চিন্তাধারার ফসল হয়েই রইল। সে গান কেমন করে আধুনিকদের উৎসাহিত করবে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে অহস্তিকর জিজ্ঞাসা জাগে, আমাদের ভালো ভালো কবিরা কেন গান লেখেন না। তাঁদের সংগীতজ্ঞান খুব নির্বোধ বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। প্রতিষ্ঠিত স্বরকাররা অভিযোগ করেন কবিদের লেখা গান বড়োই জোলো ধরনের। এর একটা মন্ত কারণ হয়তো আধুনিক কবিতার শব্দচেতনার অতিমনস্কতা। এর উল্টো ফল এই হচ্ছে যে, স্বরকাররা কবিদের এমন সব কবিতায় স্থর দিয়ে রেকর্ড পর্যন্ত বানিয়ে ফেলবেন যে-কবিতায় স্থর দেওয়া গীতভারতীরও স্বপ্নাতীত। কারণ তাঁর শিল্পবোধ আছে এবং শিল্পের মূল কথা সংগতি।

এই সংগতির প্রশ্ন সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে আজকের গানে। আমাদের গান আজ আমাদের কাছে অসংগত ঠেকছে। তার বাণী যুগের সঙ্গে সংগতি-পূর্ণ নয়। সেই বাণী রচনার কোনো উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত উন্নতি বা বিবর্তন ঘটে নি। ফলে গত এক দশক বাংলা গান একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সিনেমাও গানের ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু, গৌতমরা এগিয়ে আসছে না। অর্থাৎ নির্মাতা নেই। গৌরীপ্রসন্ন, পুলক, শ্রামল, মুকুল দত্তদের তো অনেক বয়স হলো। তাঁদের ক্লাস্তি আর অনভিনব বাগ্‌ভণি কেমন করে বাংলা গানকে অনগ্রসর স্থরে রাখছে তার সর্বাধুনিক নমুনা:

১. জল পড়ে পাতা নড়ে
তার কথা মনে পড়ে
কেন রাতে ঘুম চোখে এলো না
কি করি মন নিয়ে কেউ তো বলে না। (মুকুল দত্ত ১৩৮৮)
২. কি বলেছি কবে—
বদি তাতে আঘাত পেয়ে থাক
ক্ষমা কর।
ভুল হবে—
যদি সেই ভুলটাকে

অপরোধ বলে তুমি ধর
ক্ষমা কর॥ (গৌরীপ্রসন্ন ১৩৮৬)

৩. কত দেবী ও মাধবী রাত হতে ভোর
আধারে রয়েছে ছাওয়া আঁধি ছটি মোর।
ক্লাস্ত বিরহ ভার
পারি না বহিতে আর
ফুলের শিকল হল মিলনের ভোর। (শ্রামল গুপ্ত ১৩৮৭)
৪. ভালবাসার পানিশালাতে, পিরাই নেশা প্রেম সরাস
চুর হয়ে তাই বলছি তোমার, দাখী গো তোমার
নেই জবাব।
নিশুকে যা বলছে বলুক, তাতে তোমার কী
আর আমার কী?
তাতে তোমার কী আমার কী।

(পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৮৮)

সত্যিই এ-সব গান পড়লে বোঝা যায় গীতকাররা আমাদের রসবোধ বা কাব্যবোধকে মোটেই তোয়াস্কা করেন না। 'তাতে তোমার কী আমার কী' একদিক থেকে ভাবলে এ হলো আধুনিক জীবনধারণেরই প্রবণত। কিংবা দাখী লাহিড়ীর মতো সোচ্চারে সত্যিই বাংলা গান যেন বলছে: 'সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই' এবং এ গানে যে বলা হয়েছে: 'সে আমার কেউ নয়, তার আমি কেউ নই' এ কথা ভয়ানক সত্য হয়ে উঠেছে গীতকার আর শ্রোতার মধ্যে। কিন্তু কেন এই সম্পর্কের ছাড়াছাড়ি? গীতকার প্রসিদ্ধ হলে আর কেন গ্রাহ করেন না শ্রোতার কাব্যবোধকে, যুগের দাবিকে অথবা আধুনিক প্রকাশভঙ্গিকে? তার সবচেয়ে বড়ো কারণ রজতমুদ্রা। যেমন খুশি গান লিখলেই হবে, বিখ্যাত গায়ক গাইলে যেকোনো গান হিট হবে। এবং সত্যিই মাত্রা দের মতো বলা যায়: 'এ খেলা চলছে নিরন্তর'। এ গানে প্রায় আয়রনির মতো আধুনিক বাংলা গানের এ লিপি ধ্বনিত হয় যখন গীতকার লেখেন:

হেথা ভাগ্য নিজেই

টাকার মালায় হয় যে স্বয়ংসর

এ খেলা চলছে নিরন্তর॥

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাস্তা একেবারেই স্থাপু গীতকারদের সারিয়ে তার জায়গায় নতুন গীতকারদের স্থান করে নেবার ভবিষ্যৎ আজ কতখানি উন্মুক্ত? সম্ভবত খুবই কম সে সম্ভাবনা। কারণ পূর্বোক্তরা জাঁকিয়ে বসেছেন এবং প্রসিদ্ধ শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা অনেকদিনের। মাদ্রা দে বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী যদি নতুন গীতকারদের গান রেকর্ডে পাইতেন তবে একটা সম্ভাবনা ও উদ্দীপনার স্ফূর্তি হত নিশ্চিত। নতুন গীতকারদের প্রত্যাশা বিখ্যাত শিল্পীদের স্পর্শ করছে না বলে তাঁরা ধরছেন অল্প শিল্পীদের। ফলে বেশ অনেক ভালো লিরিক বিখ্যাত হচ্ছে না। এমন কয়েকটি ভালো গানের সর্বাধুনিক নমুনা দেখা যাক :

১. চোখ তুলে চাইলেই
কি জানি কি হয়
সিঁড়ি দিয়ে নামলেই
একরাশ ভয়
হাওয়ার মতো সে যে তাড়িয়ে বেড়ায়
তাই তো ছায়া হয়ে আধার জড়ায়। (বরুণ বিশ্বাস)
২. সেই মিষ্টি ধান হুটির আয় বৃষ্টি আয় রে,
কালো মেঘের সই
কেত শুকনো গা রূপণ ভর পূর্ণতায় রে
দিগন্ত থৈ থৈ। (প্রবীর মজুমদার)
৩. তুমি আমাকে আর আমি থাকতে দিলে না
সেই অহংকার এই মনে আর
সাজিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে দিলে না।
কান্ড হাওয়ার বেশে—
কড়ের বেগে এসে
যে ঘর আমার একা থাকার
ভেঙেই দিলে যে হেসে। (জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়)

এ-সব গানের উদ্ভূত থেকে এখন কথা বলতে চাই না যে, লিরিক হিসাবে এগুলি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের তবে সম্ভাবনা ও কবিত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই। ভালো শিল্পীর কল্পাব্যব ও জনপ্রিয়তার সহযোগ পেলে এই-সব ভরণ ও তরুণতর গীতকার অনেক ভালো গান লিখতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু লেখাও কে? গত পাঁচবছর

ধরে মাদ্রা দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন হাজারিকা যতগুলি গান রেকর্ডে গেয়েছেন তার গীতকার পৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, মুকুল দত্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ এঁরা কোনো নুঁকি নেবেন না। নিজেদের জনপ্রিয়তা ও কর্তৃত্ব স্বজায় রাখতে গিয়ে এই-সব অতিবিখ্যাত শিল্পী কত যে বাজে লিরিক 'গান' বলে চালিয়ে বাচা দিয়েছিলেন তার পরিমাপ করা কঠিন। ষারানিজেরা গানের কথা ও সুর করেন তাঁদের মধ্যে সলিল চৌধুরীর রচনায়ও আজ একেবারেই স্থল্পতি। স্বধীন দাশগুপ্ত সম্ভবত। এর বাইরে সম্ভাবনাপূর্ণ গীত-সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার ও জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় অনেক নতুন নতুন কাজ করছেন বাকরতে সমর্থ, তাঁদের ঘিরে আমাদের নতুন গান জাগতে পারে।

২

বাংলা নতুন গান আবার জাগতে পারে কিন্তু জাগবে কে? নতুন গীতকার, সুরকার ও শিল্পী কোথা থেকে উঠে আসবেন?

অবাধিলাকি হুজ বলতে সংগঠনগুলোর কথা প্রথমে আসে। আমাদের ভালো গানের সংগঠন কই? রাজনৈতিক কোনো কোনো দল সভা-জমায়েতের আগে গণসংগীত করেন, তা সাধারণত সাময়িক প্রদর্শন বা গণজাগৃতির প্রচারমূলক। তাতে স্বয়ংসম্পন্ন একটা স্বরসম্মার কাঠামো পাওয়া শক্ত। অনেকটাই চাঁৎকার এবং কিছুটা বক্তব্যধর্মী। এটা তো সত্যি যে, দেশে প্রগতিশীল আবহাওয়া আছে কিন্তু নতুন গীতকার নেই। এখনো সভা-সমিতিতে পারেশ ধরের সুরে স্বকান্তর 'বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি' জ্যোতিব্রজ মৈত্রের 'এসো মুক্ত করো', শ্যামল গুহের 'রক্তা বড় মৃত্যু অর্ধপাক' কিংবা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গাওয়া বিখ্যাত 'মন্দির মন্দির সোপানতলে' সবচেয়ে জনপ্রিয় ও লক্ষ্যভেদী। এ-সব গান চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের সৃষ্টি। এ গানের পুনরাবৃত্তিতে তাই আমাদের গোরব কোথায়? সভাসমিতির বাইরে ভালো কিছু গান গ্রুপ থিয়েটারে হয়েছে গত এক দশকে। কিন্তু সে গানগুলি নাটকের দলেই আবদ্ধ রয়ে গেছে। গত এক দশকের গ্রুপ নাটকের গান গ্রামোফোন ডিসকে ধরে রাখলে নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হত এবং বাংলা নতুন গানের একটা স্পষ্ট চেহারা পাওয়া যেত। এখন বিচ্ছিন্নভাবে ইয়ত ক্যার

ও অজিত পাও যে প্রয়াস চালাচ্ছেন তা সাধুবাদযোগ্য তবে অতৃপ্তি থেকে যায়।

গান তৈরির বাণিজ্যিক স্বত্র তিনটি: রেডিও, রেকর্ড ও চলচ্চিত্র। এর মধ্যে চলচ্চিত্রের জন্য তৈরি বাংলা গান আমাদের আলোচনার বহির্ভূত রাখা উচিত। কারণ তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক এবং ছবির সিকোয়েন্সের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার নিমিত্ত। অর্ধাৎ গান রচনায় চটকদার স্বর সবচেয়ে নামী শিল্পীর কণ্ঠে এখানে বাণীবদ্ধ হয়। সাধারণত চলচ্চিত্র পর্দায় দেখানোর অনেক আগে তার রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায়। দুয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে বাংলা চলচ্চিত্রের গান প্রধানত বোম্বাই শিল্পীদের উপর নির্ভরশীল। কিশোরকুমার, মামা দে, হেমন্ত, লতা, আশা। এঁরাই গত তিন দশকে বাংলা চলচ্চিত্রের সফলতম গায়ক-গায়িকা। সঙ্গে মানবেন্দ্র, আমল মিত্র ও সন্ধ্যা ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো যে, গত তিন দশকে বাংলা আধুনিক গানে যারা প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন সেই হেমন্ত-মামা-কিশোর-আমল এই চারজনই নেপথ্যকণ্ঠ দিয়েছিলেন উত্তমকুমার নামক জনপ্রিয়তম বিগ্রহে। উত্তমকুমারের অসাধারণ জনপ্রিয়তার সহায়তা না পেলে তাঁদের এতটা রবরবা হত কিনা সন্দেহ। মানবেন্দ্র ও অরুণ ঘোষাল যে আধুনিক গানের চেয়ে নজরুলের গানেই অধিকতর আগ্রহী হলেন তার প্রধান কারণ উত্তমকুমারের নেপথ্যকণ্ঠের উপযোগী বলে সংগীত-পরিচালকরা তাঁদের নির্বাচন করেন নি। অথচ আলাদাভাবে এঁরা খুব বড়ো শিল্পী। 'লালুধূলু' ও 'মায়ামুগ'-র মানবেন্দ্র এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ও 'হীরক রাজার দেশে'-র অরুণ ঘোষালের অসামান্য সাক্ষ্য আমাদের মনে আছে। সন্ধ্যা ও আরতির জনপ্রিয়তা ও সাক্ষ্যের গোপন চাবিকাঠি আসলে সৃজিতা সেন বা অল্প জনপ্রিয় নায়িকার রজতপট প্রদর্শনে। আর এই আশীর্বাদে বসিত থেকে গেলেন চিরকালের মতো প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, মাদুরী চট্টোপাধ্যায় ও নির্মালা মিশ্রের মতো জাতশিল্পী। সন্ধ্যা-আরতির জনপ্রিয়তা তাঁদের কাছে অপ্রাপনীয় থেকে গেল।

এখন বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সবচেয়ে নিপুণ ও সৃষ্টিশীল প্রতিভা নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়। কথা স্বর ও কম্পোজিশন তিন দিক থেকেই তাঁর সংগীত রচনা বাংলা গানে খুব উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। গ্রামোফোন কোম্পানি

এবং কোনো প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা যে সত্যজিৎকে দিয়ে এখানে কোনো গান রচনা করতে পারেন নি (নাকি চান নি?) এ এক পরিতাপজনক সত্য।

আধুনিক বাংলা গানের সংগঠন ও পুনরুজ্জীবনে খুব বড়ো ভূমিকা থাকতে পারত আকাশবাণী। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সারাদিনের অহুষ্ঠানস্থচী সমীক্ষা করলে দেখা যাবে তাঁদের প্রধান বৌদ্ধিক রেকর্ড বাজানোর দিকে। রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুলের গানের রেকর্ড, লোকগীতের রেকর্ড এঁদের প্রধান ভরসা। এ ছাড়া নামান্তরে আছে রবীন্দ্র-সংগীত ও নজরুলসংগীতের অহরোধের আসর। এর বাইরে আছে আধুনিক গানের অহরোধের আসর ও হারানো দিনের গান। তা হলে মৌলিক সৃষ্টির অবসর কোথায়? রমাগীতি ও এ মাদের গান এঁদের মৌলিক সৃজন বলে দাবি করা হয়। রমাগীতিতে বেশির ভাগ পুরানো গানই বাজে অর্থহীন ও পর্যায়ে মাসে মাসে নতুন গান তৈরি হয় না। 'এ মাদের গান' নির্মিতির দিক থেকে খুব কি সম্ভাবনাপূর্ণ হয়েছে এ পর্যন্ত? নতুন ধরনের বাণী ও স্বর নিয়ে পরীক্ষা করবার অবকাশ এ বিভাগে প্রচুর। শোনা যায়, 'এ মাদের গান' তৈরি করতে অনেক খরচ হয়। রিহার্সাল বাবদ প্রচুর ব্যয় এবং গীতকার স্বরকার শিল্পী আলাদাভাবে সামান্যিক পান। এর বাইরে 'দেশ বন্দনার গান' ও 'ব্লুগান' আমাদের প্রেরণা জাগায় না। তার স্বর ও বাণী খুব কষ্টকল্পিত। আকাশবাণীর আধুনিক গান সম্প্রচারে আরেক বিভাগ হল শিল্পীদের সরাসরি অধিবেশন। এ-সব গানে সৃষ্টি নতুন গলা ও গানের স্বর চমকে দেয়। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা মাঝে মাঝে অহুষ্ঠান করেন এবং তাতে প্রধানত তাঁদের হিট গান করেন। সংগীত শিক্ষার আসরে পঙ্কজ মল্লিকের আমলে তবু মাঝে মাঝে আধুনিক গান শেখানো হত। এখন সেখানে শুধু রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলসংগীতি। মাঝে মাঝে বসন্ত, শরৎ ইত্যাদি উপলক্ষ করে আকাশবাণী 'গীতি আলোচনা' প্রচার করেন। তার মান ও আদর্শ সম্পর্কে নীরব থাকাই শোভন। আকাশবাণীর নবসৃষ্টির প্রেরণা ও সামর্থ্য বিষয়ে সবচেয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত মহালয়া উপলক্ষে বহুজনপ্রিয় 'মহিষাসুরমর্দিনী'। ভালো হলেও একই বাণীকুমার - পঙ্কজ মল্লিক - বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সমন্বিত এই সম্প্রচার প্রতি বছর বাজানো হয়। অহুষ্ঠানের বছরে তার ব্যতিক্রমী এক অহুষ্ঠান ধ্যানেশনারায়ণের রচনায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বরে ও উত্তমকুমারের কণ্ঠে মহতী বিনীতিতে পরিণত হয়। জনগণ প্রতিবাদ করেন।

অমনি আকাশবাণী নিশ্চিত আলোকে আবার পুরানো অছাঠান চালু করে দিয়েছেন। যেন জনগণের প্রতিবাদ বা সংগীতপ্রেমীদের বেদনা তাঁরা অন্ধ ক্ষেত্রে খুব সমীহ করে চলেন। যাই হোক, এইভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা আকাশবাণী কলকাতাকে গ্রাস করছে। বিশেষ একদল গীতকার ও স্বরকার এখানে প্রশ্রয় ও আশ্রয় পান। নিয়ম-কাহনের নানা অচলায়তনিক কাঠামো এ প্রতিষ্ঠানে সচলতা আনতে পারে না। অধাবসায়ী ও উৎসাহী কর্মকর্তা খুব বেশি তৎপরতা দেখালে দ্রুত বদলি হয়ে যান পূর্বভারতের প্রত্যন্তে।

অথচ আধুনিক বাংলা গানকে সঠিক পথে চালিত করা আকাশবাণীর খুব জরুরি কাজ। কিন্তু কে করবে? সত্যিকারের গুণী প্রযোজক কি এখানে আসবেন বা এলেও সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন? জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতো বড়ো কলাবৎ আকাশবাণীকে খুব বেশি নাড়া দিতে পারেন নি। এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা কেন্দ্রীয় সরকারের এক নিশ্চিত চাকরিত। নব স্বজনের বন্ধুর পথ এঁদের জ্ঞান নয়। তাই বাংলা গান নিয়ে সেমিনার, প্রতিযোগিতা, সমীক্ষা এঁদের পক্ষে অসম্ভব। সাতাদিনব্যাপী উত্তোগহীন আয়োজনে অনিশেষ রেকর্ডবাদের এমন নির্বোধ কৃতি আঁদের পক্ষে ভরসার ও সাহসার নয়। রাজ্যের দিকে দিকে ছড়ানো অপগতি গুণী ও কলাবিদকে অহুস্ধান ও শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করা তাঁদের প্রধান কাজ। সত্যিকারের বড়ো গীতকার স্বরকার ও শিল্পী এখান থেকে অবাণিজ্যিক পবিত্র বাতাবরণে রচনা ও আত্মপ্রকাশ করবেন এমনটাই কাম্য। কিন্তু ঘটনাচক্রে আকাশবাণী কলকাতা এখন কৃষিজীবী পল্লীবাসীদের বিনোদন, নাট্যমোদীদের শ্রবণস্বর্গ ও অপরিণত শ্রোতাদের দেশীয় বিবিধ-ভারতীতে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা গানের সবচেয়ে জলুসভরা আয়োজন গ্রামোফোন কোম্পানিগুলির, তার কারণ এখানেই তাঁদের বাণিজ্যালক্ষ্যী। যদিও প্রধানত হিন্দি সিনেমায় গানের রেকর্ড বিক্রয় এঁদের প্রধান কৃত্য তবু প্রতি বছর নানা ধরনের বাংলা গান এঁরা বাজারে ছাড়েন ও তার ফলাফল লক্ষ্য করেন। যে কোশলে ও করমূল্যে তাঁদের সাফল্য আসে তার 'রিপ্টি পারফরমানন্স' ব্যাপারে তাঁরা উদযোগী হন। জনৈক ধ্রুপদ চক্রবর্তী হঠাৎ একটি রেকর্ডে ('বড়োলোকের বিট লো লথা লথা চুল') অকৃত্রিম গান গেয়ে সবাইকে সচকিত করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড কোম্পানি তাঁর প্রতিভাকে নিউজাতে থাকে এবং পরপর তিনি গান করে যান রূচিবিরহিত বাণীতে :

১. রসিক লাগর আমার দেখো ডাগর হয়েচে
লাগর আমার দেখে
আড়ে আড়ে চোখ ঠাঁড়াইছে।
২. আমি তখন পুতুরঘাটে কাটছিলম শাড়ি
বুড়ো ইশারাতে আমার ডেকে লড়ালছিল দাড়ি
আবার কোঁকলা দাঁতে হেসে বলে বস আমার পাশেতে।
৩. আমার কাঁচা পিরিত পাড়ার লুকে
পাকতে দিলে না।

আমরা সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলব, এ-সব গান কেন এবং কাদের জন্ত? কী এদের উদ্দেশ্য? ছদ্ম লোকগীতের বকলমে এই রুচিবিকৃতির অবাধ প্রচার কাদের স্বার্থে? একই প্রশ্ন রুনা লায়লা ও শ্রাবস্তী মজুমদারের প্রসঙ্গে। কেন এঁদের জনপ্রিয়তার স্বভাবে অন্তায়ভাবে কর্ণধর বিষয়ের গান গাওয়ানো হচ্ছে? এঁদের গানের নমুনা :

১. তোমার ঐ মুরগীপোমা ভালোবাসায়
ভুলব নাকো আর
ঝটপট ঝটপট ঝটপট করে
মরব কত আর।
প্রাণটা করে কঁাকর কৌ
তাকে আর কত বোঝাব?
২. দোহাই হেতো না গো তোমরা
বুড়া আমার মারিছে
ঠাং আমার ভাড়িছে
সেই ভাঙা ঠাঙে আবার মলম লাগাইছে।
৩. বন্ধ তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম
দেখা পাইলাম না
গাং পার হইতে ছয় আনা
ফিরা আইতে ছয় আনা
আইতে যাইতে বারো আনা
উত্তল হইল না।

এ-সব গানকে লোকসংগীত বলতে হবে আমাদের, রেকর্ড কোম্পানির দাবি?

অনেক ক্ষেত্রে গীতকারের জায়গায় লেখা থাকে 'প্রচলিত'। এই কথাটি খুবই প্রত্যাহারক। প্রচলিত বলতে কোথায় প্রচলিত? কেব? সবচেয়ে আশ্চর্য ও লজ্জাকর যে, কখনো কখনো বিশিষ্ট শিল্পী জনপ্রিয়তার লোভে বিকৃতকৃতি ও পরাঙ্মুখতার দাসত্ব করেন। ক্রমা লায়লার 'সাধের লাউ বানাইল' (কথা : প্রচলিত) হঠাৎ খুব জনপ্রিয় হয়েছিল রেকর্ডে; সঙ্গে সঙ্গে নির্মলেন্দু চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট গায়ক নিজে লিখলেন ও গাইলেন :

সাধের লাউ রে কহু

তোর ভিতর কী আছে এত মধু।

লাউ না পাইয়া বৈষ্ণবী যে করে দাপাদাপি

বৈষ্ণব গোস্বামী কইরা। প্রসাদ খায় না

বৈষ্ণবীরে রাখি ॥

এ গানের মানে কি? উদ্বেগ বা কী? গানের বাণী ও লিখনরীতি এমন অদ্ভুত কেন?

এই উদাহরণ থেকে আমি বলতে চাই, কত স্বকৌশলে গ্রামোফোনের চাকতি আমাদের মধ্যে সোচ্চারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে স্বপ্নের বীজ। এর পাশে তারা যতই শুদ্ধ ও সং সংগীত প্রচারের আদর্শ দেখান তবু তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে।

আক্ষেপ আরো এইজন্য যে, প্রকৃতই গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে আমরা স্বর্গী। বহু বিখ্যাত গান (কৃষ্ণচন্দ্র দে, উমা বসু, দিলীপ রায়, ভীষ্মদেব ইত্যাদি) তো তারাই লং প্লেয়িং রেকর্ডে আমাদের উপহার দিয়েছেন। ১৯৬১ সাল থেকে তারা নিরলসভাবে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করছেন। নজরুলগীতির পুনরুত্থানে তাঁদের দান অসামান্য। বাংলা কবিতার আরুণ্ডি সম্প্রচার, প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের অ্যালবাম আমাদের সংরক্ষণ ও স্ফায়ার বস্তু। শতাব্দীর বর্মণ, বেগম আখতার ও পঞ্চজ মল্লিকের গানের সংকলন খুবই মনোহরী। উপাসনার গান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পদাবলী কীর্তন, রজনীকান্তের গান, প্যারাললের শ্রামা সংগীত, সলিল চৌধুরীর গণসংগীত আমাদের আদরের সামগ্রী। অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান প্রচারে তাঁদের সচেতন শ্রদ্ধা লক্ষণীয়। হিমাংশু দত্ত স্বরসাগরের গান তারা অবিস্মরণীয় করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁদের কাজ ও গবেষণা নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধত আবেগে দ্বিগুণী হবে।

কিন্তু কোনো কোনো রেকর্ড কোম্পানি স্পষ্টত বাংলা গানের প্রগতি ও নতুন শিল্পীর সম্ভাবনাকে ব্যাহত করছেন। মহম্মদ রফিক দিয়ে নজরুলগীতি ও কিশোরকুমারকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের লং প্লেইং (যদিও সত্যজিৎ রায়ের বইতে কিশোর রবীন্দ্রসংগীত ভালোই গেয়েছিলেন) বার করা নিত্যসংবাদসংবৃদ্ধির প্রকাশ। অথচ তাঁরাই হয়তো পূর্ববী দত্ত-র অসাধারণ নজরুলগীতির রেকর্ড একনাগাড়ে সম্মানে বার করছেন অথবা দেবজিত বিশ্বাসের সমুদয় গানের লং প্লেইং যা যে-কোনো জাতির সংরক্ষণযোগ্য। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্বরেলা গলায় ঈর্ষাঘীর প্রাচীন বাংলা গান তো এঁদেরই পরিবেশন। তা হলে কেন এই উদ্বেগপূর্ণ বাণিজ্য?

ছোটোখাটো রেকর্ড কোম্পানির সমস্তা অর্থ নৈতিকভাবে টঁকে থাকার। তাই উঠতি শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়ে এসব কোম্পানিতে গান রেকর্ড করেন। যদি কোনোক্রমে গানটা লেগে যায় তবে বড়ো কোম্পানিতে প্রবেশাধিকার ঘটবে। এ ক্ষেত্রে বড়ো কোনো হস্তির অঙ্গীকার বা নতুন কোনো নিরীক্ষার স্বযোগ নেই। গীতকার বা স্বরকাররাও দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর। তবু এসব অনতিখ্যাত কোম্পানির ডিস্কে অনেক সময় প্রতিশ্রুতি বেজে ওঠে। সংবর্ধনাহীন মরুপথে সে-সব প্রতিভা হয়তো হারিয়েও যায়। বিশেষ করে শারদীয়া পূজার অবকাশে এইসব গানের জোয়ার আসে। প্রতি বছর জোয়ার সরে গেলে কিছু কিছু গান থেকে যায়।

৩

আধুনিক বাংলা গানের উত্তরণে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল সচেতন গায়ক-গায়িকার, অথচ তাঁরাই সবচেয়ে আগে হলেন অবক্ষয়ের ও মন্দকৃতির শিকার। কেন এমন হল তা সঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে হলে বাংলা গানের পুরানো কথা কিছু আলোচনা করতে হবে। এ কথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপযোগী ধর্মনিরপেক্ষ গান লেখেন। প্রণয় ও ভক্তিসমুজ্জল গানের পাশে তাঁর প্রকৃতি, স্বপ্ন ও আত্মস্থানিক গানগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে এবং এ গান আজও আমাদের অপরিহার্য। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ গান গিয়েছিলেন এবং তাঁদের কৃতিত্ব বৈরাগ্য, দৈহিক ও সম্ভাব্যপ্রবণ গান রচনায়। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশোর্ধ বয়সেই দ্বিজেন্দ্রলালের

অকালবিয়োগ ঘটে কিন্তু তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রপ্রভাব সবচেয়ে কম। শ্বিল্প-শ্রীতি পৌরুষ ও উদাত্ততায় সবচেয়ে মর্মস্পর্শী। স্বরের নানারকম মিশ্রণ ও ভাববিস্তারের নানা পরীক্ষা তাঁর গানকে সমৃদ্ধ করেছে।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনসম্বন্ধে কবিতা ও গানে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। ফলে ত্রিশ দশকে তাঁর সর্বাভিলাষী বিগ্রহ বিরাট মূর্তি ধরে বাংলার কবিতা ও গানকে একেবারে গ্রাস করে। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও প্রকাশভঙ্গির হতাশনে আত্মদানের উৎসাহ তখন বেশির ভাগ শিল্পীর অস্থিট ছিল। তাঁরা রবীন্দ্র-অনুরণনের নিশ্চিত অথচ অসম্ভব পথে আত্ম-বিলয় করে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ত্রিশের দশকে একদল শিক্ষিত কবি সচেতনভাবে রবীন্দ্রশ্রীতির বিরুদ্ধতা এমন-কি বৈপর্য্যিত্যের ব্রত মেনে। নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য এই-সব বিরোধী পক্ষের প্রথম সারিতে ছিলেন। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-বিরোধিতার কথা ভাবাই হয় নি এবং প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসংগীত বহুদূর সংস্কৃতিকে ভবিষ্যতে কত বড়ো মূর্তিতে উদ্ভাসিত করতে পারে তার ধারণাও সেকালে ছিল অসম্ভব। ফলত ত্রিশ-চল্লিশ দশকে আধুনিক বাংলা গান যখন নতুনভাবে রূপ নিতে চলল তখন তাতে রবীন্দ্র-অধীকৃতির বদলে রবীন্দ্র-অধীকার ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অজয় ভট্টাচার্য, স্ববোধ পুরকায়স্থ, মোহিনী চৌধুরী, হীমেন বসু, প্রণব রায় প্রভৃতি নবীন গীতকার রবীন্দ্রলাবণ্যে ভরে নেন তাঁদের বাণী পরম আনন্দে। রোম্যান্টিক বিদুরতা ও উদাসী স্বপ্নাচ্ছন্নতা এ-সব গানের সামান্যলক্ষণ। ভাষার শুচিতা, অব্যবহৃত উপমা, স্নানির কাংকার এঁদের গানকে স্মন্দর করেছে কিন্তু রবীন্দ্রোত্তীর্ণ করে নি। ব্যতিক্রম ছিলেন নজরুল ও দিলীপকুমার রায়। কিন্তু নজরুল ছিলেন স্বর রচনায় অধিকতর মনোযোগী, বাণীবিশ্বাসে অযত্নশীল। আর দিলীপকুমার ছিলেন উচ্ছ্বাসী গীতকার। ভাবের বজ্র ও ভাষার অতিরিক্ত তাঁর গানে সংহতি দেয় নি। স্বরের অতিরিক্ত হৃদ্যতা ও গায়কের কাক্ষুকৃতি তাঁর গানকে যেমন বিশিষ্ট করেছে তেমনই করে তুলেছে সর্ব-সাধারণের পক্ষে সমান দূরত্বের বিষয়।

এইভাবে যখন পঞ্চাশের দশক এল তখন বাংলা গানে শূন্যতা অবশ্রান্তাবী হয়ে ওঠে। নজরুল তখন বোধশূন্য, দিলীপকুমার ও ভীষ্মদেব আশ্রমবাসী সাধক। এদিকে অজয় ভট্টাচার্যদের যুগ শেষ। শট্টানদেব বর্ণগ বোধস্বাই-প্রবাসী। অথচ চলচ্চিত্র ও আধুনিক রেকর্ডের চাহিদা পূরণের আশু প্রয়োজন।

এই স্বযোগে গৌরীপ্রসন্ন শ্রামল গুপ্ত পুলক বন্দোপাধ্যায়রা গানের বাণী রচনায় এগিয়ে যান ও একচ্ছত্র আসন পেয়ে যান। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সলিল চৌধুরী। ষাঁর সমকালীন সমাজচেতনা, স্বরের পরীক্ষা ও নতুন শ্রীতির গানের ভাষা সবাইকে সচকিত করে। তাঁর গানের নানা নিরীক্ষা কঠোর রূপায়িত করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জনপ্রিয় হন। কিন্তু অচিরে অর্থকৌলীন্য এবং সম্ভবত বড়ো পটভূমিকায় কাজ করার আকর্ষণে সলিল ও হেমন্ত বোধস্বাই-প্রবাসী হয়ে যান। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানে একটা সৃষ্টির জোয়ার ইতি-মধ্যে এসে গিয়েছিল। স্বধীরলাল-জগন্নাথ-হেমন্ত-তালতা মায়ুদ-ধনঞ্জয়-মানবেন্দ্র-শ্রামল-তরুণ-মৃণাল চক্রবর্তী-বিজেন-পারলাল-সত্যীনাথ-অশ্বিনবন্ধু-সুপ্রভা-সন্ধ্যা-প্রতিমা-উৎপলা ইত্যাদিরা সম্মিলিতভাবে বাংলা গানকে জনপ্রিয়তম করে তোলেন। অবশ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে রবীন্দ্রসংগীত পর্যন্ত অগৃহীত থাকে। অথচ যেমন হঠাৎ আধুনিক গানের জোয়ার আসে আবার এক দশকেই তাতে ভাটার টান ধরে। এর প্রধান কারণ গীতকারদের অসাক্ষাৎ, চাঁদ-ফুল-প্রিয়া-ভোলাবাসা-স্মরণ-সমাধির পৌনঃপুনিক প্রসঙ্গ এবং সেইসঙ্গে স্বধীরলালের প্রয়াণ, হেমন্ত-র পরবাস। এমন সময় এল রবীন্দ্রশতবর্ষ এবং রেকর্ড ও অহুতানে প্রবলভাবে এগিয়ে এলেন দেবব্রত-শান্তিদেব-সুবিনয়-সুচিত্রা-কণিকার দল। রবীন্দ্রসংগীতের অশ্রুতপূর্ব সাম্রাজ্য সকলের জন্ম অব্যাহিত হল। সত্যিকারের গানের বাণী ও স্বর গীতরসিক বাঙালির পিপাসিত চিত্ত নতুন করে ভরিয়ে দিল। ইতিমধ্যে মামা দে ও আরতি মুখোপাধ্যায় তাঁদের প্রবল কঠলাবণ্য নিয়ে আধুনিক সংগীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠানভূমির পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসংগীত বিজেত্রগীতি অতুলপ্রসাদের গান সম্পর্কে সংগীতরসিক বাঙালির আগ্রহ বাড়ছিল। আরেক দিকে নির্মলেন্দু চৌধুরী ও পূর্ণ দাস দুটি ফেরালেন বাংলার লোকসংগীতের ঐশ্বর্যের দিকে। ১৯৬৭ সাল থেকে নজরুল গীতির আবিষ্কার ও সম্প্রচার শুরু হয়ে গেল। এই সব-কিছুর সামগ্রিক প্রভাবে আধুনিক গানের ভাব ও বাণীর দৌর্বল্য এবং স্বরের কৃত্রিমতা খুব প্রকটভাবে চোখে পড়তে লাগল। অবস্থা বুঝে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন আধুনিক সংগীতশিল্পী গানের পথ পালটালেন এই সময়। ধনঞ্জয় গেলেন শ্রামসংগীতে, মানবেন্দ্র পাকাপাকিভাবে নজরুল গীতিতে। শ্রামল মিজ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বোধস্বাই চলচ্চিত্রে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কঠ বোধস্বাই ক্রান্ত হয়ে এল। মামা দে সন্ধ্যা ও আরতি

আধুনিক গানের একমাত্র ভরসা স্থল হয়ে উঠলেন। তাঁদের পাশে তরুণ-সতীনাথ-বিজেন-নির্মলা-বনশ্রী-পিটু-হৈমন্তীরা সবল রাখতে সচেষ্ট রইলেন বাংলা গানের রথ। গত পাঁচ বছরে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পী বলতে অকঙ্কতী হোমচৌধুরীর নাম একমাত্র উল্লেখযোগ্য। শক্তি ঠাকুর, স্বধীন সরকার, কলাশ মুখোপাধ্যায় তেমন সামর্থ্যের পরিচয় রাখলেন কই? অবিলম্বে ও জটিলের যত্থানি ওগী শিল্পী সম্ভবত তত বড়ো পারফরমার নন। স্বকুমার মিত্র আধুনিক গানে সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ গায়ক ছিলেন। তিনি পঞ্চ পালটে আজ নজরুল গীতির আপাত নিশ্চিত রাজ্যে বড়ো ভরসা এবং অল্প ধোঁষাল এর মধ্যে আরেক আশ্চর্য, ষাট বছরের আশেপাশের বয়সের দুই শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আবির্ভাব ও রাজ্যজয় এবং ভূপেন হাজারিকার অসমীয়া গানের বঙ্গীয় অত্বাদে আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন। নির্মলেন্দুর প্রয়াণ, সলিলের প্রত্যাবর্তন, স্বধীন দাশগুপ্তের অকাল বিয়োগ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনবহত অবিরল গান গেয়ে যাওয়ার পটভূমিতে এই মুহূর্তে আধুনিক বাংলা গানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতভাবে দুলছে।

কিন্তু নতুন উষার স্বর্গবার-সম্ভাবনা মনে হয় দূরতর। বিখ্যাত গীতকারদের রচনা ক্লাস্ত ও পুনরুজ্জীবন। নতুন গীতকারদের স্বযোগ সীমিত। এর মধ্যে চলচ্চিত্রের যেমন 'রি-মেক', বাংলা আধুনিক গানে তেমনই চলছে এককালের পুরানো হিট গান আজকের শিল্পী দিয়ে আরেকবার গাওয়ায়। শিল্পী-সহযোগে জেগে ওঠার পক্ষে এই পশ্চাদপসরণের প্রয়াস স্বাভাবিক নয়।

আর, এই মুহূর্তে সবচেয়ে নির্মম সত্য হল: এখনকার কলকাতায় একক সংগীত আসরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠা-আকর্ষণকারী সংগীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষ, স্ববিনয় রায়, সচিত্রা মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, কলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদা দে ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁদের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে ও পঁচাত্তরের মধ্যে। কানা গলির মধ্যে অবরুদ্ধ বাংলা গানকে কে তা হলে মুক্তির নতুন পথে আনবে? কোন্ যৌবন?

স্মৃতি:

শারদ স্বর্গ। হিঙ্গ মাষ্টার ভয়েস কল্যাণ।

১৩৮৮-১৩৮৮

● বঙ্কিম রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস [৩০'০০]
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ [যথেষ্ট]

● মধুসূদন রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে।
[৩২'৫০]

● রমেশ রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সমগ্র উপন্যাস (ছয়টি) এক খণ্ডে
[২৫'০০]

● দীনবন্ধু রচনাবলী

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত। সমগ্র রচনা একখণ্ডে [২৫'০০]

● গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনা পাঁচ খণ্ডে সঙ্কলিত। প্রথম খণ্ডে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অত্র খণ্ডগুলি ডঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক
সম্পাদিত। [প্রতি খণ্ড ২৫'০০]

● তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ।

অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। সমগ্র ছোটগল্প তিন খণ্ডে
সঙ্কলিত [প্রতি খণ্ড ৪০'০০]

● বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার
হাজার পদের সঙ্কলন এক খণ্ডে। [৭৫'০০]

সা হিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

গবেষণা গ্রন্থমালা

প্রাচীন ভারতে নারী : কিতিমোহন সেন	৮'০০
রবীন্দ্রনাথের সত্তা দর্শন : সাহুনা মজুমদার	২৩'০০
স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য : পদ্মপতি শাসমল	৩৪'০০
সাহিত্য প্রকাশিকা : ১-৬	৭১'০০
১ম খণ্ড	৬০'০০
পূঁথি পরিচয় : পঞ্চানন মণ্ডল ১-৩	৪২'০০
৩র্থ খণ্ড	৫০'০০
উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা : যোগীরাজ বসু	৩'০০
Introduction to Parsee Religion Customs and Ceremonies : Madhusudan Mallik	12'00
The Decline of Buddhism : R. C. Mitra	24'00
The Emperor and the Subordinate Rulers : D. C. Sircar	20'00
Visva-Bharati Journal of Research : Vol. v Part i	16'00
Adhunik Odiya Kavyadhara (Nabajagarana-yaga) : N. N. Mishra	42'00
Asvaghosa : B. N. Bhattacharya	60'00
Rasacandrika (2 Vols.) : S. N. Ghosal	42'50
Chaturdandi Prakashika : V. V. Wazalwar	12'00
She-Kia-Fang-Che	
An Important Chinese Account on India : P. C. Bagchi	6'00
Tagore's Educational Philosophy and Experiment : S. C. Sarkar	7'50

বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি
শান্তিনিকেতন

আলোচনা

ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন * সম্পাদক : পৃষ্ঠাশি পট্টনায়ক, অহুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জ্যোয়ারদার। মূল্য : আট টাকা। জাণানাল বুক ট্রাষ্ট।

ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন একশটি ওড়িয়া গল্পের বঙ্গাহুবাদ। এই গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদক লেখক ও লেখার সময় বিষয়ে একটি ক্রম-পর্যায়ক্রম বঙ্গায় রেখেছেন। ওড়িয়া গল্পের পথিকৃত ফকীরমোহন সেনাপতির গল্প দিয়ে সংকলনটির শুরু। ফকীরমোহন ওড়িয়া গল্পসাহিত্যের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃত। এই গ্রন্থটি গল্পের মধ্যে সবক'টি সার্থক এমন বলা না গেলেও গল্পগুলির মূল স্বর উড়িয়ার নিজস্ব জীবন ও গ্রাম্য পরিবেশ, আপাতদৈন্যতার মাঝখানেও সরল স্বামী মাহুষের অদ্ভুত ছবি হৃদয়ের ফুটে উঠেছে। জীবনকে নানা প্রেক্ষিতে দেখে তা থেকে নির্ধাসিটুকু তুলে আনাতেই ওড়িয়া গল্পকারদের বৈশিষ্ট্য। কত সামান্য বিষয় যা আমাদের চোখে পড়ে বা পড়েও না, কিন্তু তারা কত অতিক্রান্ত হওয়ার মতো গল্প হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ এই সংকলনের কিছু কিছু গল্প। অহুবাদে অনেক ওড়িয়া শব্দ সরাসরি এলেও তা পাঠককে তেমন ক্লান্ত করবে না। বরং প্রত্যেকটি গল্পকেই মনন পাঠক গ্রহণ করবে গভীর আগ্রহে। বাংলা গল্পের তুলনায় ওড়িয়া গল্পের পথ চলা যদিও অনেকটাই ধীর লয়ে, তবু তাদের ছোটগল্প অতি দ্রুত একটি পরিণতির দিকে যে এগোচ্ছে সেটা এই সংকলনপাঠে অলক্ষ্য থাকে না।

চতুর্দোলা ● রুশ ছোটগল্প সংকলন, অহুবাদ : গোলোকেন্দ্র ঘোষ

পরিবেশক : শৈব্য পুস্তকালয়। মূল্য : আট টাকা।

ঋণদী গল্পসাহিত্যে যাদের নাম শিরোধার্য এমন চারজন রুশ লেখকের সার্থক শিল্পকর্মের বঙ্গাহুবাদ 'চতুর্দোলা'। 'চতুর্দোলা' অর্থাৎ যার অবলম্বনে দোলা যায়। সত্যিকথা বলতে কি পুশকিন, ডস্টয়ভস্কি, চেকভ ও টলস্টয় প্রত্যেকেই আপন-আপন কৃতিত্বে উজ্জল এবং পাঠক মনকে এখনো দোলাতে পারেন। পৃথিবীর সর্বকালীন সাহিত্যকর্মের নিরিখে তাদের কথা নতুন করে

জানানোর প্রয়োজন নেই। তারা চিরকালই বারবার নতুন করে স্বরণযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকেরই এক-একটি মহৎ গল্প শ্রবণীয় করে তুলতে পেরেছেন অহুবাদক গোলোকেন্দ্র ঘোষ তাঁর অতি প্রাজ্ঞ ভাষায়। অহুবাদ তখনই সার্থক যখন অহুবাদ শুধুমাত্র কোনো ভাষান্তর নয়, অর্থাৎ বিষয়ের আকরিক অহুবাদ না হয়ে তা হয়ে উঠবে অহুবাদকারের কিছুটা নিজস্ব শিল্পকর্ম। চারটি গল্পের অহুবাদে অহুবাদক প্রত্যেকটি গল্পকে প্রায় বাংলা গল্পের গোশাক পরিচয় দেন এবং সে গোশাক বেমানান হয় নি এবটুও। গল্পগুলির নাম ও স্থান বাদ দিলে এগুলিতে মৌলিক গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। অহুবাদকের সার্থকতা এখানেই।

বইটির প্রচ্ছদ সম্পর্কে আমাদের একমাত্র আপত্তি। এমন সিরিয়াস বই-এর এমন হালকা প্রচ্ছদ কেন?

দেবীপ্রসাদ মজুমদার

মুম্বাদী

এক ভয়াবহ খরার ক্ষতবৃক বাঙালীজীবনের প্রধানতম উৎসবটি এবার এসেছে। হু-হুবার বীজধান লাগিয়েও জলের অভাবে এই মরুতমে আর ফসল তেমন হবে না। আগামী মাসগুলোতে ধান চালের অভাব ভয়াবহ হয়ে উঠতে বাধ্য। ফরাঙ্কার বাঁধে আমাদের যে তেমন কোনো স্থিতি হয় নি, তা এখন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেচের যতটুকু জল তাও গরীব চাষীর তেমন কাজে লাগে নি। বাংলার মূল কর্তৃপক্ষ গো আবাদী জমির কতটুকু আর কানালের ধারের জমি। এদেশে বস্তা ও বরা প্রতিবছরের এক স্বাভাবিক ঘটনা। সেকথা স্বরণ রেখেও বলা যায় এবারের প্রাকৃতিক ধামধোলানী যেন চূড়ান্ত চণ্ডাল। স্বতরাং মাহুকের যা কিছু করণীয় তা এখন থেকেই করা উচিত। শরদ অবকাশের খংসামান্ন আনন্দের পরেই এবারের পশ্চিমবাংলার ফসল বার্থতা প্রকট হয়ে উঠবে। অল্প প্রদেশ বস্তার জন্ম কেন্দ্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও বরার জন্ম তারা সব মিলিয়ে কতটুকু সাহায্য দেবেন পশ্চিমবঙ্গকে তা এখনো স্পষ্ট নয়। বর্তমান সম্পাদক প্রথম বীজ-তোলায় সময় অতি সস্ত্রুতি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলা ঘুরে এসেছেন, আসর ভয়াবহতার যে ছবি চোখে পড়েছে তা কিন্তু কোনো প্রচারসফল দৈনিকে বা মন্তীর বরাহ বক্তৃতার মধ্যে এখনো তেমন ছুটে ওঠে নি। মরুত্বের সম্ভাবনা হয়তো নেই, কিন্তু এখনই চালসহ নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম যেভাবে বেড়ে গেছে ও যাচ্ছে তাতে আসর নবাবের অন্ন কটু হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই গল্পনির্ভর বাংলায় ফরাঙ্কার সিংহভাগ জল পশ্চিমবঙ্গেরই পাওয়া উচিত। না হলে শুধু পাড়াপারের সোতু হয়ে থাকার জন্ম ফরাঙ্কার তেমন কোনো গুরুত্বই আমাদের কাছে নেই।

এই সংখ্যার সঙ্গে বিভাবের ছয় বছর সম্পূর্ণ হলো। এই সময়ের মধ্যে প্রতিবছরই যে আমরা নিয়মিত কাগজ প্রকাশ করতে পেরেছি এমন নয়। ফলত যোগ্য জেবার অভাবই আমাদের মাকে মাকেই বাধ্য করেছে যুগ

সংখ্যা প্রকাশ করতে। এবার থেকে কাগজ যাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় সেই চেষ্টা থাকবে। দেখা যাক আমাদের চেষ্টা কতটা ফলবতী হয়।

আমাদের পূর্বাঘোষিত ভাষ্কর্য-সম্পর্কিত ওপর সংখ্যাটি আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হবে। পরিকল্পনা অস্থায়ী দেশবিদেশের প্রায় সমস্ত লেখাই আমরা পেয়ে গেছি। মন্দিরভাষ্কর্য থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ভাষ্কর্যের সমস্ত দিক শৈলী ও রীতিপ্রকৃতি এর অন্তর্গত হবে। এ দেশে এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা আগে আর হয় নি। সংখ্যাটি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচারের জ্ঞাত ইংরেজীতে হবে। এ সংখ্যার অজ্ঞাত ভাষ্কর্য সংখ্যাটির সম্পূর্ণ হুচী প্রকাশিত হলো। আরো দু-একটি লেখা পরে সংযোজিত হতে পারে। বিভাবপ্রকাশনীর থেকে এ-বিষয়েই একটি আকরগ্রন্থও প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যা প্রকাশের ঠিক পরেই আমাদের পরম প্রিয় লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লোকান্তর ঘটেছে। কোনো অর্থেই তিনি সাধারণ পাঠকের লেখক ছিলেন না। তেমন সংখ্যরসফল লেখক হতেও তিনি চান নি। একসময় বেশ-কিছুদিন খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। আত্মনিমগ্ন ও অগ্রমনস্ক এই মাহুত কাঞ্জের কঁকে কঁাকেই ভুবে যেতেন চরিত্র-চিন্তায়। তাঁর কথাবার্তাকে তখন আমাদের আপাত এবং এলোমেলো মনে হতো। আসলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মাঝামাঝি এক মানসিক স্তরে নিমগ্ন থাকতেন বলেই ও-রকম মনে হতো। অথচ কী লাভান্বয় গভীরসঙ্গারী গল্প ভাষাই না তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনি কেবলমাত্র লেখকদেরই লেখক ছিলেন কিনা এ আলোচনার না পিরেও বলা যায় তাঁর হাতে বাংলা গল্পসাহিত্য বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত ও উজ্জীর্ণ হয়েছিল। 'বারো ঘর এক উঠোন' বা 'মীরার তুপুর'-এর মতো সার্থক উপন্যাস লিখলেও ছোটো গল্পেই ছিল তাঁর অসামান্য সিদ্ধি। "গিরিগিটি" বা "বনের রাজা" গল্পের প্রতিটি দৃশ্য ও নিদর্শন নিরিখ যেন অতিমনস্ক শিল্পীর তুলির, মতো, কোনো খুঁটিনাটি তাঁর নজর এড়াতে না। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর পাশে অনেক ছোটো, গল্পকেই রাখা যায়। শুনেছি জীবিতকালে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকাশকরা তাঁর সঙ্গে যোগ্য ব্যবহার করেন নি। এখনো বেশির ভাগ প্রকাশক মূলত ব্যবসার দৃষ্টিতেই সাহিত্যকে দেখেন। ১২ ও ১২ সংখ্যার সাহিত্যকে কেন্দ্র করে অনেকেরই নেই। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গেও কেবলমাত্র

রয়ালটিমুক রচনার অহুবাদ প্রকাশ ছাড়া) অধিকাংশেরই সম্যক পরিচয় নেই, এদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষা বাংলা ভাষায় ঝাঁপ লেখেন তাঁদের রচনামূল্য বিচার করার মেধাও তাঁদের অনেকেরই নেই, দু'একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া। বই বিক্রিই স্বীকৃতির একমাত্র মানদণ্ড। হুতরাং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো লেখক যে জীবিতকালে অবহেলিত থাকবেন এটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। আশা করব এখন তাঁর সমগ্র রচনাবলীর এক সুগ্রন্থিত প্রকাশ ঘটবে। জীবিত লেখককে মালা না দিলেও, শ্মশানে ফুলের অভাব হয় না এখনো এদেশে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কত বড়ো লেখক ছিলেন অনতিকালেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করব।

নীরদ মজুমদারের পরলোকগমন ভারতীয় শিল্পজগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর সম-সময়ে নীরদ মজুমদারের চেয়ে বড়ো কোনো প্রতিভা ছিলেন কি না একথা নিয়ে মতভেদ থাকলেও দেশী বিদেশী শৈলীর আত্মীকরণ ও মৌলিক প্রতিভার স্পর্শ তাকে অভাবনীয় মর্যাদায় উন্নীত করতে নীরদ মজুমদারের মতো কম শিল্পীই করতে পেরেছেন এর আগে। শেষ দিকে হিন্দু ধর্ম, ধর্মীয় লোকচিত্রসমূহ সব-কিছু মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অবিশ্বসনীয় হিন্দু পট্টা। তাঁর যে-সব চিত্র এখনো লোকগোচরে আসে নি বা কোথাও গ্রন্থিত হয় নি, সব ছবি নিয়ে একটি আকর গ্রন্থ অচিরেই মুদ্রিত হওয়া সমীচীন। মনে হয় সরকারি উদ্যোগ ছাড়া এই বিপুল অর্থব্যয়-নির্ভর প্রকাশনা হয়তো সম্ভব নয়। সরকারেরই এগিয়ে আসা উচিত অবিলম্বে।

এই সংখ্যা প্রকাশের আগের মাসাধিককাল পরেই শান্তিনিকেতনে শুরু হচ্ছে দুই বাংলার সাহিত্যমেলা। বাংলাদেশের অনেক নামী কবি সাহিত্যিকরা এ মেলায় আসবেন। পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক কবি এই মিলনমেলায় অংশ নেবেন। আমরা আশা রাখছি বাংলাদেশের কিছু লেখা সংগ্রহ করার। তা সম্ভব হলে যথাসময়ে তা পত্রস্থ হবে বিভাবে।

পরিশেষে শুভেচ্ছা জানাই বিভাবের সমস্ত শুভাহুধ্যাী পাঠক, লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের। তাঁদের অঙ্গুণ সহযোগিতা ও আহুত্বা ছাড়া দীর্ঘ ছ' বছর কাগজ প্রকাশ করে যাওয়া সম্ভব হতো না।

বিভাবের আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদক সমীপে,

নমস্কার, আপনার এই হৃসম্পাদিত পত্রিকা 'বিভাব' আমার একান্ত আপন। সেমিনার কক্ষে ঢুকেই 'বিভাব'-এর খোঁজ নেই। এটা শেষ করে অল্প মাগাজিন, এর কচিশীল প্রবন্ধ, রচনা ও অপরাপর আদিক শোভা আমাকে তার ভক্ত করে ছেড়েছে। এতে আপনার হৃসম্পাদনা অত্যন্ত স্পষ্ট। আপনার এই শুভকর্মের দ্বারা দূরে বসে প্রতিবেশী দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে পেরে নিজেকে ধন্ত মনে করি। সেজ্ঞ আপনাকে জানাই অশেষ শুভেচ্ছা। এই মর্মে 'বিভাব' পাঠক-পাঠিকাদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁদেরকে জানার প্রয়াশে জ্ঞাপন করছি। পত্র-বন্ধুত্বের প্রাণধোলা আহ্বান। পরিশেষে আপনার পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। ইতি—

ধায়ের চৌধুরী
১৩০/কবি জমীম উদ্দীন হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-২

প্রিয় সম্পাদক,

১৭ সংখ্যা 'বিভাব' যখন স্নেহাকরের বাড়ীতে পেয়েছিলাম তখনো কভারের রং শুকায়নি। যতদূর স্মরণ হয় তারিখটা ছিল ২৯.৩.৬২। স্নেহাকরের বইয়ের সমালোচনার। কথার চেয়ে কবিতা সম্পর্কে আপনি ইশারা করেছেন অনেক বেশী। আমার ধারণায় শিল্পের সর্বক্ষেত্রেই হাজার কথার চেয়ে একটি ইশারা অনেক অর্থবহ। আজকাল সমালোচনার ধারাতো স্থূল কলেজ পাঠ্য নোটবইয়ের সমালোচনার মতই বিপাদ নয়তো মুক্তকণ্ঠে পিঠ চাপড়ানো অথবা উচ্ছিন্নলোভীর লজ্জাহীন স্বাক্ষর এবং কোনো কবিতা সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করতে হলে 'মস্তের মত', 'মোজের মত' কতকগুলি তাৎপর্যহীন শব্দ ব্যবহৃত হয়। আমার বিশ্বাস, বাংলাভাষায় ঐচ্ছন্দ্যদেব এবং শ্রীরাঙ্গমুখ দেব, এই দুজনেই কেবল মস্ত উচ্চারণ করেছিলেন। আর কেউ নন। আমার বলার কথা হলো, মস্ত, মস্ত। কবিতা, কবিতা। এই পরিপ্রেক্ষায় আপনার সমালোচনা পড়ে পাঠকমাত্রই আনন্দ পাবেন।

বিভাব

১২২

'ভালবাসা' কবিতাটি সম্পর্কে একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হলো, একশত আট চরণের এই কবিতার একটিও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়নি, ব্যাপারটা কিছুটা বিশ্বাসের নয়? আপনি লিখেছেন 'গ্রন্থের শেষ ভালবাসা' কবিতাটি একটি অসাধারণ কবিতা। এমন প্রেমের কবিতা লিখতে পারলে যে কোন কবিই গর্বিত বোধ করবেন। এই কবিতাটি সম্পর্কে আমার এবং আমার আর এক সত্ত্ব-প্রয়াতে বন্ধুর নিশ্চিত ধারণা ছিল কবিতাটি মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত আমাদের এই ধারণা ও উপলব্ধি যদি সত্য হয় তবে কালে কবিতা পাঠকের কাছেও একদিন তা প্রতিভাত হবে। ভগবান আপনার কৃশলে রাখুন। নমস্কারান্তে। ইতি—সবরচক্ৰবর্তী

৩২/৫১ বি, চণ্ডীঘোষ রোড

কলকাতা-৪০

২রা বৈশাখ '৬২

বিভাব সম্পাদক সমীপে,

আপনার 'বিভাবের' আমি নিয়মিত পাঠক। গল্পের একজন ক্ষুদ্র লেখক হিসাবে ধন্যবাদ জানাই গল্প সংযোজনের জন্য। আজ গত সাহিত্যে ৯০% ভাগ শুধু শব্দ ও ভাষার খেলা। গল্প বা কাহিনী উদ্ধার করা সাধারণ পাঠকদের কাছে দুঃসাধ্যের ব্যাপার। তাই আজ ছোট গল্প অন্তর্জাল যাত্রার মুখোমুখি। লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে লুকাচুর খেলা চলছে।

বিভাবের প্রবন্ধ যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করবে। গল্প সাধারণ পাঠকদের মুগ্ধ করবে। শিক্ষিত বাঙালীর ৯০% পাঠক সাহিত্যে পাঠে গল্প চায়, সহজ বিষয় চায়—১৭ সংখ্যায় অশেষ চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধোক্তি বন্দোপাধ্যায় ও আদিনাথ ভট্টাচার্যের গল্প খুব হালকা মেজাজে অনাড়ম্বর ভাবে লেখা। আমার ভাল লেগেছে। আজ ভাল সম্পাদকের অভাব। তাই আপনার মত একজন কবি যে যোগ্য সম্পাদকের ভূমিকা নিচ্ছেন এজন্য শত শত ধন্যবাদ। বিভাব ও সম্পাদক দীর্ঘজীবী হোক।

ইতি—

সত্যানন্দ গুহ

৭নং পার্ল রোড

কলকাতা-১৭

BIVAV

Special Autumn Issue

Price Rs. 6.00

July-September '82

Regd. No.

Vol. 6 No. 1

Published in October '82

R.N. 30017/76

PRODUCE ** PRESERVE ** PROSPER

Through a net work of warehouses all over West Bengal. The State Warehousing Corporation offers services for storage and preservation of cereals, pulses, jaggery, cotton, jute, potatoes and other notified commodities like textile's paper, cement, steel, coal, machinery and other merchandise of any size or weight against losses from pests, rodents, birds and vagaries of weather.

Warehouse Receipt issued by the State Warehousing Corporation is a negotiable instrument for raising loan from nationalised and State Banks.

The Corporation also runs a Cold Storage at Tarakeswar, Dist-Hoogly.

For Scientific Storage

Please Contact your nearest State Warehousing Centre.

Or the

WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVERNMENT UNDERTAKING)

6A, RAJA SUBODH MULLICK SQUARE (4TH FLOOR)

CALCUTTA-700013

Phone No :

26-6033

26-6060

26-6061

26-6062